Banglapdf.net

নির্বাচিত ভূতের গল্প

হুমায়ূন আহমেদ

PARAMA

SUVOM

হুমায়ূন আহমেদের পছন্দের কিছু ভূতের গল্প এই গ্রন্থে একত্রিত করা হয়েছে। ভূত বিষয়ে লেখকের একটি লেখার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হচ্ছে–এ থেকে ভূত প্রসঙ্গে লেখকের মনোভাব বোঝা যাবে–

"মিসির আলি সাহেবকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়- "আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?" তিনি তৎক্ষণাৎ বলবেন-"না। যুক্তিতে ভূত আসে না।"

হিমুকে এই প্রশ্ন করলে. হিমু বলবে–"অবশ্যই ভূত বিশ্বাস করি। যুক্তি শেষ কথা নয়–জগতের অনেক রহস্যই যুক্তির বাইরে।"

এখন সমস্যা হচ্ছে মিসির আলি এবং হিমু দু'জনই আমার লেখার চরিত্র। তাহলে কি এই দাঁড়াচ্ছে যে আমি মানুষটা কখনো ভূত বিশ্বাস করছি. কখনো করছি না? তা কিন্তু না– ভূত-প্রেত, জ্বীন-পরীতে আমার বিশ্বাস নেই। গভীর রাতে যদি ছায়া ছায়া কোন মূর্তি এসে বলে, "আঁমি ভূঁত।" তবু বিশ্বাস করব না. ভাবব হেলুসিনেশন। দৃষ্টি বিভ্রম। তারপরেও কিন্তু ভাবতে ভাল লাগে যে আমাদের মত এরাও আছে আমাদের চারপাশেই আছে। এদের নিয়ে লেখা গা ছমছমে গল্প পড়তে ভাল লাগে–এদের নিয়ে লিখতেও ভাল লাগে। এই কারণেই এদের নিয়ে লিখি। তবে একবার লেখা হয়ে গেলে দ্বিতীয়বার আর পড়িনা। যেন এরা আমার অনাদরের সন্তান। জন্ম দিয়েই মুক্তি লালন পালনের দায়িত্ব নেই।"

প্রচ্ছদ ধ্রুব এষ

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
শুভম ক্রিয়েশন
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don’t Remove This Page!
বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ
স্ক্যানিং
এডিটিং
শুভম
B
শু
ভ
ম
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don’t Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

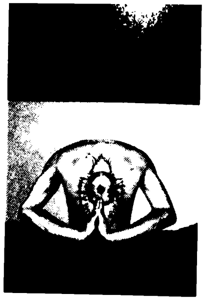

নির্বাচিত ভূতের গল্প

নির্বাচিত ভূতের গল্প

হুমায়ূন আহমেদ

স্ক্যানের জন্য বইটি দিয়েছেন

ইসরাত মেহজাবিন পরমা

SCAN & EDITED BY:

SUVOM

এই বইটি বাংলাপিডিএফ.নেট

(fb.com/groups/Banglapdf.net)

বইপোকাদের আড্ডাখানা

(fb.com/groups/boiipoka)

এর সৌজন্যে নির্মিত

WEBSITE:

WWW.BANGLAPDF.NET

পাথর

'চিত্রা মা, চা-টা উপরে দিয়ে আয়তো।'

চিত্রা বারান্দায় বসে নখ কাটছিল। বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলের একটা নখ ভেঙ্গেছে, ভাঙ্গা নখ 'রিপেয়ার' করা সহজ ব্যাপার না। তার সমস্ত মনযোগ সেই নখে। নখটা এমনভাবে কাটতে হবে যেন ভাঙ্গাটা চোখে না পড়ে। চিত্রা মা'র দিকে না তাকিয়েই বলল, দেখছ না মা একটা কাজ করছি।

সুরমা বিরক্ত গলায় বললেন, কাজটা এক মিনিট পরে করলে হয় না?

চিত্রা বলল, হয় না। উপরে চা নিয়ে যাওয়ার চেয়ে আমার কাজটা অনেক বেশি জরুরী। তা ছাড়া উপরে চা নিয়ে যেতে আমার ভাল লাগে না।

সুরমা অবাক হয়ে বললেন, কেন?

'জাবেদ চাচা সারাক্ষণ জ্ঞানের কথা বলেন। পড়া জিজ্ঞেস করেন। ইংলিশ ট্রানশ্লেশন জিজ্ঞেস করেন। আমার অসহ্য লাগে।'

'তুইতো তাঁর সঙ্গে বেশ হাসিমুখেই কথা বলিস।'

'আমি সবার সঙ্গেই হাসিমুখে কথা বলি। অপছন্দের মানুষদের সঙ্গে আরো বেশি হাসি মুখে বলি, যাতে তারা বুঝতে না পারে। আমি খুব চমৎকার অভিনেত্রী। যাদের সঙ্গে আমি খারাপভাবে কথা বলি— বুঝতে হবে তাদের আমি খুব পছন্দ করি। যেমন তুমি।'

সুরমা বিরক্ত মুখে চায়ের কাপ নিয়ে চলে যাচ্ছেন। সকাল বেলার এই কাজের সময়ে চিত্রার বকবকানি শোনার কোন অর্থ হয় না। মেয়েটার কথাবার্তা কাজ কর্মের কোন ঠিক ঠিকানা নাই। বারান্দায় বসে নখ কাটছে। কাটা নখ ছড়িয়ে থাকবে— সে উঠে চলে যাবে।

চা ঠাণ্ডা হচ্ছে। সুরমা উপরে পাঠানোর কোন ব্যবস্থা করতে পারছেন না। কাজের মেয়েটার জ্বর এসেছে। সে কাথামুড়ি দিয়ে কোঁ কোঁ করছে। রশীদকে পাঠিয়েছেন বাজারে। এক কাপ চা উপরে পাঠানোর লোকের অভাবে নষ্ট হবে? তাঁর মনটা খুঁত খুঁত করছে। অপচয় তাঁর একেবারেই সহ্য হয় না। তিনি চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। চা তাঁর পছন্দের পানীয় না। চা খাবার পর মুখ মিষ্টি হয়ে থাকে। মিষ্টি ভাবটা কিছুতেই যায় না।

চিত্রা নখ কাটা শেষ হয়েছে। তার মুখ হাসি হাসি। তার অভিনয়টা ভাল হয়েছে। মা সত্যি সত্যি ধরে নিয়েছেন সে জোবেদ চাচাকে খুবই অপছন্দ করে। সামান্য এক কাপ চাও সে উপরে নিয়ে যেতে রাজি না। অথচ সে ছটফট করছে কারণ এগারোটা প্রায় বাজে এখনো অদ্ভুত মানুষটার সঙ্গে তার দেখা হয়নি। এখন সে নিশ্চিন্ত মনে চা নিয়ে উপরে যেতে পারবে। খুব কম করে হলেও এক ঘন্টা কথা বলতে পারবে। চিত্রা রান্নাঘরে ঢুকল। বিরক্ত বিরক্ত মুখ করে বলল—

'মা চা দাও। নিয়ে যাচ্ছি।'

সুরমা গম্ভীর গলায় বললেন, তোকে নিতে হবে না।

'অন্য একজনের চা তুমি চুকচুক করে খেয়ে ফেলছ আশ্চর্য!'

'শুধু শুধু কথা বলিসনাতো।'

চিত্রা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, মা শোন, আমি এক ঘন্টার জন্যে ছাদে যাচ্ছি। ছাদে হাঁটাহাঁটি করব। এই এক ঘন্টায় কেউ যেন আমাকে বিরক্ত না করে। আর শোন তুমি আরেক কাপ চা বানিয়ে দাও— আমি জ্ঞানী চাচার জন্যে নিয়ে যাচ্ছি।

'তোকে চা দিয়ে আসতে হবে না।'

'অবশ্যই হবে। না দেয়া পর্যন্ত আমার মনে একটা অপরাধবোধ কাজ করবে। সারাক্ষণ মনে হবে আহা আমার জন্যে বেচারা চা খাওয়া থেকে বঞ্চিত হল। অপরাধ বোধ থেকে হবে গিল্ট কমপ্লেক্স। সেখান থেকে জটিল জটিল সব মনের রোগ তৈরি হবে। তারপর একদিন দেখা যাবে আমি ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়ে গেছি। আমার মাথার ঘিলু চারদিকে ছিটকে পরে আছে। ইত্যাদি। ইত্যাদি।'

'তুই সারাক্ষণ এত কথা বলিস কিভাবে? ছোট বেলায় তো এ রকম ছিলিনা?'

'ছোটবেলায় কি রকম ছিলাম, হাবা টাইপের?'

'আর কথা বলিসনাতো।'

'তুমি আমার সামনে থেকে সরোতো মা। আমি চা বানাব। আমার নিজেরো চা খেতে ইচ্ছে করছে। জ্ঞানী চাচার জন্যেও এক কাপ নিয়ে যাব। অপরাধবোধ থেকে মুক্ত হব। ভাল কথা মা—আমার হাতের কাটা নখগুলি সারা বারান্দায় ছড়ানো—কাউকে দিয়ে পরিষ্কার করিও নয়ত তুমিই আমার সঙ্গে খ্যাঁচ খ্যাঁচ করবে।'

'চুপ করতো।'

চিত্রা খিলখিল করে হেসে উঠল। সে চায়ের কাপে চা ঢালছিল। হাসির কারণে চা চারদিকে ছড়িয়ে গেল। ধমক দেয়ার বদলে সুরমা মুগ্ধ চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মেয়েটা এত সুন্দর! পিঠময় চুল ছড়িয়ে সে বসে আছে- ঘর আলো হয়ে আছে। সুরমার বুক ধড়ফড় করতে লাগল। এত সুন্দর হওয়া ভাল না।

'মা!'

'কি?'

'তোমার কি ধারণা— আমাদের জ্ঞানী চাচা বোকা না বুদ্ধিমান?'

'বোকা হবে কেন? এসব কি ধরণের কথা?'

'একমাত্র বোকারাই সারাক্ষণ জ্ঞানীর মত কথা বলে। এই জন্যেই আমার ধারণা

তিনি বেশ বোকা।'

'শুধু চা নিয়ে যাচ্ছিস কেন বিসকিট নিয়ে যা।'

'আমি বিসকিট ফিসকিট নিতে পারব না।'

চিত্রা চা নিয়ে উঠে চলে গেল। সুরমা গেলেন বারান্দায় ছড়িয়ে থাকা নখ পরিষ্কার করতে।

বারান্দা ঝকঝকে পরিষ্কার নখের একটা কণাও কোথাও পড়ে নেই। মেয়েটা কি যে করে। মায়ের সঙ্গেও ফাজলামী। রশীদ বাজার নিয়ে এসেছে। তিনি বাজার তুলতে গেলেন। রশীদকে দিয়ে একটা প্লেটে করে কয়েকটা বিসকিটও উপরে পাঠাতে হবে। কথাটা মনে থাকলে হয়। তাঁর কিছুই মনে থাকে না। বাজার তুলতে তুলতে আসল কথাটাই ভুলে যাবেন। পুঁই শাকের বড় বড় পাতা আনতে বলেছিলেন। এনেছে কি না কে জানে? হয়ত ভুলে বসে আছে। চিত্রার বাবা ইলিশপাতুরি খেতে চেয়েছিলেন। সরিষাও আনা দরকার ছিল। পুরানো সরিষায় তিতকুট ভাব হয়। পাতুরি বানালে জোবেদ সাহেবকে পাঠাতে হবে। ভাল মন্দ রান্নার সময় ভদ্রলোকের কথা মনে হয়— শেষ পর্যন্ত পাঠানো হয় না। আসল সময়ে ভুলে যান। সুরমা'র মনে হল ডায়াবেটিসের সঙ্গে জরুরী বিষয় ভুলে যাবার একটা সম্পর্ক আছে। ডায়াবেটিস ধরা পরার পর থেকে এ রকম হচ্ছে। না আজ জোবেদ সাহেবকে খাবার পাঠাতেই হবে।

জোবেদ আলি সুরমাদের তিন তলা বাড়ির ছাদে থাকেন। ছাদে চিত্রার বাবা আজীজ সাহেব বাথরুম সহ একটা ঘর বানিয়ে ছিলেন। গেষ্ট রুম। গেষ্ট এলে ছাদে থাকবে মূল বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে না। মাঝে মাঝে নিজেরাও থাকবেন। বৃষ্টি বাদলার দিনে ছাদের চিলেকোঠায় থাকতে ভালই লাগে। সেই পরিকল্পনা কাজে লাগলো না আজীজ সাহেবের মাথায় অর্থকরী পরিকল্পনা খেলা করতে লাগল। ছাদের ঘরটা ভাড়া দিলে কেমন হয়। নির্ঝনঝাট টাইপের ভাড়াটে পাওয়া গেলে প্রতি মাসে হেসে খেলে দু'হাজার টাকা পাওয়া যাবে— বছরে চব্বিশ হাজার, দশ বছরে দুইলাখ চল্লিশ হাজার। আজীজ সাহেব এক রুম ভাড়া হবে এমন একটা বিজ্ঞাপন দিলেন। বর্তমান ভাড়াটে জোবেদ আলি সেই বিজ্ঞাপনের ফসল। ভদ্রলোকের বয়স তিপ্পান্ন। ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজি সাহিত্য পড়াতেন। ভাল না লাগায় ছেড়ে দিয়েছেন। বর্তমানে বই পড়া এবং লেখালেখি ছাড়া কিছুই করেন না। এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে হাসিমুখে বলেন, যেভাবে বেঁচে আছি এইভাবে আরো দশ বছর বেঁচে থাকার মত অর্থ আমার আছে। দশ বছরের বেশি বেঁচে থাকব বলে মনে হয় না। যদি বেঁচে থাকি তখন দেখা যাবে।

আদর্শ ভাড়াটে বলে যদি পৃথিবীতে কিছু থেকে থাকে জোবেদ আলি তাই। তিনি কোথাও যান না, কেউ তাঁর কাছে আসে না। দুপুর বা মধ্যরাতে হঠাৎ টেলিফোন করে কেউ বলে না—"আপনাদের ছাদে যে ভদ্রলোক থাকেন জোবেদ আলি তাঁকে একটু ডেকে দিন না।" শুরুতে আজীজ সাহেব বলে দিয়েছিলেন—ভাই মাসের দু' তারিখে ভাড়া দিয়ে দেবেন। এক বছর হয়ে গেল জোবেদ আলি তাই করছেন খামে ভর্তি করে কুড়িটা একশ' টাকার নোট দিচ্ছেন। প্রতিটি নোট নতুন। কোন ময়লা নোট বা স্কচটেপ লাগানো নোট তার মধ্যে নেই। ভাড়াটের নানান অভিযোগ থাকে-এই ভদ্রলোকের কোন অভিযোগও নেই। একবার পানির মেশিন নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তিন দিন

পানি ছিল না। তিনি কাউকে কিছু বলেন নি। একতলা থেকে বালতি করে পানি এনেছেন। সুরমা দেখতে পেয়ে ছুটে এসেছিলেন। চোখ কপালে তুলে বলেছিলেন, একি আপনি পানি তুলবেন কেন? আমার ঘরে তিনটা কাজের মানুষ, বললেই পানি তুলে দেয়। জোবেদ আলি বলেছিলেন—ভাবী, আমি নিজেও একজন কাজের মানুষ। সামান্য এক বালতি পানি উপরে তোলার সামর্থ আমার আছে। যেদিন থাকবে না সেদিন আপনাকে বলব।

আজীজ সাহেব পৃথিবীর কোন মানুষকে বিশ্বাস করেন না, পছন্দও করেন না। তাঁর ধারণা আল্লাহ্‌তালা মানুষকে বদ হিসেবে বানিয়েছেন। ভাল যা হয় নিজের চেষ্টায় হয়— কিছুদিন ভাল থাকার পর আবার নিজের বদ ফরমে ফিরে যায়। সেই আজীজ সাহেবেরও ধারণা— জোবেদ আলি মানুষটা খারাপ না। সুরমা পৃথিবীর সব মানুষকে বিশ্বাস করেন। তাঁর ধারণা জোবেদ আলি মানুষ হিসেবে শুধু ভাল না, অসাধারণ ভাল। শুধু একটু দুঃখি। তাতো হবেই ভাল মানুষরা দুঃখি দুঃখি হয়। ভদ্রলোকের একটা মাত্র মেয়ে ইন্টারমিডিয়েট পড়তে পড়তে বিয়ে করে স্বামীর সঙ্গে চলে গেল ভার্জিনিয়া। বাবা একা পরে রইল দেশ। বাবা এবং মেয়ের আর দেখা হবে কিনা কে জানে? সুরমা একবার কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিলেন— আচ্ছা ভাই স্ত্রী মারা যাবার পর আপনি আবার বিয়ে করলেন না কেন? বিয়ে করলেতো আর এই কষ্টটা হত না। একা একা পড়ে আছেন ভাবতেই খারাপ লাগে।

ভদ্রলোক হাসিমুখে বলেছেন- ভাবী এটা একটা বড় ধরণের বোকামী হয়েছে। ব্যাপারটা আপনাকে বলি- আমার মেয়ের জন্মের পরপর স্ত্রী খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল। অসুস্থ অবস্থায় এক রাতে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বলল, শোন তুমি আমাকে একটা কথা দাও, যদি আমি মরে টরে যাই তুমি কিন্তু বিয়ে করতে পারবে না। আমি ঘুমের ঘোরে ছিলাম— বলে ফেললাম, আচ্ছা। বলেই ফেঁসে গেছি। বেচারী তার মাসখানিক পর মারা গেল আমি ঝুলে গেলাম। হা হা হা।

সুরমা বিস্মিত হয়ে বললেন, হাসছেন কেন? এর মধ্যে হাসির কি আছে?

"ঘুমের ঘোরে একটা কথা বলে কেমন ফেঁসে গেলাম দেখেন না। এই জন্যই হাসছি।'

'ভাই আপনি বড়ই আশ্চর্য লোক।'

'আমি মোটেই আশ্চর্য লোক না ভাবী, আমি খুবই সাধারণ লোক। বেশি সাধারণ বলেই বোধহয় আশ্চর্য মনে হয়।

'আপনার স্ত্রী কি খুব সুন্দরী ছিলেন?'

'সুন্দরী ছিল কিনা বলতে পারছি না, তবে অপুষ্টি জনিত কারণে বাঙ্গালী মেয়েদের চেহারায় একটা মায়া মায়া ভাব থাকে। সেই মায়া ভাবটা ডবল পরিমাণে ছিল এইটুকু বলতে পারি।'

'তাঁর ছবি আছে আপনার কাছে?'

'আমার কাছে নেই। আমার মেয়ের কাছে আছে। মা'র সব ছবি তার কাছে।'

জোবেদ আলির প্রতি মায়ায় সুরমার হৃদয় দ্রবীভূত হল। বারবার মনে হল— ইস মানুষটার জন্যে কিছু যদি করা যেত। যতই দিন যাচ্ছে সেই মায়া বাড়ছে।

চিত্রা চায়ের কাপ হাতে জোবেদ আলি সাহেবের ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে আছে। তার কপালে ঘাম। সে এক ধরণের অস্থিরতা বোধ করছে যে অস্থিরতার কারণটাও তার কাছে ঠিক স্পষ্ট নয়। জোবেদ আলি চৌকিতে বসে আছেন। তাঁর পিঠ দেয়ালে। পরণে লুঙ্গি ও ফুল হাতা সার্ট। ভদ্রলোকের অনেক বিচিত্র অভ্যাসের একটি হচ্ছে ফুলহাতা শার্ট ছাড়া তিনি পরেন না। চিত্রার মনে হল-"ইস ইনাকে কি সুন্দর লাগছে।" এটা মনে হবার জন্যে সে লজ্জিতও হল না, অপ্রস্তুতও বোধ করল না।

অথচ প্রথমদিন মানুষটাকে দেখে খুব রাগ লেগেছিল। বাইরের উটকো একজন মানুষ ছাদের ঘরে পড়ে থাকবে। যখন তখন ছাদে আসা যাবে না। বৃষ্টিতে ছাদে গোসল করা যাবে না। বাবার সঙ্গে এই নিয়ে তর্ক করা যাবে না। বাবা কথার মাঝখানে তাকে থামিয়ে বলবেন, যা বোঝ না তা নিয়ে তর্ক করবে না। তোমার অভ্যাস হয়েছে তোমার মা'র মত না বোঝে তর্ক।

চিত্রা বাবাকে বলেনি জোবেদ নামের মানুষটাকে কিছু কঠিন কথা শুনাতে গেছে। কঠিন কথাও ঠিক না- অবহেলা সূচক কিছু কথা। যা থেকে মানুষটা ধরে নেবে- এখানে তার বাস সুখকর কিছু হবে না।

লোকটা চেয়ারে কাত হয়ে শুয়ে বই পড়ছিল এবং পা নাচাচ্ছিল। চিত্রাকে দেখে পা নাচানোও বন্ধ করল না, বই থেকেও চোখ তুললনা। গম্ভীর গলায় বলল, কেমন আছ চিত্রা?

লোকটার পক্ষে তার নাম জানা বিচিত্র কিছু না। নামতো জানতেই পারে। হয়ত কাউকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছে। তারপরেও প্রথম আলাপেই পরিচিত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করা, কেমন আছ চিত্রা, খুবই আশ্চর্যজনক।

'এসো ভেতরে এসো। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছ কেন? দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকাটা খুবই অলক্ষণ।'

'অলক্ষণ কেন?'

'প্রাচীন বাংলার বিশ্বাস- যে মেয়ে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে তার ঘরে সুজন ঢুকে না।'

চিত্রা দরজা ছেড়ে ঘরে এসে ঢুকল। এবং বেশ সহজ ভাবেই চৌকির উপর বসল। জোবেদ আলি নরম গলায় বললেন, পরীক্ষা কেমন হয়েছে?

'ভাল, শুধু ইংরেজীটা খারাপ হয়েছে।'

'ইংরেজী খারাপ হলে কিছু যায় আসে না। ইংরেজী বিদেশী ভাষা। বাংলাটা ভাল হলেই হল। ইংরেজী খারাপ হওয়া ক্ষমা করা যায়। বাংলা খারাপ হওয়া ক্ষমার অযোগ্য।'

'আমার বাংলাও খারাপ হয়েছে।'

'সেকি?'

'আসলে আমার সব পরীক্ষাই খারাপ হয়েছে। তবে বাসায় কাউকে কিছু বলি নি।

বাসার সবাই জানে আমার সব পরীক্ষা ভাল হয়েছে। শুধু ইংরেজীটা একটু খারাপ হয়েছে। আমি যা বলি সবাই আবার তা বিশ্বাস করে। কারণ আমি হচ্ছি খুব ভাল অভিনেত্রী।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি।'

'মাঝে মাঝে আমার নিজের অভিনয় দেখে মনে হয় আমি সুবর্না মুস্তফার চেয়েও ভাল অভিনয় করি। আমার চেহারাটা যদি আরেকটু মিষ্টি হত তাহলে টিভিতে যেতাম।'

'তোমার চেহারা মিষ্টি না?'

'জ্বি না।'

'বুঝলে কি করে চেহারা মিষ্টি না?'

'আমাকে রাতে কখনো পিপড়ায় কামড়ায় না। আমি মিষ্টি হলে রাতে নিশ্চয়ই পিপড়ায় কামড়াতো।'

জোবেদ আলি হো হো করে হেসে ফেললেন। হাসির উচ্ছাসে তার হাত থেকে বই পড়ে গেল। চিত্রা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। তার সামান্য রসিকতায় একটা মানুষ এত হাসতে পারে সে কল্পনাও করেনি। চিত্রা বলল, চাচা আমি যাই। জোবেদ আলি বললেন, অসম্ভব তুমি এখন যেতেই পারবে না। তোমাকে কম করে হলেও আরো পাঁচ মিনিট থাকতে হবে। আসলে আজ সকাল থেকে আমার মনটা খুব খারাপ ছিল, তোমার সঙ্গে কথা বলে মনটা ভাল হয়েছে। আরেকটু ভাল করে দিয়ে যাও।

চিত্রা বলল, আমি কারোর মন ভাল করতে পারি না। আমি যা পারি তা হচ্ছে মন রাগিয়ে দেয়া। যেই আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে সেই রেগে যায়।

'আচ্ছা বেশ তুমি আমাকে রাগিয়ে দিয়ে যাও— দেখি কেমন রাগাতে পার।' তোমাকে পাঁচ মিনিট সময় দেয় হল-

চিত্রা পাঁচ মিনিটের জন্যে বসে শেষ পর্যন্ত পুরো এক ঘন্টা থাকল। সে আরো কিছুক্ষণ থাকতো কিন্তু সুরমা রশীদকে দিয়ে ডেকে পাঠালেন। চিত্রার দিকে তাকিয়ে বললেন, এতক্ষণ কি করছিলি?

চিত্রা বিরক্ত ভঙ্গিতে বলল, মা শোন কাকে আমাদের বাড়িতে এনে ঢুকিয়েছ?

সুরমা বললেন, কেন?

'আমি ভদ্রতা করে দেখা করতে গেলাম উনি আমাকে ইংরেজী ট্রানস্লেশন ধরলেন। তারপর উপদেশ আর বক্তৃতা। অসহ্য। বাবাকে বলে উনাকে তাড়াবার ব্যবস্থা করবো মা। ঐ লোকের জন্য আমার ছাদে হাঁটা বন্ধ হয়ে গেল।'

'তুই তোর মত ছাদে যাবি।'

'অসম্ভব! আমি আর ভুলেও ছাদে যাব না।'

আসলে এক অর্থে চিত্রার ছাদে যাওয়ার সেদিন থেকেই শুরু। তারপর এক রাতে সে আশ্চর্য সুন্দর এবং একই সঙ্গে খুবই ভয়ংকর একটা স্বপ্ন দেখল। সে দেখল সে হাঁটছে, ফুটফুটে একটা বাচ্চা মেয়ের হাত ধরে হাঁটছে। সেই বাচ্চা মেয়েটা জাপানী পুতুলের মত সুন্দর। জোবেদ আলি নামের মানুষটা বাচ্চা মেয়ের অন্য হাত ধরে আছে। সেই মানুষটা বাচ্চা মেয়েটার বাবা, এবং সে মেয়েটার মা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ লজ্জা। কি লজ্জা।

মতো সুন্দর। জোবেদ আলি নামের মানুষটা বাচ্চা মেয়ের অন্য হাত ধরে আছে। সেই মানুষটা বাচ্চা মেয়েটার বাবা, এবং সে মেয়েটার মা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ লজ্জা। কি লজ্জা।

তার ঘুম ভেঙে গেল। সারারাত সে জেগে রইল।

নিজেকে মনে হচ্ছিল কুৎসিত একটা পোকা। সারারত সে একটা পোকার মতোই শরীর গুটিয়ে শুয়েছিল। শুয়ে শুয়েই সে ফজরের আজান শুনল। তার মা ঘুম ভেঙে দরজা খুলছেন তাও বুঝল। এবং প্রথমবারের মতো মনে হলো– মা রোজ এত ভোরে ওঠে? আশ্চর্য তো! সে নিজেও বিছানা ছেড়ে নামল। দরজা খুলে বারান্দায় গিয়ে দেখে বারান্দার জলচৌকিতে সুরমা নামাজ পড়ছেন। বারান্দার এই অংশটা চিকের পর্দায় ঢাকা। খুব নিরিবিলি।

সুরমা নামাজ শেষ করে বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কি হয়েছে?' চিত্রা বলল, 'কিছু হয় নি। ঘুম ভেঙে গেছে।'

'এত সকালে ঘুম ভাঙল কেন?'

'তুমি এমন ভাবে কথা বলছ যেন সকালে ঘুম ভাঙাটা অপরাধ।'

'অপরাধ হবে কেন? সকালে ঘুম ভাঙাটা তো খুব ভালো কথা। ফজরের দু'রাকাত নামাজ পড়ে ফেলিস দেখবি সারাটা দিন কত ভালো যাবে। শরীর থাকবে ফ্রেশ। আজ থেকে শুরু কর না।'

'সব সময় উপদেশ দিও না তো মা। অসহ্য লাগে। আজ ভোরবেলায় উঠেছি বলে কি রোজ ভোরবেলায় উঠব? কাল থেকে আবার আগের মতো দশটার সময় ঘুম ভাঙব।'

'তুই যাচ্ছিস কোথায়?'

'ছাদে। মর্নিং ওয়াক করব।'

'তোর চোখ এমন লাল দেখাচ্ছে কেন?'

'ভোরবেলা সবার চোখই লাল দেখায়। তোমার চোখও লাল। বাম চোখটা বেশি। ডানটা কম।'

চিত্রা ছাদে উঠে গেল।

আশ্চর্য জোবেদ আলি সাহেব ছাদে হাঁটছেন। তাঁর পরনে ফুল হাতা শার্ট। ধবধবে সাদা লুঙ্গি। শার্টের রঙ খয়েরি। খয়েরি রঙের খানিকটা মুখে এসে পড়েছে। তাঁকে কেমন যেন বিষণ্ন দেখাচ্ছে।

চিত্রা খুব সহজ ভঙ্গিতে বলল, 'ছাদে কি করছেন?'

জোবেদ আলি বললেন, 'হাঁটছি।'

'আপনি রোজ এত ভোরে ওঠেন?'

'না। আজ বাধ্য হয়ে উঠেছি। দাঁতের ব্যথায় রাতে ঘুম হয় নি। দেখো গাল ফুলে কি হয়েছে। বৃদ্ধ বয়সের অনেক যন্ত্রণা।'

'দাঁতের ব্যথাটা কি খুব বেশি?'

'এখন একটু কম। সব ব্যথাই দিনে কমে যায়। রাতে বাড়ে। তুমি কি রোজ এত ভোরে ওঠ?'

‘আমি সকাল দশটার আগে কখনো বিছানা থেকে নামি না।’

‘আজ নামলে যে?’

চিত্রা হাসতে হাসতে বলল, ‘কাল রাতে আমর এক ফোঁটা ঘুম হয় নি। এখন ঘুম পাচ্ছে। ঠিক করেছি ছাদে খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে শুয়ে পড়ব।’

‘কাল রাতে ঘুম হয় নি কেন?

‘সত্যি জানতে চান?’

‘জানতে চাই এইটুকু বলতে পারি। সত্যি জানতে চাই, না মিথ্যা জানতে চাই তা বলতে পারি না।’

‘কাল সারারাত আমার ঘুম হয় নি কারণ কাল রাতে আমি টের পেলাম একজন মানুষকে আমি প্রচণ্ড রকম ভালোবাসি। আপনি কি আমার কথায় অস্বস্তি বোধ করছেন?’

‘অস্বস্তি বোধ করব কেন? তোমার বর্তমান সময়টা প্রেমে পড়ার জন্যে আদর্শ সময়। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা হয়ে গেছে, কিচ্ছু করার নেই– এই সময় প্রেমে পড়বে না তো কখন পড়বে? প্রেমে কি একা একা পড়েছ না দু’জন মিলে পড়েছ?’

‘আপনি এমনভাবে কথা বলছেন যেন প্রেমে পড়াটা খালে পড়ে যাবার মতো।’

‘অনেকটা সে রকমই। কেউ কেউ এমন খালে পড়ে সেখানে হাঁটুপানি। সমস্যা হয় না। খাল থেকে উঠে আসতে পারে। আবার কোনো কোনো খালে অতলান্তিক পানি। উঠার উপায় নেই। সাঁতার জানলেও লাভ হয় না। কতক্ষণ আর সাঁতার কাটবে? এক সময় না এক সময় ডুবতে হবেই।’

চিত্রা বলল, ‘আবার কোনো খালে পানি নেই। শুধুই কাদা। সেই খালে পড়া মানে নোংরা কাদায় মাখামাখি হওয়া।’

‘ভালো বলেছ। খুব গুছিয়ে বলেছ।’

‘আপনার সঙ্গে থেকে আর কিছু শিখি বা না শিখি গুছিয়ে কথা বলা শিখেছি।’

‘তাও তো কিছু শিখলে। ভালোটা মানুষ সহজে শিখতে পারে না। মন্দটা শিখে ফেলে। আমার মন্দ কিছু শেখো নি?’

‘আপনার মন্দ কি আছে?’

‘অসংখ্য। প্রথম হলো আলস্য। আমার মতো অলস মানুষ তুমি তিন ভুবনে পাবে না।’

‘অলস কোথায়? আপনি দিনরাত বই পড়েছেন। লিখছেন।’

‘আলস্যটাকে আড়াল রাখার এ হচ্ছে হাস্যকর একটা চেষ্টা। লোকে ভাববে অনেক কাজ করা হচ্ছে আসলে লবডঙ্গা।

‘লবডঙ্গা কি?’

‘লবডঙ্গা হচ্ছে নব ডংকা শব্দের অপভ্রংশ। নব ডংকা মানে তো জানোই নতুন ঢোল। কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না প্রচণ্ড ঢোলের শব্দ হচ্ছে, সবাই ভাবছে না জানি কত কাজ হচ্ছে আসলে ঢোল বাজছে।’

‘আমি এখন যাচ্ছি।’

‘কি করবে, ঘুমুবে?’

‘আমার মাথা ধরে আছে। প্রথমে কড়া এক কাপ চা খেয়ে মাথা ধরাটা কমাব তারপর দু’টা ঘুমের অষুধ খেয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবব কি করা যায়।’

‘কি করা যায় মানে?’

‘একটা মানুষকে যে আমি প্রচণ্ড রকম পছন্দ করি তাকে কি করে সেই খবরটা দেয়া যায় তাই ভাবব। আপনি তো খুব জ্ঞানী মানুষ আপনার কি কোনো সাজেশান আছে?’

‘তাকে চিঠি লিখ। সুন্দর করে ঘুছিয়ে চিঠি লেখো।’

‘অসম্ভব। আমি চিঠি লিখতে পারব না– আমার লজ্জা লাগবে।’

‘মুখে বলা কি সম্ভব ধরো টেলিফোনে জানিয়ে দিলে।’

‘না।’

‘আমি তো আর কোনো পথ দেখছি না।’

‘আপনার ধারণা চিঠি লিখে জানানোই সবচে’ ভালো।’

‘হ্যাঁ।’

‘তারপর সে যদি সেই চিঠি সবাইকে দেখিয়ে বেড়ায় তখন কি হবে?’

‘খানিকটা রিস্ক তো নিতেই হবে।’

‘আমি চিঠি লিখতে পারি না। আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছ এই দু’লাইন লেখার পর আমার চিঠি শেষ হয়ে যায়।’

‘তাহলে এক কাজ করো, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে ধার নাও। রবীন্দ্রনাথের গান বা কবিতা থেকে কয়েক লাইন লিখে পাঠিয়ে দাও। এমন কিছু লাইন বের করো যাতে তোমার মনের ভাব প্রকাশিত হয়।’

‘আমি পারব না। আপনি বের করে দিন।’

লেখো–

‘প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্র মাস
তোমার চোখে দেখেছিলেম আমার সর্বনাশ।’

লেখার সময় খেয়াল রাখবে যেন বানান ভুল না হয়। প্রেমপত্রে বানান ভুল থাকা অমার্জনীয় অপরাধ।’

‘বানান ভুল হবে না। চিঠি লিখতে না পারলেও আমি বানান খুব ভালো জানি।’

চিত্রা ছাদ থেকে নেমে নিজেই চা বানিয়ে খেল। মা’কে গিয়ে বলল– ‘মা শোনো, আমি এখন চারটা ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ঘুম দেব। খবর্দার আমাকে নাশতা খাবার জন্যে ডাকাডাকি করবে না। আমি একেবারে দুপুরবেলা উঠে ভাত খাব।’

সুরমা বিস্মিত হয়ে বললেন, ‘ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমুতে হবে কেন?’

চিত্রা হাই তুলতে তুলতে বলল, ‘আমি ঠিক করেছি একগাদা ঘুমের অষুধ খেয়ে মারা যাব। আজ তার একটা রিহার্সেল।’

‘তুই সব সময় এমন পাগলের মতো কথা বলিস না।’

‘আমি শুধু পাগলের মতো কথাই বলি না, পাগলের মতো কাজও করি। মা রশীদকে

তুমি আমার ঘরে একটু পাঠাও তো।'

'কেন?'

'কাজ আছে।'

চিত্রা নিজের ঘরে ঢুকে চারটা ঘুমের ট্যাবলেট খেল। তারপর ড্রয়ার থেকে কলম বের করে গোটা গোটা হরফে লিখল–

প্রহর শেষের আলোয় রাঙ্গা সেদিন চৈত্র মাস।
তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।

কাগজটা ভাঁজ করে রশীদের হাতে দিয়ে বলল– 'রশীদ তুই এ কাগজটা জোবেদ চাচার হাতে দিয়ে আয়। এক্ষুনি যা। কাগজটা দিয়ে এসে আমাকে খবর দিবি কাগজ দিয়ে এসেছিস। হাবার মতো এরকম হাঁ করে থাকবি না। মুখ বন্ধ কর।'

চায়ের কাপ হাতে চিত্রা দাঁড়িয়ে আছে। কতক্ষণ হলো দাঁড়িয়ে আছে? পাঁচ মিনিট? দশ মিনিট? নাকি তার চেয়েও বেশি। চা সম্ভবত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ঠাণ্ডাই ভালো। জোবেদ চাচা ঠাণ্ডা চা খান। চিত্রা তার জীবনে এই প্রথম একটা মানুষ পেল যে চা ঠাণ্ডা করে খায়। চিত্রা টুকটুক করে দরজায় দু'বার টোকা দিল।

জোবেদ আলি বই থেকে মুখ না তুলেই বললেন, 'ভেতরে এসো। সাত মিনিট দেরি হলো যে?'

'দেরি মানে?'

'আমি জানতাম তুমি আমার ঘরে ঠিক এগারোটার সময় চা নিয়ে আসবে। এখন বাজছে এগারোটা সাত। কাজেই তুমি সাত মিনিট দেরি করেছ।'

'আমি ঠিক এগারোটার সময় আসব আপনাকে কে বলল?'

'আমার সিক্সথ সেন্স বলেছে।'

'উফ কেন যে মিথ্যা কথা বলেন! আপনি কি ভেবেছেন আপনার মিথ্যা কথা শুনে আমি খুশি হব?'

'আমি যে কথাটা বললাম সেটা যে মিথ্যা না তা কিন্তু আমি প্রমাণ করে দিতে পারি।'

'বেশ তো প্রমাণ করুন।'

'টেবিলের উপরে দেখো একটা বই আছে জীবনানন্দ দাশের কবিতাসমগ্র। বইটার নিচে একটা কাগজ আছে। কাগজটায় কি লেখা আছে পড়ো।'

চিত্রা কাগজটা নিয়ে পড়ল। কাগজে লেখা– 'আমার সিক্সথ সেন্স বলছে চিত্রা ঠিক এগারোটায় আমার জন্যে চা নিয়ে আসবে। আমি চায়ের জন্য অপেক্ষা করছি।'

'পড়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'আজকের তারিখ দেয়া আছে দেখেছ?'

'হ্যাঁ।'

'অবাক হয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'কতটুকু অবাক হয়েছ?'

চিত্রা চাপা গলায় বলল, 'খুব অবাক হয়েছি।'

'বিস্ময়ে অভিভূত?'

'হ্যাঁ।'

জোবেদ আলি চায়ে চুমুক দিতে দিতে হাসি মুখে বললেন, 'এত অল্পতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ো না। পরে সমস্যায় পড়বে। সিক্সথ সেন্স-টেন্স কিছু না। আমি যা করেছি তা হচ্ছে খুব সাধারণ একটা ট্রিকস। অনেকগুলি কাগজে একই জিনিস লিখেছি শুধু সময়টা একেক কাগজে একেক রকম। তুমি যদি বারোটার সময় চা নিয়ে আসতে তাহলে বলতাম জানালার কাছে যে পিরিচটা আছে সেই পিরিচের নিচের কাগজটা দেখো। সেই কাগজে লেখা চিত্রা ঠিক বারোটার সময় আমার জন্যে চা নিয়ে আসবে। এখন বুঝতে পারছ?'

'এটা কেন করলেন?'

'তোমাকে বিস্ময়ে অভিভূত করে দেবার জন্যে করলাম।'

'কৌশলটা পরে বলে ফেললেন– বিস্ময়টা তো আর রইল না।'

'কৌশলটা স্বীকার করায় বিস্ময় আরও দীর্ঘস্থায়ী হলো। বিস্ময়ের সঙ্গে যুক্ত হলো মজা। তাই না?'

'হ্যাঁ'

'গম্ভীর হয়ে আছ কেন?'

'রাগ লাগছে।'

'রাগ লাগছে কেন?'

'আপনার এত বুদ্ধি আর আমার এত কম বুদ্ধি, এই জন্যে রাগ লাগছে।'

'তোমার বুদ্ধি কম কে বলল?'

'আমি জানি আমার বুদ্ধি কম। আমি মোটরসাইকেলের মতো ফটফট করে কথা বলতে পারি কিন্তু আমার বুদ্ধি কম। আমি আমার বুদ্ধি দিয়ে কাউকে বোকা বানাতে পারি না। শুধু মাকে পারি।'

'উনাকে বোকা বানাও?'

'হ্যাঁ মা'র ধারণা আপনাকে আমার একেবারেই পছন্দ না।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ। আমার বুদ্ধি কম হলেও আমি আবার ভালো অভিনয় জানি। আমি নানান ধরনের অভিনয় করে মা'কে ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাখি। মা'র ধারণা আমি আপনাকে দেখতে পারি না।'

'আসলে পারো?'

চিত্রা কঠিন চোখে তাকিয়ে রইল। জোবেদ আলি টের পাচ্ছেন মেয়েটি রেগে

যাচ্ছে। তিনি রাগ কমানোর চেষ্টা করলেন না। মাথা নিচু করে চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগলেন। চিত্রা বলল, 'আপনার বই লেখা কেমন এগুচ্ছে?'

'ভালো।'

'এখন কি লিখছেন?'

'সৌন্দর্য কি? এই বিষয়ে একটা লেখা।

'সৌন্দর্য কি?'

জোবেদ আলি হাসি মুখে বললেন, 'তা তো জানি না।'

'যা জানেন না তার উপর লিখছেন কি ভাবে?'

'সৌন্দর্য কি তা যে আমি জানি না সেটাই লেখার চেষ্টা করছি।'

'আপনার কথা বুঝলাম না।'

'সব কথা যে বুঝতেই হবে এমন তো না। কথা না বোঝার মধ্যেও আনন্দ আছে।'

'আমি এখন চলে যাব।'

'আচ্ছা।'

আমার মনটা খুব খারাপ আপনি আমার মন ভালো করে দিন।'

'মন কি ভাবে ভালো করব তা তো বুঝতে পারছি না। প্রবন্ধ যেটা লিখছি সেটা পড়ে শুনাব?'

'না।'

চিত্রা উঠে দাঁড়াল। গম্ভীর মুখে বলল, 'আমি যাচ্ছি।' জোবেদ আলি বললেন, 'এমন রাগী রাগী ভাব করে চলে যেও না, তারপর দেখবে নিজেরই খারাপ লাগবে। খানিকক্ষণ বসে মনটা ভালো করে তারপর যাও।'

'আমার মন ভালো হবে না।'

'মন ভালো হবার ব্যবস্থা করছি।'

'কি ব্যবস্থা?'

'তোমাকে একটা উপহার দিচ্ছি। উপহার পেলে মেয়েদের মন ভালো হয়।'

'খুব ভুল কথা বলেছেন। মেয়েদের এত ছোট করে দেখবেন না। মেয়েরা উপহারের কাঙাল না।'

'আমি যে উপহার দেব তা পেয়ে তুমি অসম্ভব খুশি হবে তা আমি লিখে দিতে পারি।'

'উপহারটা কি?'

জোবেদ আলি উঠলেন। টেবিলের ড্রয়ার খুলে বেশ বড়সড় সাইজের একটা পাথর বের করে আনলেন। বিশেষত্বহীন পাথর। এইসব পাথর ভেঙেই রেললাইনে দেয়া হয়। দালান-কোঠা তৈরিতে ব্যবহার হয়। এর বেশি কিছু না। চিত্রা আগ্রহী গলায় বলল, 'এই আপনার উপহার?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার ধারণা এই পাথর পেয়ে আমি আনন্দে আত্মহারা হব?'

'হ্যাঁ হবে। কারণ এই পাথরে কিছু লেখা আছে।'

'কি লেখা?'

চিত্রা গভীর আগ্রহে পাথর হাতে নিল। কোনো লেখা দেখতে পেল না। সারা পাথরের গায়ে বল পয়েন্টে অসংখ্য গুণ চিহ্ন আঁকা।

'এই গুণ চিহ্নের মানে কি?'

জোবেদ আলি সিগারেট ধরাতে ধরাতে হাসি মুখে বললেন, 'একটা গুণ চিহ্ন আঁকতে দু'টা দাগ দিতে হয়। দু'টা দাগ মানে দু'জন মানুষ। দু'টা দু'দিকে– তার মানে মানুষ দু'জন ভিন্ন প্রকৃতির। একটা জায়গায় দাগ দু'টি মিলেছে– তার মানে হলো দু'টি ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ একটা জায়গায় মিলেছে। অর্থাৎ একটি ক্ষেত্রে তারা এক ও অভিন্ন। এরা দু'জন দু'জনকে পছন্দ করে।'

চিত্রা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। জোবেদ আলি বললেন, 'উপহার পছন্দ হয়েছে?'

চিত্রা গাঢ় স্বরে বলল, 'হ্যাঁ।'

জোবেদ আলি বললেন, 'তুমি বেশ কিছুদিন আগে আমাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলে। আমি ভেবেছিলাম কোনোদিন সেই চিঠির জবাব দেব না। আজ এই পাথর দিয়ে জবাব দিলাম।'

চিত্রা ধরা গলায় বলল, 'থ্যাংক য়্যু। আমি খুব খুশি হয়েছি।'

'বেশ, তাহলে এখন যাও। আমি এখন "সৌন্দর্য বিষয়ে আমার অজ্ঞতা" প্রসঙ্গে লেখাটা শেষ করব।'

চিত্রা পাথর নিয়ে বের হয়ে এলো। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় পাথরটা সে গালে চেপে রাখল। তার চোখ পানিতে ভর্তি হয়ে আসছে।

২

'তোর কোলে এটা কি?'

চিত্রা মা'র দিকে না তাকিয়ে সহজ গলায় বলল, 'পাথর। এর ইংরেজি নাম Stone.'

সুরমা বিস্মিত গলায় বললেন, 'পাথর কোলে নিয়ে বসে আছিস কেন?'

চিত্রা এবার মা'র দিকে তাকাল। শান্ত গলায় বলল, 'বাংলাদেশ সংবিধানে এমন কোনো ধারা আছে যে পাথর কোলে নিয়ে বসে থাকা যাবে না?'

'সব কথায় তুই এমন প্যাঁচালো জবাব দিস কেন? সরাসরি জবাব দিতে অসুবিধা কি? রশীদ আমাকে বলল, তুই নাকি সারাক্ষণ একটা পাথর নিয়ে ঘুরিস। আমি তার কথা বিশ্বাসই করি নি। এখন দেখছি সত্যি।'

'পাথর নিয়ে ঘোরা কোনো বড় অপরাধের মধ্যে পড়ে না মা। পাথর ছুঁড়ে কারো মাথার ঘিলু বের করে দিলে বাংলাদেশ পেনাল কোডের ৩০২ ধারায় মামলা হবে। পাথর তো আমি ছুঁড়ে মারছি না। কোলে নিয়ে বসে আছি।'

'শুধু শুধু পাথর কোলে নিয়ে বসে আছিসইবা কেন?'

'আচ্ছা যাও আমি পাথর রেখে আসছি, অকারণে চেঁচিও না তো মা।'

চিত্রা পাথর নিয়ে তার ঘরে ঢুকে পড়ল। সুরমা শংকিত চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। শংকিত হবার তাঁর যথেষ্ট কারণ আছে। পাথর নিয়ে চিত্রার বাড়াবাড়িটা আজ না অনেক আগেই তাঁর চোখে পড়েছে। তিনি কিছু বলেন নি। ব্যাপারটা কি বোঝার চেষ্টা করেছেন। সুরমা এই সংসারে বোকার একটা ভাব ধরে থাকে। সংসার পরিচালনায় এতে তাঁর খুব লাভ হয়। বোকাদের সাথে কথা বলার ব্যাপারে সবাই অসাবধানে থাকে। তাতে অনেক সুবিধাও পাওয়া যায়।

চিত্রা যে জোবেদ আলি নামের আধবুড়ো মানুষটার জন্য পাগল হয়ে আছে তা তিনি বুঝেছেন চিত্রা বোঝার আগেই। কিন্তু যেহেতু সংসারে তিনি বোকা সেজে থাকেন সেহেতু চিত্রাকে কিছু বুঝতে দেন নি। চিত্রা তাঁকে ভুলাবার জন্যে নানান ধরনের অভিনয় করছে। খুব কাঁচা অভিনয়। যখন তাকে বলা হয় যা তো জোবেদ সাহেবকে এক কাপ চা দিয়ে আয় কিংবা এই হালুয়াটা দিয়ে আয়, সে বলবে– আমি পারব না মা। আমার উপরে যেতে ইচ্ছা করে না। তিনি যতই জোড়াজুড়ি করবেন সে ততই না করবে, শেষে নিতান্ত অনিচ্ছায় উঠে যাবে। ফিরবে এক থেকে দু'ঘণ্টা পর।

এইসব লক্ষণ খুবই খারাপ। অল্প বয়সের ভালোবাসা অন্ধ গণ্ডারের মতো শুধুই একদিকে যায়। যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, আদর দিয়ে এই গণ্ডার সামলানো যায় না। সুরমা আতংকে অস্থির হয়ে আছেন। আতংকটা প্রকাশ করছেন না। পুরো ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছেন। সমস্যাটা ভালোমত বুঝতে পারলে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা যাবে। সমস্যাটা ভালোমত বুঝতেও পারছেন না।

জোবেদ আলি সাহেবের ভূমিকাটা এখানে কি? ভদ্রলোক অতি বুদ্ধিমান। চিত্রার সমস্যাটা তাঁর বুঝতে না পারার কথা না। তিনি কি মেয়েটাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন? না সমস্যাটা সামলাবার চেষ্টা করছেন? একজন দায়িত্বশীল বিচক্ষণ ভদ্রলোক এইসব ব্যাপার কখনো প্রশ্রয় দেবেন না। তাঁর বড় মেয়ের বয়স চিত্রার চেয়ে বেশি। প্রশ্রয় দিতে গেলে এই কথাটা তাঁর অবশ্যই মনে পড়বে। তবে ভদ্রলোকের নিজের মনেও যদি কোনোরকম দুর্বলতা জমে থাকে তাহলে তিনিও অন্ধ গণ্ডারের মতো আচরণ করবেন। পাথরের যে দেবতা সেও পূজা গ্রহণ করে, মানুষ কেন করবে না?

এখন যা করতে হবে তা হলো ভদ্রলোককে এ বাড়ি থেকে সরিয়ে দিতে হবে। এই কাজটা তিনি করতে পারবেন না, চিত্রার বাবাকে দিয়ে করাতে হবে। তবে চিত্রার বাবাকে আসল কথা কিছুই বলা যাবে না। মেয়ের পাগলামি মানুষটার কানে গেলে ভয়ংকর কিছু ঘটে যেতে পারে। সুরমা তাঁর সংসারে ভয়ংকর কিছু চান না।

সুরমা রাতের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে চিত্রার ঘরে গেলেন। কিছুক্ষণ গল্পগুজব করবেন। গল্প করার ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে জোবেদ আলি সম্পর্কে কিছু কথা বলে দেখবেন মেয়ের মুখের ভাব বদলায় কি না। দরকার হলে আজ রাতে মেয়ের ঘরে ঘুমুবেন।

চিত্রা মশারি খাটিয়ে শুয়ে পড়ার আয়োজন করছিল। চিত্রা মা'কে দেখে বলল, 'কি হয়েছে মা?'

সুরমা হাই তুলতে তুলতে বললেন, 'আজ তোর সঙ্গে ঘুমব রে মা।'

'আমর সঙ্গে ঘুমুবে কেন?'

'তোর বাবার সঙ্গে ঝগড়ার মতো হয়েছে। এই জন্যে।'

'অসম্ভব। মা তুমি আমার সঙ্গে ঘুমুতে পারবে না। তোমার গা থেকে মশলার গন্ধ আসে।'

'কি বলিস তুই, গা থেকে মশলার গন্ধ আসবে কেন?'

'সারাদিন রান্নাবান্না নিয়ে থাকো, মশলার গন্ধ তো আসবেই– এখন আসছে হলুদ আর পেঁয়াজের গন্ধ। তাছাড়া মা তিনজনের এক বিছানায় জায়গাও হবে না। বিছানা ছোট।'

সুরমা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'তিনজন কোথায়?'

'আমি, তুমি আর পাথর। পাথরটা রাতে আমার সাথে ঘুমায়।'

'পাথর রাতে তোর সঙ্গে ঘুমায়?'

'হ্যাঁ।'

'আমার তো মনে হয় তুই পাগল-টাগল হয়ে যাচ্ছিস।'

'পাগল হব কেন? পাথর সঙ্গে নিয়ে ঘুমালেই মানুষ পাগল হয়ে যায় না। তুমি কি পুতুল সঙ্গে নিয়ে ছোটবেলায় ঘুমুতে না? পাথরটা হচ্ছে আমার পুতুল।'

'পাথরটাকে তুই গোসল দিস? রশীদ আমাকে বলছিল।'

'রশীদ তো দেখি বিরাট বড় স্পাই হয়েছে। কি করি না করি সব রিপোর্ট করছে।'

'পাথরটাকে তুই গোসল দিস কি-না সেটা বল।'

'হুঁ দেই।'

'কেন?'

'এম্নি দেই মা। এটা একটা খেলা। মজার খেলা। আমার তো খেলার কেউ নেই, কাজেই পাথর নিয়ে খেলা। তুমি তো আর আমার সঙ্গে খেলবে না।'

সুরমা মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। চিত্রার মশারি খাটানো শেষ হয়েছে। সে তার পড়ার টেবিল থেকে পাথরটা নিয়ে বালিশে শুইয়ে দিয়ে মা'র দিকে তাকিয়ে হালকা গলায় বলল, 'এসো ঘুমুতে এসো মা। রাত প্রায় বারোটা বাজে।'

'তুই সত্যি সত্যি পাথর নিয়ে ঘুমুবি?'

'হুঁ।'

'পাথরটা তোকে কে দিয়েছে জোবেদ সাহেব?'

'ইয়েস মাদার।'

'তিনি তোকে খুব স্নেহ করেন?'

'স্নেহ করেন না হাতি। স্নেহ করলে কেউ কাউকে পাথর দেয়? দামি গিফট-টিফট দিতে পারে।' আড়ং-এর সেলোয়ার বা পাথর বসানো নেকলেস।'

'পাথরটা দিলেন কেন?'

'উফ মা চুপ করো তো। তোমার বকবকানির কারণে পাথর বেচারা ঘুমুতে পারছে না। ও ডিসটারবেন্স একেবারে সহ্য করতে পারে না। এই শেষবারের মতো আমি তোমাকে আমার ঘরে ঘুমুতে দিলাম। আর না।'

চিত্রা ঘুমিয়ে পড়েছে। তার একটা হাত পাথরের উপর রাখা। সুরমা গভীর দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করলেন ঘুমের মধ্যেই চিত্রা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। চোখের জলে বালিশ ভিজে যাচ্ছে। পাথরটা টেনে বুকের কাছে নিয়ে নিল। একি সর্বনাশ! সুরমা সারারাত জেগে রইলেন।

৩

জোবেদ আলি বললেন, 'তোমার কি খবর?'

চিত্রা হাসিমুখে বলল, 'আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি।'

'খুব ভালো কথা, বিরক্ত করো।'

'জ্ঞানের কিছু কথা জানিয়ে দিন তো।'

'জ্ঞানের কথা জানতে চাও?'

'হুঁ চাই। জ্ঞানের কথা বলতে বলতে আপনি যখন ক্লান্ত হয়ে যাবেন তখন কিছুক্ষণ ভালোবাসার কথা বলতে পারেন।'

'ভালোবাসার কথাও শুনতে চাও?'

'হুঁ চাই। আপনি নিশ্চয়ই আমাকে খুব অসভ্য মেয়ে ভাবছেন। ভাবলে ভাববেন। আমি কেয়ার করি না।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ তাই। এখন থেকে আমি ঠিক করেছি যখনই আমার জ্ঞানের কথা শুনতে ইচ্ছা করবে তখনি আমি চলে আসব। সেটা সকাল হতে পারে দুপুর হতে পারে আবার রাত তিনটাও হতে পারে। কাজেই কখনো যদি রাত তিনটায় আপনার দরজায় টুক টুক শব্দ হয় তাহলে ভূতটুত ভেবে বসবেন না। এখন বলুন আপনার জ্ঞানের কথা।'

'জ্ঞানের কথা শুনবে?'

'হুঁ।'

'ফেরাউনদের সময়কার হিরেলোগ্রাফি দিয়ে একটা গল্প বলব?'

'বলুন।'

'কাগজ-কলম দাও গল্প বলি।'

'গল্প বলতে কাগজ-কলম লাগে?'

'এই গল্পে লাগে। গল্পটা হচ্ছে আদি ও মৌলিক গল্প। গল্পের মজাটা হলো চিত্রলিপিতে, গল্প শোনার সঙ্গে কি ছবি আঁকা হচ্ছে তা খেয়াল রাখবে–

এক দেশে এক রাজা ছিল

রাজার এক রানী ছিল

রাজা ও রানী সুখে বাস করত

এক সময় রানী গর্ভবতী হলেন

তখন হঠাৎ রাজা মারা গেলেন

যথাসময়ে রানীর এক সন্তান হলো

এক সময় রানীও মারা গেলেন

বেঁচে রইল শুধু রাজকুমার। 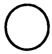

এবং রাজকুমারের মধ্যে রাজবংশের ভবিষ্যৎ বীজ। 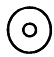

চিত্রকথায় পুরো গল্পটা হবে–

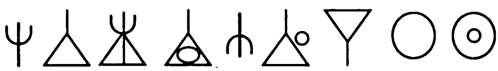

গল্পটা কেমন লাগল?

চিত্রা ক্ষীণ গলায় বলল, 'অদ্ভুত।' জোবেদ আলি বললেন, 'ছবি এঁকে এঁকে বান্ধবীদের সঙ্গে এই গল্পটা করবে, দেখবে ওরা খুব মজা পাবে।'

চিত্রা গম্ভীর মুখে বলল, 'আমার কোনো বান্ধবী নেই। বান্ধবী থাকলে অবশ্যই এই গল্পটা বলতাম। আচ্ছা আপনি কি হাত দেখতে পারেন?'

'না।'

'আমার মনে হচ্ছে পারেন। প্লিজ আমার হাত দেখে দিন।'

'এস্ট্রলজির দু'একটা বইটই পড়েছি– কিন্তু হাত দেখার উপর কোনো বই পড়ি নি।'

চিত্রা বলল, 'আমি হাত দেখার উপর কোনো বই পড়িনি– কিন্তু আমি হাত দেখতে জানি। একজনের কাছ থেকে শিখেছি– দেখি আপনার হাতটা দিন– আমি দেখে দেই।'

'এই বয়সে তুমি আমার হাতে কিছু পাবে না। মৃত্যু রেখা পেতে পারো। মৃত্যু রেখার ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নেই।'

'আপনার না থাকলেও আমার আছে।'

জোবেদ আলি গম্ভীর গলায় বললেন– 'হাত দেখাটেখা কিছু না, তুমি আসলে আমার হাত ধরার একটা অজুহাত খুঁজছ।'

'আপনার তো বেশি বুদ্ধি এইজন্যে সব আগেভাগে বুঝে ফেলেন। আপনার হাত ধরতে চাইলে আমি সরাসরিই হাত ধরতাম, ভণিতা করতাম না।'

'হাত ধরতে চাও না?'

চিত্রা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে গাঢ় গলায় বলল, 'চাই।'

জোবেদ আলি হাত বাড়িয়ে দিলেন।

সুরমা ছাদে এসেছিলেন শুকনা কাপড় নিতে। শুকনা কাপড় নেয়াটা তাঁর অজুহাত, তিনি আসলে এসেছেন চিত্রা কি করছে তা দেখার জন্যে। কাপড় তুলতে তুলতে নিঃশব্দে দেখে চলে যাবেন এই ছিল তাঁর পরিকল্পনা। তিনি খোলা জানালায় যে দৃশ্য দেখলেন তা দেখার জন্যে তাঁর কোনো মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। তাঁর শরীর কাঁপতে লাগল। তিনি দেখলেন চিত্রা দু'হাতে জোবেদ আলির হাত চেপে ধরে আছে এবং ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। জোবেদ আলি মূর্তির ভঙ্গিমায় বসে আছেন।

সুরমা সম্বিৎ ফিরে পেয়েই দ্রুত নিচে নেমে গেলেন। সারা বিকাল তাঁর বুক ধড়ফড় করতে লাগল। সন্ধ্যায় প্রচণ্ড মাথা ধরল। রাতে তিনি কিছু খেতে পারলেন না। আজীজ সাহেব রাতের খাওয়া শেষ করে ঘুমুতে এলে সুরমা বললেন– 'জোবেদ সাহেব তো অনেকদিন থাকলেন, এখন চলে যেতে বললে কেমন হয়?'

আজীজ সাহেব চোখ সরু করে তাকালেন। স্ত্রীর সব কথাতেই তিনি চোখ সরু করেন। এবার যেন আরও বেশি সরু করলেন।

'বোকার মতো কথা বলবে না। একজন ভদ্রলোককে খামখা চলে যেতে বলব কেন? অসুবিধাটা কি? মাসে মাসে দু'হাজার টাকা পাচ্ছ। এটা সহ্য হচ্ছে না? তুমি হাঁড়ি-পাতিল নিয়ে আছ হাঁড়ি-পাতিল নিয়ে থাকো।'

সুরমা তারপরেও ক্ষীণ গলায় বললেন, 'একজন পুরুষ মানুষ ছাদে থাকে– মেয়েরা ছাদে কাপড় শুকুতে যায়।'

'তাতে হয়েছে কি?'

'না কিছু হয় নি।'

'কাকে ভাড়া দেব কাকে দেব না এইসব চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। চিন্তার মানুষ আছে।'

'আচ্ছা।'

'বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে আসো।'

সুরমা বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে গেলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর এক ফোঁটা ঘুম হলো না। এক রাতে চারবার চিত্রার শোবার ঘরে গেলেন দেখার জন্যে চিত্রা ঘরে আছে কি-না। তাঁর মনে হলো বাকি জীবনে তিনি আর কখনোই রাতে ঘুমুতে পারবেন না।

চিত্রার ঘরের বাতিও জ্বলছে। বাতি জ্বেলে সে কি করছে? দরজায় টোকা দিয়ে কিছু

জিজ্ঞেস করবেন? চিত্রা রেগে যাবে না তো? সে আজকাল অল্পতেই রেগে আগুন হচ্ছে। অকারণেই রাগছে। তিনি মেয়ের ঘরের দরজায় টোকা দিলেন। টোকার শব্দ শুনেই চিত্রা বলল, 'কি চাও মা?'

'ঘুমাচ্ছিস না?'

'না।'

'না কেন?'

'ওর ঘুম ভেঙে গেছে কাজেই আমিও জেগে আছি। গল্প করছি।'

'কার সঙ্গে গল্প করছিস?'

'পাথরটার সঙ্গে।'

'মা দরজাটা একটু খুল তো।'

সুরমা ভেবেছিলেন মেয়ে দরজা খুলবে না। রাগ করবে। সে রকম হলো না। চিত্রা দরজা খুলল। তার এক হাতে পাথর। মেয়ে কি সারাক্ষণই পাথর হাতে বসে থাকে! সুরমা ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'তুই পাথরের সঙ্গে গল্প করছিলি?'

'হুঁ।'

'পাথর কথা বলতে পারে?'

'পাথর কি কথা বলবে? পাথর কি মানুষ না-কি! আমি কথা বলি ও শুনে।'

'তুই ঘুমুতে যাস কখন?'

'আমি ঘুমুতে যাই না। রাতে আমার ঘুম হয় না মা। আগে ঘুমের অষুধ খেলে ঘুম হতো এখন তাও হয় না। আজ পাঁচটা ঘুমের অষুধ খেয়ে শুয়েছিলাম। ঠিক এক ঘণ্টা পর জেগে উঠেছি।'

'তুই একজন ভালো ডাক্তার দেখা।'

'শুধু শুধু ডাক্তার দেখাব কেন? আমার জ্বর হয় নি। মাথাব্যথা হচ্ছে না। দিব্যি আরামে আছি। মা তুমি এখন যাও তার সঙ্গে আমার খুব গোপন কিছু কথা আছে। তোমার সামনে বলা যাবে না।'

'তুই শুয়ে থাক আমি তোর চুলে বিলি দিয়ে দি।'

'তুমি আমাকে অনেক বিরক্ত করেছ। এখন যাও আর না।'

তিনি বের হয়ে এসে জায়নামাজে বসলেন। ফজর ওয়াক্ত পর্যন্ত দোরুদ পাঠ করলেন। দুরুদে শেফা।

ফজরের নামাজ শেষ করেই তিনি খতমে ইউনুস শুরু করলেন। এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বার পড়তে হবে দোয়া ইউনুস। ইউনুস নবী এই দোয়া পড়ে মাছের পেট থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। সুরমা যে বিপদে পড়েছেন– মাছের পেটে বাস করা তার কাছে কিছুই না। কিছু কিছু বিপদ থাকে মাকড়সার জালের মতো সূক্ষ্ম– চোখে পর্যন্ত দেখা যায় না, কিন্তু মাকড়সার জালের মতো হালকা না। এই ধরনের বিপদ-আপদ থেকে সচরাচর উদ্ধার পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র আল্লাহপাকের অসীম দয়াতেই উদ্ধার সম্ভব। তিনি তো কোনো পাপ করেন নি। আল্লাহপাক কি তাকে দয়া করবেন না?

আল্লাহপাক সুরমাকে দয়া করলেন– এক রোববার ভোরে আজীজ সাহেবের বাড়ির উঠান লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। উঠানে জোবেদ আলি হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছেন– তাঁর মাথা থ্যাঁতলানো। ঘিলু বের হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে গেছে। ভয়াবহ দৃশ্য। মানুষটা খুব ভোরবেলা তিনতলার ছাদ থেকে লাফিয়ে নিচে পড়ে গেছে।

আজীজ সাহেব মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তাঁর লাভের গুড় পিঁপড়া খেয়ে ফেলল। ঘটনা সামলাবার জন্যে পুলিশকে ষাট হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। পুলিশ ইচ্ছা করলে কৃষ্ণপক্ষের রাতকে চৈত্র মাসের দিন করে ফেলতে পারে। সামান্য আত্মহত্যাকে মার্ডার বলতে তাদের আটকাবে না। সম্পূর্ণ বিনাকারণে তাকে জেলহাজতে পচতে হবে।

পুলিশের সমস্যা সামাল দিলেও আজীজ সাহেব ঘরের সমস্যা সামাল দিতে পারলেন না। চিত্রার মাথা পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেল। তার কথা অস্পষ্ট হয়ে গেল। কাকে কি বলে না বলে কিচ্ছু বোঝা যায় না। তার খাওয়ার ঠিক নেই, নাওয়ার ঠিক নেই। সারাদিন তার কোলে থাকে পাথর। সে নিজে গোসল করে না, পাথরটা রোজ গোসল দেয়। গুনগুন করে পাথরকে কি যেন বলে।

আজীজ সাহেব হতভম্ব গলায় বললেন, 'এর কি হয়েছে? এ রকম করে কেন?'

সুরমা বললেন, 'কিচ্ছু না। ঠিক হয়ে যাবে। এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, মাথা তো খানিকটা এলোমেলো হবেই।'

'কারো মাথা এলোমেলো হলো না, তারটা হলো কেন?'

'বাচ্চা মানুষ। ঠিক হয়ে যাবে।'

'পাথর নিয়ে এইসব কি করছে?'

'বললাম তো ঠিক হয়ে যাবে, কয়েকটা দিন যাক।'

'ব্যাপারটা কি ঠিকমত গুছিয়ে বলো তো।'

'ব্যাপার কিছু না, জোবেদ ভাই চিত্রাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। সারাক্ষণ মা মা ডাকতেন। চিত্রা দেখতেও তাঁর মেয়ের মতো। নিজের মেয়েকে দেখেন না সেই জন্যে ...।

'তিনি চিত্রাকে স্নেহ করতেন বলে চিত্রাকে একটা পাথর গালে লাগিয়ে বসে থাকতে হবে? আমি তো কিচ্ছু বুঝছি না– ঐ হারামজাদার সঙ্গে আমার মেয়ের কি হয়েছে?'

'তুমি মাথা গরম করো না। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা তো করানো দরকার।'

'চিকিৎসা করাব, কয়েকটা দিন যাক।'

চিত্রার অসুখ সারতে দীর্ঘদিন লাগল।

এক সকালে সে তার স্যুটকেসে পাথর ভরে রেখে সহজ গলায় মা'কে বলল, 'মা নাশতা দাও ক্ষিদে লেগেছে।'

সুরমা মনের আনন্দে কেঁদে ফেললেন। তার দু'বছর পর চিত্রার বিয়ে হয়ে গেল এক ডাক্তার ছেলের সঙ্গে। শ্যামলা হলেও ছেলেটি সুপুরুষ। খুব হাসি-খুশি, সারাক্ষণ মজা

করছে। চিত্রার তার স্বামীকে খুব পছন্দ হলো। পছন্দ হবার মতোই ছেলে। চিত্রা মণিপুরী পাড়ায় তার স্বামীর পৈত্রিক বাড়িতে বাস করতে গেল। তার জীবন শুভ খাদে বইতে শুরু করল।

তের বছর পরের কথা।

চিত্রা তার মেয়েকে নিয়ে কিছুদিন বাবার বাড়িতে থাকতে এসেছে। চিত্রার স্বামী গিয়েছে ভিয়েনার ডাক্তারদের কি একটা সম্মেলনে। চিত্রারও যাবার কথা ছিল, টিকিট-ভিসা সব হয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যাবেলা ফ্লাইট, ভোরবেলা ছোট একটা দুর্ঘটনা ঘটল। চিত্রার মেয়ে রুনি সিঁড়ি থেকে পা পিছলে পড়ে সামনের একটা দাঁত ভেঙে ফেলল। এমন কোনো বড় দুর্ঘটনা না। কিছু রক্তে পড়েছে, ঠোঁট কাটার জন্যে ফুলে গেছে। এতেই চিত্রা অস্থির হয়ে গেল। সে কিছুতেই মেয়েকে ফেলে যাবে না। সে থেকে যাবে। রুনি যতবারই বলে, তুমি যাও তো মা ঘুরে আসো। তুমি না গেলে বাবা মনে কষ্ট পাবে। ততবারই চিত্রা বলে, তুই মাতাব্বরি করবি না তো। তোর মাতাব্বরি অসহ্য লাগে।

'বাবা এত আগ্রহ করে তোমাকে নিতে চাচ্ছে, তাঁর কত রকম প্ল্যান।'

'যথেষ্ট বকবক করেছিস। আর না। তোকে ফেলে রেখে আমি যাব না। এটা আমার ফাইন্যাল কথা।'

মা'র বাড়িতে এসে চিত্রার খুব ভালো লাগছে। তার কাছে মনে হচ্ছে পৃথিবীর কিছু কিছু জিনিস বদলায় না। সেই কিছু কিছু জিনিসের একটি হচ্ছে মা'র বাড়ি। মা বদলে গেছেন। একটা চোখে কিছুই দেখেন না। হাত কাঁপা রোগ হয়েছে– পারকিনসনস ডিজিজ। সারাক্ষণই হাত কাঁপে। কিন্তু মনের দিক থেকে আগের মতোই আছেন। খানিকটা পরিবর্তন অবশ্যি হয়েছে– আগে বোকার ভাব ধরে থাকতেন এখন থাকেন না। স্বামীর মৃত্যুর পর বোকা ভাব ধরে থাকার প্রয়োজন সম্ভবত ফুরিয়েছে। ভাড়াটে, স্বামীর ব্যবসা, দোকান সব তিনি নিজে চালান এবং ভালোই চালান। আজীজ সাহেব তার বোকা স্ত্রীর কর্মক্ষমতা দেখে যেতে পারেন নি। দেখে গেলে বিস্মিত হতেন।

চিত্রা বেশিরভাগ সময় তার মায়ের সঙ্গে গল্প করে কাটায়। তার সব গল্পই স্বামী এবং কন্যাকে কেন্দ্র করে।

'রুনির খুব বুদ্ধি হয়েছে মা। ওর বুদ্ধি দেখে মাঝে মাঝে ভয় লাগে।'

'বুদ্ধি তো ভালো জিনিস। বুদ্ধি দেখলে ভয় লাগবে কেন?'

'অতিরিক্ত বুদ্ধির মানুষ অসুখী হয় এই জন্যেই ভয়। যার মোটামুটি বুদ্ধি সে থাকে সুখে। এই যে আমাকে দেখো আমি সুখে আছি।'

'সুখে আছিস?'

'খুব সুখে আছি।'

'স্বামীর ভালোবাসা পুরোপুরি পেয়েছিস?'

'হুঁ। ও আমাকে জিজ্ঞেস না করে কিছু করে না। একদিন কি হয়েছে মা শোনো,

ওর স্কুল জীবনের এক বন্ধুর ছেলের জন্মদিনে গিয়েছে। আমারও যাবার কথা– ভাইরাস জ্বরে ধরেছে বলে যাই নি। ও একা গিয়েছে। রাত আটটায় তার টেলিফোন। টেলিফোনে বলল, রুনি আমার বন্ধু খুব ধরেছে বাসায় খেতে আসতে। খেয়ে আসব? আমি বললাম, এ কি রকম কথা? বন্ধু খেতে বলেছে খেয়ে আসবে এর মধ্যে জিজ্ঞেস করা করির কি আছে। অবশ্যিই খেয়ে আসবে। টেলিফোনটা যে করেছে তারও ইতিহাস আছে। বন্ধুর বাসায় টেলিফোন নেই, কার্ডফোন থেকে করেছে।

সুরমা হাসি মুখে বললেন, 'গৃহপালিত স্বামী।'

চিত্রা আনন্দিত গলায় বলল, 'আমার গৃহপালিত স্বামীই ভালো।'

'পোষ মানাতে পারলে সব স্বামীই গৃহপালিত হয়। তুই পোষ মানানোর কায়দা জানিস। আমি জানতাম না।'

'তুমিও জানতে। তুমি সেই কায়দা ব্যবহার করো নি। বোকা টাইপের স্ত্রী স্বামীকে গৃহপালিত করে ফেলতে চায়– যাদের খুব বেশি বুদ্ধি তারা চায় না। ঠিক বলি নি মা?'

'মনে হয় ঠিকই বলেছিস।'

'ও দশদিনের জন্যে ভিয়েনা গিয়েছে। কিন্তু মা আমি নিশ্চিত ও চারদিনের মাথায় ফিরে আসবে। এই নিয়ে আমি এক লক্ষ টাকা বাজি ধরতে পারি। বাজি ধরবে?'

'পাগল হয়েছিস, বাজি ধরলেই আমি হারব।'

মনের আনন্দে চিত্রা হাসতে লাগল। সেই হাসি দেখে সুরমার মন ভরে গেল। তিনিও অনেকদিন পর মন খুলে হাসলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর এমন আনন্দময় সময় তাঁর জীবনে আসে নি।

রাতে শোবার সময় রুনি রহস্যময় গলায় বলল, 'মা দেখো কি পেয়েছি। এই তাকাও একটু।'

'কি পেয়েছিস?'

'একটা পাথর। এই দেখো মা– পাথরটার গাটা কি স্মুথ।'

চিত্রা তাকাল। তার শরীর মনে হলো জমে গেছে। শরীরের ভেতরটা জমে গেলেও হাত-পা কাঁপছে। রুনি বিস্মিত হয়ে বলল, 'তোমার কি হয়েছে মা?'

চিত্রা জড়ানো গলায় বলল, 'পাথর কোথায় পেয়েছিস?'

'খাটের নিচে। তুমি এ রকম করছ কেন?'

চিত্রার মাথা যেন কেমন করছে। সে এসে খাটে বসল।

রুনি বলল, 'পানি খাবে মা? পানি এনে দেব?'

'হুঁ।'

রুনি পানির গ্লাস হাতে এনে দেখে তার মা পাথর কোলে নিয়ে বসে আছে। মা'র কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। মুখ রক্তশূন্য। যেন অনেকদিন কঠিন রোগ ভোগ করে উঠেছে।

'মা পানি নাও।'

চিত্রা আগের মতোই জড়ানো গলায় বলল, 'পানিটা খাইয়ে দাও মা।' কথা অস্পষ্ট শুনাল। আবার তার পুরানো অসুখটা কি ফিরে আসছে?

'পাথরটা কোলে নিয়ে বসে আছ কেন মা?'

'ছোটবেলায় আমি এই পাথর নিয়ে খেলতাম।'

'এত বড় পাথর নিয়ে কি খেলতে?'

'পাথরটাকে গোসল করাতাম। আদর করতাম। ঘুমুবার সময় সঙ্গে নিয়ে ঘুমাতাম। চুমু খেতাম।'

'কেন?'

'তখন আমার একটা অসুখ হয়েছিল।'

'অসুখটা কি এখনো আছে?'

'না।'

'ঘুমুবে না মা?'

'হ্যাঁ ঘুমাব।'

চিত্রা পাথর সঙ্গে নিয়েই ঘুমুতে গেল। রুনি দেখল কিন্তু কিছুই বলল না। মা'কে তার এখন খুবই অচেনা লাগছে। মনে হচ্ছে মা অপরিচিত একটা মেয়ে যাকে সে চিনতে পারছে না, মাও তাকে চিনছে না। রুনি ভয়ে ভয়ে ডাকল, 'মা মা।'

চিত্রা মেয়ের দিক থেকে মুখ সরিয়ে অন্য পাশে ফিরল। তার হাতে পাথরটা ধরা। রুনি আবার ডাকল, 'মা মা, একটু এদিকে ফেরো।'

চিত্রা ফিরল না বা জবাবও দিল না। রাত বাড়তে লাগল। পুরো বাড়ি ঘুমিয়ে পড়লেও চিত্রা ঘুমুতে পারছে না। ঘুম না হবার জন্যে তার কষ্টও হচ্ছে না। ঘর অন্ধকার। পাশেই তার মেয়ে ঘুমুচ্ছে। মাথার উপরে ফ্যান ঘুরছে। বারান্দার বাতির খানিকটা আলো এসে পড়েছে বিছানায়। চিত্রা ঘুমুচ্ছে তার পরিচিত ঘাটে। এই ঘরের প্রতিটি জিনিস তার চেনা– তারপরও সে কেমন অচেনা হয়ে গেছে। মাথা কেমন ঝিমঝিম করছে। মনে হচ্ছে সে একগাদা ঘুমের অষুধ খেয়েছে।

'চিত্রা।'

চিত্রা বলল, 'হুঁ।'

'তুমি কেমন আছ?'

'ভালো।'

'পাশে যে ঘুমুচ্ছে সে কি তোমার মেয়ে?'

'হুঁ।'

কেউ একজন তাকে প্রশ্ন করছে। সেই কেউটা কে? পাথরটা কি প্রশ্ন করছে? হ্যাঁ তাই তো পাথরটা তো কথা বলছে। চিত্রা বিস্মিত হলো না। পাথরটা তার সঙ্গে কথা বলছে এটা তার কাছে খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। সে জবাব দিচ্ছে এটও স্বাভাবিক। কেন সে জবাব দেবে না?

'চিত্রা!'

'হুঁ!'

'তোমার সুন্দর সংসার হয়েছে এটা দেখেও আমার ভালো লাগছে।'

'হুঁ।'

'আমি জানতাম তোমার সুন্দর সংসার হবে।'

'আপনি মরে গেলেন কেন?'

'মৃত্যু খুব স্বাভাবিক ব্যাপার নয় কি?'

'এভাবে মরলেন কেন?'

'যেভাবেই মরি, মৃত্যু হচ্ছে মৃত্যু।'

'জ্ঞানের কথা ভালো লাগছে না!'

'পৃথিবীর সব কথাই জ্ঞানের কথা।'

'আপনি মরে গেলেন কেন?'

'কেউ একজন ভেবেছিল আমার মৃত্যুতে তোমার সমস্যা সমাধান হবে। হয়েছেও তাই। তোমার এখন আর কোনো সমস্যা নেই।'

'আপনাকে কি কেউ ধাক্কা দিয়ে ফেলেছিল?'

'হুঁ।'

'আমার তাই মনে হয়েছে। আপনার ডেড বডি উঠোনে পড়ে ছিল– আমি দেখতে যাই নি।'

'ভালো করেছ। দৃশ্যটা অসুন্দর। অসুন্দর কিছু না দেখাই ভালো।'

'কে আপনাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছিল?'

'যেই ফেলুক। তার উপর আমার কোনো রাগ নেই?'

'আমারও নেই। তারপরেও জানতে ইচ্ছে করে কে। আমি যখন অসুস্থ ছিলাম তখন সব সময় মনে হতো আমি আপনাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছি। আচ্ছা বলুন তো আমি কি ফেলেছি?'

'না– তোমার মা ফেলেছিলেন।'

'ও আচ্ছা।'

'তোমার মা'র উপর আমার কোনো রাগ নেই চিত্রা।'

'আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি আমারও রাগ নেই।'

'তোমার মেয়েটি খুব সুন্দর হয়েছে। ওর নাম কি?'

'ওর নাম রেণু– ভালো নাম রেহনুমা।'

'সুন্দর নাম।'

'ওর খুব বুদ্ধি।'

'শুনে ভালো লাগছে চিত্রা।'

'কতদিন পর কথা বলছেন, আমার অসম্ভব ভালো লাগছে।'

'তোমার ভালো লাগছে শুনে আমারও ভালো লাগছে। আমি সারারাত কথা বলব- তোমাকে কিন্তু তারপর ছোট্ট একটা কাজ করতে হবে।'

'আপনি যা বলবেন আমি তাই করব। আপনি যদি আমাকে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়তে বলেন আমি লাফিয়ে পড়ব। আপনি বলে দেখুন।'

'তোমাকে এইসব কিচ্ছু করতে হবে না।'

'কি করতে হবে বলুন।'

'ভোরবেলা তুমি ছাদে উঠবে, পারবে না?'

'পারব।'

'হাতে থাকবে পাথরটা।'

'আচ্ছা।'

'তারপর পাথরটা ছুড়ে ফেলবে ঠিক আমি যে জায়গায় পড়েছিলাম সেই জায়গায়।'

'কেন?'

'আমি পাথরের ভেতর বন্দি হয়ে আছি। পাথরটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেলেই আমি মুক্তি পাব।'

'আমার এখন জ্ঞানের কথা শুনতে ইচ্ছে করছে, আপনি জ্ঞানের কথা বলুন।'

"I often see flowers from a passing car
That are gone before I can tell what they are."

'এর মানে কি?'

'রবার্ট ফ্রস্টের একটা বিখ্যাত কবিতার প্রথম দু'টি লাইন।'

'জ্ঞানের কথা শুনতে ভালো লাগছে না, অন্য কিছু বলুন ... ভালোবাসার কথা বলুন! আচ্ছা ভালোবাসা কি?

রাত শেষ হয়ে আসছে। আকাশে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছ। চিত্রা পাথর হাতে খুব সাবধানে খাট থেকে নামল।

সুরমা ফজরের নামাজে বসেছিলেন। বিকট শব্দে তিনি নামাজ রেখে উঠে দাঁড়ালেন। ভারী কিছু যেন ছাদ থেকে পড়ল।

কে পড়ল? তাঁর বুক ধকধক করছে। সেই ধকধকানি তীব্র হবার আগেই চিত্রা ঢুকল। সুরমা স্বাভাবিক হলেন। সহজ গলায় বললেন, 'কিসের শব্দ?'

চিত্রা খুব সহজ গলায় বলল– 'আমার যে একটা পাথর ছিল সেই পাথরটা টুকরা টুকরা করে ভাঙলাম। ছাদ থেকে ছুঁড়ে ফেলেছি– একেবারে শত খণ্ড হয়েছে।

সুরমা তাকিয়ে রইলেন।

চিত্রা বলল, 'চা খাবে মা? চা বানিয়ে নিয়ে আসি তারপর এসো দু'জনে মিলে চুকচুক করে চা খাই। ও আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করি– তুমি জোবেদ চাচাকে ছাদ থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলে তাই না মা?'

সুরমা তাকিয়েই রইলেন, কোনো জবাব দিলেন না। চিত্রা হালকা গলায় বলল, 'ভালোই করেছ মা। তোমার চায়ে চিনি দেব? তুমি চায়ে চিনি খাও তো?'

পিঁপড়া

'আপনার অসুখটা কী বলুন?'

রোগী কিছু বলল না, পাশে বসে-থাকা সঙ্গীর দিকে তাকাল।

ডাক্তার নূরুল আফসার, এমআরসিপি, ডিপিএস, অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। তাঁর বিরক্তির তিনটি কারণ আছে। প্রথম কারণ হচ্ছে, আটটা বেজে গেছে-- রোগী দেখা বন্ধ করে বাসায় যেতে হবে। আজ তাঁর শ্যালিকার জন্মদিন। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, গ্রাম থেকে আসা রোগী তিনি পছন্দ করেন না– এরা হয় বেশি কথা বলে, নয় একেবারেই কথা বলে না। ভিজিটের সময় হলে– দরদাম করার চেষ্টা করে। হাত কচলে মুখে তেলতেলে ভাব ফুটিয়ে বলে, কিছু কম করা যায় না ডাক্তার সাব? গরিব মানুষ!

আজকের এই রোগীকে অপছন্দ করার তৃতীয় কারণটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবু নুরুল আফসার সাহেবের কাছে এই কারণটিই প্রধান বলে বোধ হচ্ছে। লোকটির চেহারা নির্বোধের মতো। এই ধরনের লোক নিজের অসুখটাও ঠিকমত বলতে পারে না। অন্য একজনের সাহায্য লাগে।

'বলুন, তাড়াতাড়ি বলুন। আমার অন্য কাজ আছে।'

লোকটি কিছু বলল না। গলা খাঁকারি দিয়ে সঙ্গীর দিকে তাকাল। ভাবখানা এরকম যে অসুখের কথাবার্তা সঙ্গীটিই বলবে। সে-ও কিছু বলছে না। ডাক্তার নূরুল আফসার হাতঘড়ির দিকে একঝলক তাকিয়ে বললেন, 'গরু-ছাগল তার কী অসুখ বলতে পারে না। তাদের অসুখ অনুমানে ধরতে হয়। আপনি তো আর গরু-ছাগল না। চুপ করে আছেন কেন? আপনার নাম কি?'

রোগী কিছু বলল না। তার সঙ্গী বলল, 'উনার নাম মকবুল। মোহাম্মদ মকবুল হোসেন ভুঁইয়া।'

'নামটাও অন্য আরেকজনকে বলে দিতে হচ্ছে। আপনি কি কথা বলতে পারেন না– পারেন না?'

'পারি।'

'কী নাম আপনার?'

'মোহম্মদ মকবুল হোসেন ভুঁইয়া।'

'বয়স কত?'

'বায়ান্ন।'

'আপনার সমস্যাটা কি?'

রোগী মাথা নিচু করে ফেলল। নূরুল আফসার সাহেবের ধারণা হলো অস্বস্তিকর কোনো অসুখ, যার বিবরণ সরাসরি দেয়া মুশকিল।

'আর তো সময় দিতে পারব না। আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে। যদি কিছু বলার থাকে এক্ষুনি বলবেন। বলার না থাকলে চলে যান।'

রোগী আবার গলা খাঁকারি দিল।

তার সঙ্গী বলল, 'উনার অসুখ কিছু নাই।'

'অসুখ কিছু নেই, তা এসেছেন কেন?'

'উনারে পিঁপড়ায় কামড়ায়।'

'কী বললেন?'

'পিঁপড়ায় কামড়ায়। পিপিলিকা।'

ডাক্তারি করতে গেলে অধৈর্য হওয়া চলে না। রোগীদের সঙ্গে রাগারাগিও করা চলে না। এতে পশার কমে যায়। রোগের বিবরণ শুনে বিস্মিত হওয়াও পুরোপুরি নিষিদ্ধ। রোগের ধরন-ধারণ যতই অদ্ভুত হোক ভান করতে হয় যে, এ জাতীয় রোগের কথা তিনি শুনেছেন এবং চিকিৎসা করে আরাম করেছেন। নূরুল আফসার সাহেব ডাক্তারির এই সব সহজ নিয়ম-কানুন নিষ্ঠার সঙ্গে মানেন। আজ মানেত পারলেন না। ধমকের স্বরে বললেন, 'পিঁপড়ায় কামড়ায় মানে?'

রোগী পকেটে হাত দিয়ে একটুকরা কাগজ বের করে বলল, 'চিঠিটা পড়েন। চিঠির মধ্যে সব লেখা আছে।'

'কার চিঠি?'

'কাশেম সাহেব।'

'কাশেম সাহেব কে?'

'এমবিবিএস ডাক্তার। আমাদের অঞ্চলের। খুব ভালো ডাক্তার। উনি আপনার কাছে আমারে পাঠাইছেন। বলছেন নাম বললে আপনি চিনবেন। উনি আপনের ছাত্র।'

নূরুল আফসার সাহেব কাশেম নামের কোনো ছাত্রের নাম মনে করতে পারলেন না। কাশেম বহুল প্রচলিত নামের একটি। ক্লাসে প্রতি বছরই দু'একজন কাশেম থাকে। এ কোন কাশেম কে জানে।

'স্যার চিনেছেন?'

চিনি না বলাটা ঠিক হবে না। পুরানো ছাত্ররা রুগী পাঠায়। এদেরকে খুশি রাখা দরকার। কাজেই আফসার সাহেব শুকনো হাসি হেসে বললেন, 'হ্যাঁ চিনেছি। কি লিখেছে দেখি।'

'উনি স্যার আপনাকে সালাম দিয়েছেন।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। দেখি, চিঠিটা দেখি।'

চিঠি দেখে ডাক্তার সাহেবের ভ্রূ কুঞ্চিত হলো। বাঙালি জাতির সবচে' বড় দোষ হলো– এরা কোনো জিনিস সংক্ষেপে করতে পারে না। দুই পাতার এক চিঠি ফেঁদে বসেছে। তিনি পড়লেন।

পরম শ্রদ্ধেয় স্যার,

আমার সালাম জানবেন। আমি সেভেন্টি থ্রি ব্যাচের ছাত্র। আপনি আমাদের ফার্মাকোলজি পড়াতেন। আপনার বিষয়ে আমি সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়েছিলাম। সেই উপলক্ষে আপনি আপনার বাসায় আমাকে চায়ের দাওয়াত করেছিলেন।

আশা করি আপনার মনে পড়েছে। যাই হোক, আমি মকবুল সাহেবকে আপনার কাছে পাঠাচ্ছি। মকবুল এই অঞ্চলের একজন অত্যন্ত ধনবান ব্যক্তি। সে বছর চারেক ধরে অদ্ভুত এক ব্যাধিতে ভুগছে। একে ব্যাধি বলা চলে না। কিন্তু অন্য কোনো নামও আমি পাচ্ছি না। ব্যাপারটা হচ্ছে তাকে সব সময় পিঁপড়ায় কামড়ায়।

বুঝতে পারছি বিষয়টা আপনার কাছে খুবই হাস্যকর মনে হচ্ছে। শুরুতে আমার কাছেও মনে হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম এটা এক ধরনের মানসিক ব্যাধি। বর্তমানে আমার সেই ধারণা পুরোপুরি ভেঙে গেছে। আমি নিজে লক্ষ করেছি, মকবুল সাহেব বসলেই সারি বেঁধে পিঁপড়া তার কাছে আসতে থাকে।

পীর-ফকির, তাবিজ, ঝাড়-ফুঁক জাতীয় আদিভৌতিক চিকিৎসা সবই করানো হয়েছে। কোনো লাভ হয় নি। আমি কোনো উপায় না দেখে আপনার কাছে পাঠালাম। আপনি দয়া করে ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেবেন না।

বিনীত
আপনার একান্ত অনুগত ছাত্র
আবুল কাশেম।
বুস্টার ফার্মেসি, নান্দাইল, কেন্দুয়া

ডাক্তার সাহেব রোগীর দিকে তাকালেন। রোগী পাথরের মতো মুখ করে বসে আছে। গায়ে ফতুয়া ধরনের জামা। পরনে লুঙ্গি। অত্যন্ত ধনবান ব্যক্তির পোশাক নয়।

ডাক্তার সাহেব কি বলবেন বুঝতে পারলেন না। কিছু-একটা বলতে হয়। মকবুল আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে। এই জাতীয় উদ্ভট যন্ত্রণার কোনো মানে হয়?

'পিঁপড়া কামড়ায় আপনাকে?'

'জি স্যার। কোনো এক জায়গায় বসে থাকলেই পিঁপড়া এসে ধরে।'

নূরুল আফসার সাহেব একবার ভাবলেন বলবেন, আপনি কি রসোগোল্লা না-কি যে পিঁপড়া ছেঁকে ধরবে? শেষ পর্যন্ত বললেন না।

'বড় কষ্টে আছি স্যার। যদি ভালো করে দেন সারাজীবন কেনা গোলাম হইয়া থাকব। টাকা-পয়সা কোনো ব্যাপার না, স্যার। টাকা যা লাগে লাগুক।'

'আপনার কি অনেক টাকা?'

জি স্যার।

'কী পরিমাণ টাকা আছে?'

রোগী কোনো জবাব দিল না। রোগীর সঙ্গী বলল, 'মকবুল ভাইয়ের কাছে টাকা-পয়সা কোনো ব্যাপার না। লাখ দুই লাখ উনার হাতের ময়লা।'

নূরুল আফসার সাহেব এই প্রথম খানিকটা কৌতূহলী হলেন। লাখ টাকা ফতুয়া-গায়ে লুঙ্গি-পরা এই লোকটির হাতের ময়লা– এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। তিনি নিজেও ধনবান ব্যক্তি। ফিক্সড ডিপোজিডে তাঁর এগারো লাখ টাকার মতো আছে। এই টাকা সঞ্চয় করতে গিয়ে জীবন পানি করে দিতে হয়েছে। ভোর ছ'টা থেকে রাত বারোটা– এক মুহূর্তের বিশ্রাম নেই।

একমাত্র ছুটির দিন শুক্রবারটাও তিনি কাজে লাগান। সকালের ফ্লাইটে চিটাগাং যান, লাস্ট ফ্লাইটে ফিরে আসেন। ওখানকার একটা ক্লিনিকে বসেন। ঐ ক্লিনিকের তিনি কনসালটিং ফিজিসিয়ান। আর এই লোককে দেখে তো মন হয় না সে কোনো কাজকর্ম করে। নির্বোধের মতো এই লোক এত টাকা করে কী করে? নূরুল আফসার সাহেবের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।

মকবুল ক্ষীণ স্বরে বলল, 'রোগটা যদি সারায়ে দেন।'

'এটা কোনো রোগ না। আমি এমন কোনো রোগের কথা জানি না– যে রোগে দুনিয়ার পিঁপড়া এসে কামড়ায়। অসুখটা আপনার মনে। আমি সাইকিয়াট্রিস্টের ঠিকানা লিখে দিচ্ছি– তাঁর সঙ্গে কথা বলুন। আপনার যে সমস্যা এই সমস্যার সমাধান আমার কাছে নেই।

নূরুল আফসার সাহেব বাক্যটা পুরোপুরি শেষ করলেন না। কারণ একটা অদ্ভুত দৃশ্যে তাঁর চোখ আটকে গেল। তিনি দেখলেন, টেবিলের ওপর রাখা মকবুলের ডান হাতের দিকে এক সারি লাল পিঁপড়া এগুচ্ছে। পিঁপড়ারা সচরাচর এক লাইনে চলে, এরা তিনটি লাইন করে এগুচ্ছে। ডাক্তার সাহেবের দৃষ্টি লক্ষ করে মকবুলও তাকাল পিঁপড়ার সারির দিকে। সে কিছু বলল না বা হাতও সরিয়ে নিল না।

নূরুল আফসার সাহের বললেন, 'এই পিঁপড়াগুলি কি আপনার দিকে আসছে?'

'জি স্যার।'

'বলেন কী?'

'পায়েও পিঁপড়া ধরেছে। এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসতে পারি না স্যার।'

নূরুল আফসার সাহেব কাছে এগিয়ে এলেন। উঁচু হয়ে বসলেন। সত্যি সত্যি দু'সারি পিঁপড়া লোকটির পা'র দিকে এগুচ্ছে।

'মকবুল সাহেব।'

'জি স্যার।'

আমার একটা জরুরি কাজ আছে, চলে যেতে হচ্ছে। আপনি কি কাল একবার আসবেন?

'অবশ্যই আসব। যার কাছে যাইতে বলেন যাব। বড় কষ্টে আছি স্যার। রাতে ঘুমাইতে পারি না। নাকের ভিতর দিয়ে পিঁপড়া ঢুকে যায়।'

'আপনি কাল আসুন। কাল কথা বলব।'

'জি আচ্ছা।'

মকবুল উঠে দাঁড়াল। পর মুহূর্তেই যে ঘটনাটা ঘটল তার জন্যে নূরুল আফসার সাহেব মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর কাছে মনে হলো মকবুল কিছুক্ষণের জন্য হলেও বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে। চিন্তা ও বিচারশক্তি পুরোপুরি লোপ পেয়েছে। তিনি দেখলেন মকবুল হিংস্র ভঙ্গিতে লাফিয়ে, পা ঘসে ঘসে পিঁপড়া মারার চেষ্টা করছে। এক পর্যায়ে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল টেবিলে, দু'হাতে পিষে ফেলল পিঁপড়ার সারি। মকবুলের মুখ ঘামে চটচট করছে। চোখের তারা ঈষৎ লালাভ। মুখে হিসহিস শব্দ করছে এবং নিচু গলায় বলছে, হারামজাদা, হারামজাদা।

তার সঙ্গী কিছুই বলছে না। মাথা নিচু করে দেয়াশলাইর কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁচাচ্ছে। তার ভাবভঙ্গি থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এ জাতীয় ঘটনার সঙ্গে সে পরিচিত। এই ঘটনায় সে অস্বাভাবিক কিছু দেখছে না।

নূরুল আফসার সাহেব শালীর জন্মদিনের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেলেন। রোগীর দিকে হতভম্ব চোখে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর দু'জন অ্যাসিসটেন্টও ছুটে এসেছে। তারা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চোখে-মুখে বিস্ময়ের চেয়ে ভয় বেশি।

মকবুল হঠাৎ করেই শান্ত হয়ে গেল। নিচু গলায় বলল, 'স্যার, মনে কিছু নিবেন না। এই পিঁপড়ার ঝাঁক আমার জেবন শেষ কইরা দিছে। হারামজাদা পিঁপড়া। এক গেলাস ঠাণ্ডা পানি দিবেন?'

ডাক্তার সাহেবের অ্যাসিসটেন্ট অতি দ্রুত ফ্রিজ থেকে পানির বোতল বের করে নিয়ে এলো। একজন ভয়ংকর পাগলের পাগলামি হঠাৎ থেমে গেছে এই আনন্দেই সে আনন্দিত।

মকবুল পানির গ্লাস হাতে নিয়ে বসে রইল। পানি মুখে দিল না। মাথা নিচু করে বিড়বিড় করে বলল, 'যেখানে যাই সেইখানে পিঁপড়া, কি করব কন। যে খাটে ঘুমাই সেই খাটের পায়ার নিচে বিরাট বিরাট মাটির সরা। সরা ভর্তি পানি। তাতেও লাভ হয় না।'

'লাভ হয় না?'

'জি না। ক্যামনে ক্যামনে জানি বিছানায় পিঁপড়া উঠে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বিছানার চাদর বদলাইতে হয়।'

'বলেন কি?'

'সত্যি কথা বলতেছি জনাব। এক বর্ণ মিথ্যা না। যদি মিথ্যা হয় তা হইলে যেন আমার শরীরে কুষ্ঠ হয়। আমি জনাব এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকতেও পারি না। জায়গা বদল করতে হয়। আমার জীবন শেষ।'

ডাক্তার সাহেব এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। যে লোকটিকে শুরুতে মনে হয়েছিল কথা বলতে পারে না, এখন দেখা যাচ্ছে সে প্রচুর কথা বলতে পারে। এটাই স্বাভাবিক। গ্রামের লোকজনের প্রাথমিক ইনহিবিশন কেটে গেলে প্রচুর কথা বলে। প্রয়োজনের কথা বাদ দিয়ে অপ্রয়োজনের কথাই বেশি বলে।

চিকিৎসায় কোনো ক্রটি করি নাই জনাব। কেরোসিন তেলে কর্পূর দিয়ে সেই তেল শরীরে মাখছি যদি গন্ধে পিঁপড়া না আসে। প্রথম দুই-একদিন লাভ হয়, তারপর হয় না। পিঁপড়া আসে। এমন জিনিস নাই যে শরীরে মাখি নাই। যে যা বলেছে মাখছি। একজন বলল, বাদুরের গু শরীরে মাখলে আরাম হইব। সেই বাদুরের গুও মাখলাম। এর চেয়ে জনাব আমার মরণ ভালো।'

ডাক্তার সাহেব তার অ্যাসিসটেন্টের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাসায় টেলিফোন করে দাও যে আমি ঝামেলায় আটকে পড়েছি। আসতে দেরি হবে। আর আমাদের চা দাও।'

'আপনি চা খান তো?'

'জি চা খাই।'

'চা খেতে খেতে বলুন কিভাবে এটা শুরু হলো, প্রথম কখন পিঁপড়া আপনার দিকে আকৃষ্ট হলো।'

'একটু গোপনে বলতে চাই জনাব।'

'গোপনে বলার ব্যাপার আছে কি?'

'জি আছে।'

'বেশ। গোপনেই বলবেন। আগে চা খান।'

লোকটি চা খেল নিঃশব্দে। চা খাবার সময় একটি কথাও বলল না। তার কথা বলার ইচ্ছা সম্ভবত ঢেউয়ের মতো আসে। ঢেউ যখন আসে তখন প্রচুর বকবক করে, ঢেউ থেমে গেলে চুপচাপ হয়ে যায়। তখন কথা বলে তার সঙ্গী। এখন সঙ্গীই কথা বলছে–

'ডাক্তার সাব, সবচে' বেশি ফল হয়েছে যে চিকিৎসায় সেইটাই তো বলা হয় নাই। মকবুল ভাই, ঐ চিকিৎসার কথা বলেন।'

'তুমি বলো।'

'এই চিকিৎসা মকবুল ভাই নিজেই বাইর করছে। বিষে বিষক্ষয় চিকিৎসা। গুড়ের গন্ধে পিঁপড়া সবচে' বেশি আসে। মববুল ভাই করলেন কি, সারা শইলে গুড় মাখলেন। এতে লাভ হইছিল। সাতদিন কোনো পিঁপড়া আসে নাই।'

মকবুল গম্ভীর গলায় বলল, 'সাতদিন না পাঁচদিন।'

ডাক্তার সাহেব বললেন, 'পাঁচদিন পরে আবার পিঁপড়া আসা শুরু হলো?'

'জি।'

'পিঁপড়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য মনে হয় অনেক কিছু করেছেন।'

'জি। নদীর মাঝখানে নৌকা নিয়া কয়েকদিন ছিলাম। তিন দিন আরামে ছিলাম। চাইর দিনের দিন পিঁপড়া ধরল।'

'সেখানে পিঁপড়া গেল কিভাবে?'

'জানি না জনাব। অভিশাপ।'

'কিসের অভিশাপ?'

'আপনারে গোপনে বলতে চাই।'

ডাক্তার সাহেব গোপনে বলার ব্যবস্থা করলেন। পুরো ব্যাপারটায় তিনি এখন উৎসাহ পেতে শুরু করছেন। শালীর জন্মদিনের কথা মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে। খানিকটা অস্বস্তি বোধ করছেন। এই পর্যন্তই। কোনো রোগীর ব্যাপারে এ জাতীয় কৌতূহল তিনি এর আগে বোধ করেন নি। অবশ্যি এই লোকটিকে রোগী বলতেও বাধছে। কাউকে পিঁপড়া ছেঁকে ধরে এটা নিশ্চয়ই কোনো রোগ-ব্যাধির পর্যায়ে ফেলা যাবে না।

ঘর থেকে সবাইকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। মকবুলের সঙ্গীও নেই। দরজা ভেজানো। মকবুল নিচু গলায় কথা শুরু করল–

'জনাব, আপনেরে আমি আগেই বলছি আমি টাকা-পয়সাওয়ালা লোক। আমাদের টাকা-পয়সা আইজ-কাইলের না। ব্রিটিশ আমলে আমার দাদাজান পাকা দালান দেন। দাদাজানের দুইটা হাতি ছিল। একটার নাম ময়না, অন্যটার নাম সুরভি। দুইটাই মাদী হাতি।'

'ঐ প্রসঙ্গ থাক, আপনার পিঁপড়ার প্রসঙ্গে আসুন।'

আসতেছি। আমি পিতামাতার একমাত্র সন্তান। বিরাট ভূ-সম্পত্তির মালিক। টাকা-পয়সা, ক্ষমতা এইসব জিনিস বেশি থাকলে মানুষের স্বভাব-চরিত্র ঠিক থাকে না। আমারও ঠিক ছিল না। আপনারা যারে চরিত্র-দোষ বলেন তাই হইল। পনের-ষোল বছর বয়সেই। বিরাট বাড়ি– সুন্দরী মেয়েছেলের অভাব ছিল না। দাসী-বাঁদী ছিল। দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের মেয়ে-বউরা ছিল।

আমারে একটা কঠিন কথা বলার বা শাসন করার কেউ ছিল না। আমার মা অবশ্য জীবিত ছিলেন। কেউ কেউ তাঁর কাছে বিচার নিয়ে গেছে। লাভ হয় নাই। উল্টা আমার ধমক খাইছে।'

'আপনি বিয়ে করেননি?'

'জি বিবাহ করেছি। বিবাহ করব না কেন? দুটি বিবাহ করেছি। সন্তানাদি আছে, স্বভাব নষ্ট হইলে বিয়ে-শাদি করলেও ফায়দা হয় না। মেয়েছেলে দেখলেই...'

'আপনি আসল জায়গায় আসুন। আজেবাজে কথা বলে বেশি সময় নষ্ট করছেন।'

'জি আসতেছি। বছর পাঁচেক আগে আমার দূর-সম্পর্কীয় এক বোনের মেয়ের উপর আমার চোখ পড়ল। চইদ্দ-পনের বছর বয়স। গায়ের রঙ একটু ময়লা, কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো। আমার চরিত্র তো কারো অজানা না। মেয়ের মা মেয়েকে আগলায়ে রাখে। খুবই বজ্জাত মা, মেয়েকে নিয়ে আমার মা'র ঘরে মেঝেতে ঘুমায়। এত কিছু কইরাও লাভ হইল না। এক রাতে ঘটনা ঘটে গেল।'

'কি বললেন, ঘটনা ঘটে গেল?'

'জি।'

'আশ্চর্য ব্যাপার। আপনি যেভাবে বলছেন তাতে মনে হচ্ছে খুবই তুচ্ছ একটা ব্যাপার।'

'জিনিসটা তুচ্ছই। কিছুই না। হে হে হে।'

'হাসবেন না। হাসির কোনো ব্যাপার না।'

'জি আচ্ছা। তারপর কি হলো– বজ্জাত মা সেই রাতেই মেয়েটারে ইঁদুর-মারা বিষ খাওয়াইয়া দিল। আর নিজে একটা দড়ি নিয়ে বাড়ির পিছনে একটা আমগাছে ফাঁস নিল। আমারে বিপদে ফেলার চেষ্টা, আর কিছু না। মাগী চূড়ান্ত বজ্জাত। আমি চিন্তায় পড়লাম। দুইটি মিত্যু সোজা কথা না। থানা-পুলিশ হবে। পুলিশ তো এই জিনিসটাই চায়। এরা বলবে খুন করা হয়েছে।'

'আপনি খুন করেন নি?'

'আরে না। খুন করব কি জন্যে? আর যদি খুনের দরকারও হয় নিজের ঘরে খুন করব? কাউরে খুন করতে হইলে জায়গার অভাব আছে? খুন করতে হয় নদীর উপরে। রক্ত ধুইয়ে ফেলা যায়। তারপর লাশ বস্তার ভিতর ভইরা চুন মাখায়ে চার-পাঁচটা ইট বস্তার ভিতর দিয়ে বিলে ফালায়ে দিতে হয়। এই জন্মের জন্যে নিশ্চিন্ত। কোনো সম্বুন্ধির পুত কিছু জানব না।'

'আপনি খুনও করেছেন?'

'জি না। দরকার হয় নাই। যেটা বলতেছিলাম সেইটা শুনেন, ঘরে দুইটা লাশ। আমি বললাম, খবরদার, লাশের গায়ে কেউ হাত দিবা না। যে রকম আছে সে রকম থাক, আমি নিজে গিয়ে থানার ওসি সাহেবরে আনতেছি, ওসি সাহেব আইয়্যা যা করবার করব।'

থানা আমার বাড়ি থাইক্যা পনের মাইল দূর। পানসি নৌকা নিয়ে গেলাম। দারোগা সাহেব আর থানা স্টাফের জন্যে পাঁচ হাজার টাকা নজরানা নিয়ে গেলাম। গিয়া দেখি বিরাট সমস্যা। দারোগা সাব গিয়েছেন বোয়ালখালী ডাকাতি মামলার তদন্তে। ফিরলেন পরের দিন। তারে নিয়ে আমার বাড়িতে আসতে লাগল তিন দিন।

বর্ষাকাল। গরমের দিন। তিন দিনেই লাশ পচে বিকট গন্ধ। দারোগা সাবরে নিয়া কাঁঠাল গাছের কাছে গিয়া দেখি অদ্ভুত দৃশ্য। লাখ লাখ লাল পিঁপড়া লাশের শরীরে। মনে হইতেছে মাগীর সারা শইলে লাল চাদর।

'মেয়েটারও একই অবস্থা। মুখ-হাত-পা কিছুই দেখার উপায় নাই। পিঁপড়ায় সব ঢাকা। মাঝে মাঝে সবগুলি পিঁপড়া যখন একসঙ্গে নড়ে, তখন মনে হয় লাল চাদর কেউ যেন ঝাড়া দিল।'

ডাক্তার সাহেব তিক্ত গলায় বললেন, 'আপনি তো দেখি খুবই বদলোক।'

'জি না, আমার মতো টেকা-পয়সা যারার থাকে তারা আরও বদ হয়। আমি বদ না। তারপর কি ঘটনা সেইটাই শুনেন– আমি একটা সিগারেট ধরাইলাম। সিগারেটের আগুন ফেলার সাথে সাথে মেয়েটার শরীরের সবগুলি পিঁপড়া নড়ল। মনে হলো যে একটা বড় ঢেউ উঠল। তারপর সবগুলি পিঁপড়া একসঙ্গে মেয়েটারে ছাইড়া মাটিতে নামল। মেয়েটার চোখ-মুখ সব খাইয়া ফেলেছে– জায়গায় জায়গায় হাড্ডি বের হয়ে গেছে। দারোগা সাহেব রুমাল দিয়ে নাক চেপে ধরে বললেন, মাবুদে এলাহী। তারপর অবাক হয়ে দেখি সবগুলো পিঁপড়া একসঙ্গে আমার দিকে আসতেছে। ভয়ংকর অবস্থা। আমি দৌড় দিয়ে বাইরে আসলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে পিঁপড়াগুলি বাইরে আসল। মনে

হইল আমারে খুঁজতেছে। সেই থাক্যা শুরু। যেখানে যাই পিঁপড়া। জনাব, আপনার এই ঘরে কি সিগারেট খাওয়া যায়? খাওয়া গেলে একটা সিগারেট খাইতে চাই।

'খান।'

'শকুর আলহামদুলিল্লাহ।'

মকবুল সিগারেট ধরাল। তার মুখ বিষণ্ন। সে আনাড়িদের মতো ধোঁয়া ছাড়ছে। খুকখুক করে কাশছে। খানিকটা দম নিয়ে বলল, 'আমার কাশি ছিল না। এখন কাশি হয়েছে। নাকের ভিতর দিয়া পিঁপড়া ঢুকে গেছে ফুসফুসে। ওরা ঐখানেই বসবাস করে। ক্যামনে বুঝলাম জানেন? কাশির সাথে রক্ত আসে। আর মরা পিঁপড়া।'

ডাক্তার সাহেব এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

মকবুল সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, 'সিগারেট খাইতেছি যাতে ভালোমতো কাশি উঠে। কাশি উঠলে কাশির সাথে পিঁপড়ার ডিম বাইর হবে। আপনি দেখবেন নিজের চোখে। আমি ঘোষণা দিচ্ছি, যে আমারে পিঁপড়ার হাত থাইক্যা বাঁচাইবে তারে আমি নগদ দুই লাখ দিব। আমি বদ লোক হইতে পারি কিন্তু আমি কথার খেলাপ করি না। আমি টাকা সাথে নিয়া আসছি। আপনে আমারে বাঁচান।'

ডাক্তার সাহেব কিছু বললেন না। তিনি তাঁর বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উপরে কাচের দিকে তাকিয়ে আছেন। মকবুলের বাম হাত টেবিলের উপর। দুই সারি পিঁপড়া টেবিলের দু'প্রান্ত থেকে সেই হাতের দিকে এগুচ্ছে। মকবুলেরও সেই দিকে চোখ পড়ল। সে ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বলল, 'আপনের কিছু করা সম্ভব না। ঠিক না ডাক্তার সাব?'

'হ্যাঁ ঠিক।'

'আমি জানতাম। আমার মরণ পিঁপড়ার হাতে।'

মকবুল মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে আসা পিঁপড়ার সারি দু'টির দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখ চকচক করছে। সে তার বাঁ-হাত আরেকটু এগিয়ে দিয়ে নিচু গলায় বলল– 'নে খা।'

পিঁপড়ারা মনে হলো একটু থমকে গেল। গা বেয়ে উঠল না– কিছুক্ষণ অনিশ্চয়তায় ভুগল।

মকবুল বলল, 'নিজ থাইক্যা খাইতে দিলে এরা কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করে, সঙ্গে সঙ্গে শরীরে উঠে না। শলা-পরামর্শ করে। এই দেহেন ডাক্তার সাব– উঠতেছে না।'

'তাই তো দেখছি।'

'দুই-এক মিনিটের ব্যাপার। দুই-এক মিনিটে শলা-পরামর্শ শেষ হইব, তখন শইলে উঠা শুরু হইব। হলোও তাই। ডাক্তার সাহেব লক্ষ করলেন, পিঁপড়ার দল মকবুলের বাঁ হাতেই উঠতে শুরু করেছে। দু'টি সারি ছাড়াও নতুন এক সাড়ি পিঁপড়া রওনা হয়েছে। এই পিঁপড়াগুলির মুখে ডিম। ডাক্তার সাহেব ভেবে পেলেন না মুখে ডিম নিয়ে পিঁপড়াগুলি যাচ্ছে কেন? এরা চায় কী? কে তাদের পরিচালিত করছে। কে সেই সূত্রধর?

বৃহন্নলা

অতিপ্রাকৃত গল্পে গল্পের চেয়ে ভূমিকা বড় হয়ে থাকে।

গাছ যত না বড়, তার ডালপালা তার চেয়েও বড়। এই গল্পেও তাই হবে। একটা দীর্ঘ ভূমিকা দিয়ে শুরু করব। পাঠকদের অনুরোধ করছি তাঁরা যেন ভূমিকাটা পড়েন। এর প্রয়োজন আছে।

আমার মামাতো ভাইয়ের বিয়ে।

বাবা-মা'র একমাত্র ছেলে, দেখতে রাজপুত্র না হলেও বেশ সুপুরুষ। এম. এ. পাস করেছে। বাবার ব্যবসা দেখাশোনা করা এবং গ্রুপ থিয়েটার করা– এই দুইয়ে তার কর্মকাণ্ড সীমিত।

বাবা-মা'র একমাত্র ছেলে হলে যা হয়– বিয়ের জন্যে অসংখ্য মেয়ে দেখা হতে লাগল। কাউকেই পছন্দ হয় না। কেউ বেশি লম্বা, কেউ বেশি বেঁটে, কেউ বেশি ফর্সা, কেউ বেশি কথা বলে, আবার কেউ কেউ দেখা গেল কম কথা বলে। নানান ফ্যাঁকড়া।

শেষ পর্যন্ত যাকে পছন্দ হলো, সে মেয়ে ঢাকা ইডেন কলেজে বি.এ. পড়ে– ইতিহাসে অনার্স। মেয়ের বাবা নেই। মা'র অন্য কোথায় বিয়ে হয়েছে। মেয়ে তার বড় চাচার বাড়িতে মানুষ। তিনিই তাকে খরচপত্র দিয়ে বিয়ে দিচ্ছেন।

আমার মামা এবং মামি দু'জনের কেউই এই বিয়ে সহজভাবে নিতে পারলেন না। যে মেয়ের বাবা নেই, মা আবার বিয়ে করেছে– পাত্রী হিসেবে সে তেমন কিছু না। তা ছাড়া সে খুব সুন্দরীও না। মোটামুটি ধরনের চেহারা। আমার মামাতো ভাই তবু কেন জানি একবার মাত্র এই মেয়েকে দেখেই বলে দিয়েছে– এই মেয়ে ছাড়া আর কাউকে সে বিয়ে করবে না। মেয়ের বাবা নেই তো কী হয়েছে? সবার বাবা চিরকাল থাকে নাকি? মেয়ের মা'র বিয়ে হয়েছে, তাতে অসুবিধাটা কী? অল্প বয়সে বিধবা হয়েছেন, তাঁর তো বিয়ে করাই উচিত। এমন তো না যে দেশে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ।

মামা-মামিকে শেষ পর্যন্ত মত দিতে হলো, তবে খুব খুশি মনে মত দিলেন না, কারণ মেয়ের বড় চাচাকেও তাঁদের খুবই অপছন্দ হয়েছে। লোকটা নাকি অভদ্রের চূড়ান্ত। ধরাকে সরা জ্ঞান করে। চামার টাইপ।

বিয়ের দিন-তারিখ হলো।

এক মঙ্গলবার কাকডাকা ভোরে আমরা একটা মাইক্রোবাস এবং সাদা রঙের টয়োটায় করে রওনা হলাম। গন্তব্য ঢাকা থেকে নব্বই মাইল দূরের এক মফস্বল শহর। মফস্বল শহরের নামটা আমি বলতে চাচ্ছি না। গল্পের জন্যে সেই নাম জানার প্রয়োজনও নেই।

তেত্রিশ জন বরযাত্রী। অধিকাংশই ছেলেছোকরা। হৈচৈয়ের চূড়ান্ত হচ্ছে। এই মাইক বাজছে, এই মাইক্রোবাসের ভেতর ব্রেক ডান্স হচ্ছে, এই পটকা ফুটছে। ফাঁকা রাস্তায় এসে মাইক্রোবাসের গিয়ারবক্সে কী যেন হলো। একটু পরপর বাস থেমে যায়। সবাইকে নেমে ঠেলতে হয়। বরযাত্রীদের উৎসাহ তাতে যেন আরও বাড়ল। শুধু আমার মামা অসম্ভব গম্ভীর হয়ে পড়লেন। আমাকে ফিসফিস করে বললেন, 'এটা হচ্ছে অলক্ষণ। খুবই অলক্ষণ। রওনা হবার সময় একটা খালি জগ দেখেছি, তখনই মনে হয়েছে একটা কিছু হবে। গিয়ারবক্স গেছে, এখন দেখবি চাকা পাংচার হবে। না হয়েই পারে না।'

হলোও তাই। একটা কালভার্ট পার হবার সময় চাকার হাওয়া চলে গেল। মামা বললেন, 'কি, দেখলি? বিশ্বাস হলো আমার কথা? এখন বসে-বসে আঙুল চোষ।'

স্পেয়ার চাকা লাগাতেও অনেক সময় লাগল। মামা ছাড়া অন্য কাউকে বিচলিত হতে দেখলাম না।

বরযাত্রীদের উৎসাহ মনে হলো আরও বেড়েছে। চিৎকার-হৈচৈ হচ্ছে। একজন গান গাওয়ার চেষ্টা করছে। শুধুমাত্র বিয়েবাড়িতে পৌঁছানোর পরই সবার উৎসাহে খানিকটা ভাটা পড়ল।

মফস্বল শহরের বড় বাড়িগুলি সাধারণত যে-রকম হয়, সেরকম একটা পুরনো ধরনের বাড়ি। এইসব বাড়ি এমনিতেই খানিকটা বিষণ্ন প্রকৃতির হয়। এই বাড়ি দেখে মনে হলো বিরাট একটা শোকের বাড়ি। খাঁ-খাঁ করছে চারদিক। লোকজন নেই। কলাগাছ দিয়ে একটা গেটের মতো করা হয়েছে, সেটাকে গেট না বলে গেটের প্রহসন বলাই ভালো। একদিকে রঙিন কাগজের চেইন, অন্য দিকে খালি। হয় রঙিন কাগজ কম পড়েছে, কিংবা লোকজনের গেট প্রসঙ্গে উৎসাহ শেষ হয়ে গেছে। আমার মামা হতভম্ব। বরযাত্রীরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। ব্যাপারটা কি?

হাফশার্ট-পরা এক চ্যাংড়া ছেলে এসে বলল, 'আপনারা বসেন। বিশ্রাম করেন।'

আমি বললাম, 'আর লোকজন কোথায়? মেয়ের বড় চাচা কোথায়?' সেই ছেলে শুকনো গলায় লল, 'আছে, সবাই আছে। আপনারা বিশ্রাম করেন।'

আমি বললাম, 'কোনো সমস্যা হয়েছে?'

সেই ছেলে ফ্যাকাসে হাসি হেসে বলল, 'জি না, সমস্যা কিসের?' এই বলেই সে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। আর বেরুল না।

বসার ঘরে চাদর পেতে বরযাত্রীদের বিশ্রামের ব্যবস্থা। বারান্দায় গোটা দশেক ফোল্ডিং চেয়ার। বিয়েবাড়ির সজ্জা বলতে এইটুকুই।

মামা বললেন, 'বলেছিলাম না অলক্ষণ? এখন বিশ্বাস হলো? কী কাণ্ড হয়েছে কে জানে। আমার তো মনে হয় বাড়িতে মেয়েই নেই। কারোর সঙ্গে পালিয়েটালিয়ে গেছে। মুখে জুতোর বাড়ি পড়ল, স্রেফ জুতোর বাড়ি।'

মামা অল্পতেই উত্তেজিত হন। গত বছর তাঁর ছোটখাটো স্ট্রোক হয়ে গেছে। উত্তেজনার ব্যাপারগুলি তাঁর জন্যে ক্ষতির কারণ হতে পারে। আমি মামাকে সামলাতে

চেষ্টা করলাম। হাসিমুখে বললাম, 'হাত-মুখ ধুয়ে একটু শুয়ে থাকুন তো মামা। আমি খোঁজ নিচ্ছি কী ব্যাপার।'

মামা তীব্র গলায় বললেন, 'হাত-মুখটা ধোব কী দিয়ে শুনি? হাত-মুখ ধোবার পানি কেউ দিয়েছে? বুঝতে পারছিস না? এরা বেইজ্জতির চূড়ান্ত করার চেষ্টা করছে।'

'কী যে বলেন মামা!'

'কথা যখন অক্ষরে অক্ষরে ফলবে, তখন বুঝবি কী বলছি। কাপড়-চোপড় খুলে ন্যাংটো করে সবাইকে ছেড়ে দেবে। পাড়ার লোক এনে ধোলাই দেবে। আমার কথা বিশ্বাস না হয়, লিখে রাখ।'

মামার কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই খালি গায়ে নীল লুঙ্গি পরা এক লোক প্লাস্টিকের বালতিতে করে এক বালতি পানি এবং একটা মগ নিয়ে ঢুকল। পাথরের মতো মুখ করে বলল, 'হাত-মুখ ধোন। চা আইতাছে।'

মামা বললেন, 'খবরদার কেউ চা মুখে দেবে না, খবরদার! দেখি ব্যাপার কী।'

ভেতর বাড়ি থেকে কান্নার শব্দ আসছে। বিয়েবাড়িতে কান্না কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কিন্তু এই কান্না অস্বাভাবিক লাগছে। মধ্যবয়স্ক এক লোক এক বিশাল কেটলিতে করে চা নিয়ে ঢুকল। আমি তাঁকে বললাম, 'ব্যাপার কী বলেন তো ভাই?' সেই লোক বলল, 'কিছু না।'

ভেতর-বাড়ির কান্না এই সময় তীব্র হলো। কান্না এবং মেয়েলি গলায় বিলাপ। কান্না যেমন হঠাৎ তুঙ্গে উঠেছিল, তেমনি হঠাৎই নেমে গেল। তার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই মেয়ের বড়ো চাচা ঢুকলেন। ভদ্রলোককে দেখেই মনে হলো তাঁর ওপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে। তিনি নিচু গলায় যা বললেন, তা শুনে আমরা স্তম্ভিত। কী সর্বনাশের কথা! জানলাম যে কিছুক্ষণ আগেই তাঁর বড় ছেলে মারা গেছে। অনেক দিন থেকেই অসুখে ভুগছিল। আজ সকাল থেকে খুব বাড়াবাড়ি হলো। সব এলোমেলো হয়ে গেছে এই কারণেই। তিনি তার জন্যে লজ্জিত, দুঃখিত ও অনুতপ্ত। তবে যত অসুবিধাই হোক– বিয়ে হবে। আজ রাতে সম্ভব হবে না, পরদিন।

এই কথা বলতে বলতে তিনি হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন।

আমার মামা খুবই আবেগপ্রবণ মানুষ। অল্পতে রাগতেও পারেন, আবার সেই রাগ হিমশীতল পানিতে রূপান্তরিত হতেও সময় লাগে না। তিনি মেয়ের বড় চাচাকে জড়িয়ে ধরে নিজেও কেঁদে ফেললেন। কাতর গলায় বললেন, 'আপনি আমাদের নিয়ে মোটেও চিন্তা করবেন না। আমাদের কিছু লাগবে না, আপনি বাড়ির ভেতরে যান বেয়াই সাহেব।'

অদ্ভুত একটা অবস্থা! এর চেয়ে যদি শুনতাম মেয়ে পালিয়ে গেছে, তাও ভালো ছিল। কারো ওপর রাগ ঢেলে ফেলা যেত।

আমরা বরযাত্রীরা খুবই বিব্রত বোধ করছি। স্থানীয় লোকজন এখন দেখতে পাচ্ছি। তারা বোধহয় এতক্ষণ ভেতরের বাড়িতে ছিলেন। আমরা বসার ঘরেই আছি। খিদেয় একেকজন প্রায় মরতে বসেছি। খাবার কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে কি-না বুঝতে পারছি না।

এই পরিস্থিতিতে খাবারের কথা জিজ্ঞেসও করা যায় না। একজন মামাকে কানে কানে এই ব্যাপারে বলতেই তিনি রাগী গলায় বললেন, 'তোমাদের কি মাথাটাথা খারাপ হয়েছে– এত বড় একটা শোকের ব্যাপার, আর তোমরা খাওয়ার চিন্তায় অস্থির! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! এক রাত না খেলে হয় কী? খবরদার, আমার সামনে কেউ খাবারের কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবে না।'

আমরা চুপ করে গেলাম। বারো-তেরো বছরের ফুটফুটে একটি মেয়ে এসে পানভর্তি একটা পানদান রেখে গেল। কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটি চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে। এখনও কাঁদছে।

মামা মেয়েটিকে বললেন, 'লক্ষ্মী সোনা, তোমাদের মোটেই ব্যস্ত হতে হবে না। আমাদের কিছুই লাগবে না।'

রাত আটটার দিকে থাকা এবং খাওয়ার সমস্যার একটা সমাধান হলো। স্থানীয় লোকজন ঠিক করলেন, প্রত্যেকেই তাঁদের বাড়িতে একজন-দু'জন করে গেস্ট নিয়ে যাবেন। বিয়ে হবে পরদিন বিকেলে।

আমাকে যিনি নিয়ে চললেন, তাঁর নাম সুধাকান্ত ভৌমিক। ভদ্রলোকের বয়স ষাটের কাছাকাছি হবে। বেঁটেখাটো মানুষ। শক্ত-সমর্থ চেহারা। এই বয়সেও দ্রুত হাঁটতে পারেন। ভদ্রলোক মৃদুভাষী। মাথার চুল ধবধবে সাদা। গেরুয়া রঙের একটা চাদর দিয়ে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন বলেই কেমন যেন ঋষি-ঋষি লাগছে।

আমি বললাম, 'সুধাকান্ত বাবু, আপনার বাসা কত দূর?'

উনি বললেন, 'কাছেই।'

গ্রাম এবং মফস্বলের লোকদের দূরত্ব সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। তাদের 'কাছেই' আসলে দিল্লি হনুজ দূর অস্তের মতো। আমি হাঁটছি তো হাঁটছিই।

অগ্রহায়ণ মাস। গ্রামে এই সময়ে ভালো শীত থাকে। আমার গায়ে পাতলা একটা পাঞ্জাবি। শীত ভালোই লাগছে।

আমি আবার বললাম, 'ভাই, কত দূর?'

'কাছেই।'

আমরা একটা নদীর কাছাকাছি এসে পড়লাম। আঁতকে উঠে বললাম, 'নদী পার হতে হবে নাকি?'

'পানি নেই, জুতো খুলে হাতে নিয়ে নিন।'

রাগে আমার গা জ্বলে গেল। এই লোকের সঙ্গে আসাই উচিত হয় নি। আমি জুতো খুলে পাজামা গুটিয়ে নিলাম। হেঁটে নদী পার হওয়ার কোনো আনন্দ থাকলেও থাকতে পারে। আমি কোনো আনন্দ পেলাম না, শুধু ভয় হচ্ছে কোনো গভীর খানাখন্দে পড়ে যাই কি-না। তবে নদীর পানি বেশ গরম।

সুধাকান্ত বাবু বললেন, 'আপনাকে কষ্ট দিলাম।'

ভদ্রতা করে হলেও আমার বলা উচিত, 'না, কষ্ট কিসের!' তা বললাম না। নদী পার হয়ে পাজামা নামাচ্ছি, সুধাকান্ত বাবু বললেন, 'আপনি ছেলের কে হন?'

'ফুপাতো ভাই।'

'বিয়েটা না হলে ভালো হয়। সকালে সবাইকে বুঝিয়ে বলবেন।'

'সে কী!'

'মেয়েটার কারণে ছেলেটা মরল। এখন চট করে বিয়ে হওয়া ঠিক না। কিছুদিন যাওয়া উচিত।'

'কী বলছেন এসব!'

'ছেলেটা সকালবেলা বিষ খেয়েছে। ধুতরা বীজ। এই অঞ্চলে ধুতরা খুব হয়।'

'আপনি বলছেন কী ভাই?'

'ছেলের বাবা রাজি হলেই পারত। ছেলেটা বাঁচত। গোঁয়ারগোবিন্দ মানুষ। তার "না" মানেই না।'

'ছেলে-মেয়ের এই প্রেমের ব্যাপারটা সবাই জানে নাকি?'

'জানবে না কেন? মফস্বল শহরে এইসব চাপা থাকে না। আপনাদের শহরে অন্য কথা। আকছার হচ্ছে।'

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। এ কী সমস্যা! বাকি পথ দু'জন নীরবে পার হলাম।

পুরোপুরি নীরব বলাটা বোধহয় ঠিক হলো না। ভদ্রলোক নিজের মনেই মাঝে-মাঝে বিড়বিড় করছিলেন। মন্ত্রতন্ত্র পড়ছেন বোধহয়।

ভদ্রলোকের বাড়ি একেবারে জঙ্গলের মধ্যে। একতলা পাকা দালান। প্রশস্ত উঠোন। উঠোনের মাঝখানে তুলসী মঞ্চ। বাড়ির লাগোয়া দুটি প্রকাণ্ড কামিনী গাছ। একপাশে কুয়া আছে। হিন্দু বাড়িগুলো যেমন থাকে, ছবির মতো পরিচ্ছন্ন। উঠোনে দাঁড়াতেই মনে শান্তি-শান্তি একটা ভাব হলো। আমি বললাম, 'এত চুপচাপ কেন? বাড়িতে লোকজন নেই?'

'না।'

'আপনি একা নাকি?'

'হুঁ।'

'বলেন কী! একা-একা এত বড় বাড়িতে থাকেন!'

'আগে অনেক লোকজন ছিল। কিছু মরে গেছে। কিছু চলে গেছে ইন্ডিয়াতে। এখন আমি একাই আছি। আপনি স্নান করে ফেলুন।'

'স্নান-ফান লাগবে না। আপনি কিছু খাবারের ব্যবস্থা করুন, তাহলেই হবে।'

'একটু সময় লাগবে, রান্নার জোগাড় করতে হবে।'

'আপনি কি এখন রান্না করবেন?'

'রান্না না করলে খাবেন কী? বেশিক্ষণ লাগবে না।'

ভদ্রলোক গামছা, সাবান এবং একটা জলচৌকি এনে কুয়ার পাশে রাখলেন।

'স্নান করে ফেলুন। সারা দিন জার্নি করে এসেছেন, স্নান করলে ভালো লাগবে। কুয়ার জল খুব ভালো। দিন, আমি জল তুলে দিচ্ছি।'

'আপনাকে তুলতে হবে না। আপনি বরং রান্না শুরু করুন। খিদেয় চোখ অন্ধকার হয়ে আসছে।'

'এই লুঙ্গিটা পরুন। ধোয়া আছে। আজ সকালেই সোডা দিয়ে ধুয়েছি। আমার আবার পরিষ্কার থাকার বাতিক আছে, নোংরা সহ্য করতে পারি না।'

ভদ্রলোক যে নোংরা সহ্য করতে পারেন না, তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। তিনি রান্না করতে বসেছেন উঠোনে। উঠোনেই পরিষ্কার ঝকঝকে দুটো মাটির চুলা। সুধাকান্ত বাবু চুলার সামনে জলচৌকিতে বসেছেন। থালা, বাটি, হাঁড়ি সবই দেখি দু'বার তিন বার করে ধুচ্ছেন।

'সুধাকান্ত বাবু?'

'বলুন।'

'আপনি বিয়ে করেন কী?'

'না।'

'চিরকুমার?'

'ঐ আর কি।'

'আপনি করেন কী?'

'শিক্ষকতা করি। হাই স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক। মনোহরদি হাই স্কুল।'

'রান্নাবান্না আপনি নিজেই করেন?'

'হ্যাঁ, নিজেই করি। এক বেলা রান্না করি। এক বেলা ভাত খাই, আর সকালে চিড়া, ফলমূল– এ-সব খাই।'

'কাজের লোক রাখেন না কেন?'

'দরকার পড়ে না।'

'খালি বাড়ি পড়ে থাকে, চুরি হয় না?'

'না। চোর নেবে কী? আমি একজন দরিদ্র মানুষ। আপনি স্নান করে নিন। স্নান করলে ভালো লাগবে।'

অপরিচিত জায়গায় ঠাণ্ডার মধ্যে গায়ে পানি ঢালার আমার কোনোই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু সুধাকান্ত বাবু মনে হচ্ছে আমাকে না ভিজিয়ে ছাড়বেন না। লোকটি সম্ভবত শুচিবাইগ্রস্ত।

কুয়ার পানি নদীর পানির মতো গরম নয়, খুব ঠাণ্ডা। পানি গায়ে দিতেই গা জুড়িয়ে গেল। সারা দিনের ক্লান্তি, বিয়েবাড়ির উদ্বেগ, মৃত্যু সংক্রান্ত জটিলতা– সব ধুয়ে-মুছে গেল। চমৎকার লাগতে লাগল। তা ছাড়া পরিবেশটাও বেশ অদ্ভুত। পুরনো ধরনের একটা বাড়ি। ঝকঝকে উঠোনের শেষ প্রান্তে শ্যাওলা-ধরা প্রাচীন কুয়া। আকাশে পরিষ্কার চাঁদ। কামিনী ফুলের গাছ থেকে ভেসে আসছে মিষ্টি গন্ধ। এক ঋষির মতো চেহারার চিরকুমার বৃদ্ধ রান্না বসিয়েছেন। যেন বিভূতিভূষণের উপন্যাসের কোনো দৃশ্য।

'সুধাকান্ত বাবু?'

'বলুন।'

'রান্নার কত দূর?'

'দেরি হবে না।'

'একা একা থাকতে আপনার খারাপ লাগে না?'

'না, অভ্যেস হয়ে গেছে।'

'বাসায় ফিরে আপনি করেন কী?'

'তেমন কিছু করি না। চুপচাপ বসে থাকি।'

'ভয় লাগে না?'

সুধাকান্ত বাবু এই প্রশ্নের জবাব দিলেন না।

খাবার আয়োজন সামান্য, তবে এত চমৎকার রান্না আমি দীর্ঘদিন খাই নি। একটা কিসের যেন ভাজি, তাতে পাঁচফোড়নের গন্ধ– খেতে একটু টক-টক। বেগুন দিয়ে ডিমের তরকারি, তাতে ডালের বড়ি দেওয়া। ডালের বড়ি এর আগে আমি খাই নি। এমন একটা সুখাদ্য দেশে প্রচলিত আছে তা-ই আমার জানা ছিল না। মুগের ডাল। ডালে ঘি দেওয়াতে অপূর্ব গন্ধ!

আমি বললাম, 'সুধাকান্ত বাবু, এত চমৎকার খাবার আমি আমার জীবনে খাই নি। দীর্ঘদিন মনে থাকবে।'

সুধাকান্ত বাবু বললেন, 'আপনি ক্ষুধার্ত ছিলেন, তাই এত ভালো লেগেছে। রুচির রহস্য ক্ষুধায়। যেখানে ক্ষুধা নেই সেখানে রুচিও নেই।'

আমি চমৎকৃত হলাম।

লোকটির চেহারাই শুধু দার্শনিকের মতো না, কথাবার্তাও দর্শনঘেঁষা।

সুধাকান্ত বাবু উঠোনে পাটি পেতে দিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর সিগারেট হাতে সেখানে বসলাম। কিছুক্ষণ গল্পগুজব করা যেতে পারে। সুধাকান্ত বাবুকে অবশ্যি খুব আলাপী লোক বলে মনে হচ্ছে না। এই যে দীর্ঘ সময় তাঁর সঙ্গে আছি তিনি এর মধ্যে আমার নাম জানতে চান নি। আমি কী করি তাও জানতে চান নি। আমি এই মানুষটির প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ বোধ করছি, কিন্তু এই লোকটা আমার প্রতি কোনো আগ্রহ বোধ করছে না। অথচ আমি আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, যারা মাস্টারি করে, তারা কথা বলতে খুব পছন্দ করে। অকারণেই কথা বলে।

প্রায় মিনিট পনের আমরা চুপচাপ বসে থাকার পর সুধাকান্ত বাবু আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, 'আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন একা একা আমি এই বাড়িতে থাকতে ভয় পাই কি-না, তাই না?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, তাই।'

সুধাকান্ত বাবু বললেন, 'ভয় পাই। প্রায় রাতেই ঘুমুতে পারি না, জেগে থাকি। ঘরের ভেতর আগুন করে রাখি। হারিকেন জ্বালানো থাকে। ওরা আগুন ভয় পায়। আগুন থাকলে কাছে আসে না।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কারা?'

তিনি জবাব দিলেন না।

আমি বললাম, 'আপনি কি ভূত-প্রেতের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

আমি মনে-মনে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম। পৃথিবী কোথায় চলে গিয়েছে– এই বৃদ্ধ তা বোধহয় জানে না। চাঁদের পিঠে মানুষের জুতোর ছাপ পড়েছে, ভাইকিং উপগ্রহ নেমেছে মঙ্গলের মরুভূমিতে, ভয়েজার ওয়ান এবং টু উড়ে গেছে বৃহস্পতির কিনারা ঘেঁষে, আর এই অঙ্কের শিক্ষক ভূতের ভয়ে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখছে। কারণ, অশরীরীরা আগুন ভয় পায়।

আমি বললাম, 'আপনি কি ওদের দেখেছেন কখনো?'

'না।'

'ওদের পায়ের শব্দ পান?'

'তাও না।'

'তাহলে?'

'বুঝতে পারি।'

'বুঝতে পারেন?'

'জি। আপনি যখন আছেন, আপনিও বুঝবেন।'

'ওদের কাণ্ডকারখানা দেখতে পাব, তাই বলছেন?'

'হুঁ, তবে ওদের না, একজন শুধু আসে।'

'তাও ভালো যে একজন আসে। আমি ভেবেছিলাম দলবল নিয়ে বোধহয় চলে আসে। নাচ-গান, হৈ-হল্লা করে।'

'আপনি আমার কথা একেবারেই বিশ্বাস করছেন না?'

'ঠিকই ধরেছেন, বিশ্বাস করছি না। অবশ্যি এই মুহূর্তে আমার গা ছমছম করছে। কারণ, আপনার পরিবেশটা ভৌতিক।'

সুধাকান্ত বাবু বললেন, 'ওরা কিন্তু আছে।'

আমি চুপ করে রইলাম। এই বৃদ্ধের সঙ্গে ভূত আছে কি নেই, তা নিয়ে তর্ক করার কোনো অর্থ হয় না। থাকলে থাকুক।

'আমার কাছে যে আসে, সে একটা মেয়ে।'

'তাই নাকি?'

'জি, এগারো-বারো বছর বয়স।'

'বুঝলেন কী করে তার বয়স এগারো-বারো? আপনাকে বলেছে?'

'জি না। অনুমান করে বলছি।'

'তার নাম কি? নাম জানেন?

'জি না।'

'সে এসে কী করে?'

সুধাকান্ত বাবু বললেন, 'মেয়েটি যে আসছে এই কি যথেষ্ট নয়? তার কি আর কিছু করার প্রয়োজন আছে?'

আমি চুপ করে গেলাম। আসলেই তো, অশরীরী এক বালিকার উপস্থিতিই তো যথেষ্ট। সুধাকান্ত বাবু বললেন, 'আপনি নিজেও হয়তো দেখতে পারবেন।' আমি চমকে উঠলাম। ভদ্রলোক সহজ স্বরে বললেন, 'আমি ছাড়াও অনেকে দেখেছে।'

সুধাকান্ত বাবু ছোট্ট করে নিশ্বাস ফেললেন এবং তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিকট একটা হাসি শুনলাম। উঠোন কাঁপিয়ে গাছপালা কাঁপিয়ে হো-হো করে কে যেন হেসে উঠল। সুধাকান্ত বাবু পাশে না থাকলে অজ্ঞানই হয়ে যেতাম। আমি তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কে, কে?'

সুধাকান্ত বাবু বললেন, 'ওটা কিছু না।'

আমি ভয়-জড়ানো গলায় বললাম, 'কিছু না মানে?'

'ওটা খাটাশ। মানুষের মতো শব্দ করে হাসে।'

'বলেন কী! খাটাশের নাম তো এই প্রথম শুনলাম। এ তো ভূতের বাবা বলে মনে হচ্ছে! এখনো আমার গা কাঁপছে।'

'জল খান। জল খেলে ভয়টা কমবে।'

সুধাকান্ত বাবু কাঁসার গ্লাসে করে পানি নিয়ে এলেন। খাটাশ নামক জন্তুটি আরেক বার রক্ত হিম-করা হাসি হাসল। সুধাকান্তবাবু যদি কিছু না বলতেন তাহলে ভূতের হাসি শুনেছি, এই ধারণা সারা জীবন আমার মনের মধ্যে থাকত।

লোকটার প্রতি এই প্রথম আমার খানিটা আস্থা হলো। আজগুবি গল্প বলে ভয় দেখানো এই লোকের ইচ্ছা নয় বলেই মনে হলো। এ-রকম ইচ্ছা থাকলে, এই ভয়ংকর হাসির কারণ সম্পর্কে সে চুপ করে থাকত।

সুধাকান্ত বাবু বললেন, 'ঐ মেয়েটার কথা শুনবেন?'

'হ্যাঁ, শোনা যেতে পারে। তবে আমি নিজে অবিশ্বাসী ধরনের মানুষ, কাজেই গল্পের মাঝখানে যদি হেসে ফেলি কিছু মনে করবেন না।'

এই গল্পটা কাউকে বলতে ভালো লাগে না। অবশ্যি অনেককে বলেছি। এখানকার সবাই জানে।'

'আপনার গল্প এখানকার সবাই বিশ্বাস করেছে?'

সুধাকান্ত বাবু গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমি যদি এখানকার কাউকে একটা মিথ্যা কথাও বলি, এরা বিশ্বাস করবে। এরা আমাকে সাধু বাবা বলে ডাকে। আমি আমার এই দীর্ঘ জীবনে কোনো মিথ্যা কথা বলেছি বলে মনে পড়ে না। আমি থাকি একা-একা। আমার প্রয়োজনও সামান্য। মানুষ মিথ্যা কথা বলে প্রয়োজন এবং স্বার্থের কারণে। আমার সেই সমস্যা নেই। এইসব থাক, আমি বরং গল্পটা বলি।'

'বলুন।'

'ভেতরে গিয়ে বসবেন? এখানে মনে হচ্ছে একটু ঠাণ্ডা লাগছে। অগ্রহায়ণ মাসে হিম পড়ে।'

'আমার অসুবিধা হচ্ছে না, এখানেই বরং ভালো লাগছে। গ্রামে তেমন আসা হয় না। আপনি শুরু করুন।'

সুধাকান্ত বাবু গল্প শুরু করতে গিয়েও শুরু করলেন না। হঠাৎ যেন একটু অন্য রকম হয়ে গেলেন। যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছু দেখতে চেষ্টা করছেন। খসখস শব্দ হলো। নতুন কাপড় পরে হাঁটলে যেমন শব্দ হয়, সে-রকম। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কাচের চুড়ির টুং-টুং শব্দের মতো শব্দ। আমি বললাম, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

সুধাকান্ত বাবু ফ্যাকাসে মুখে হাসলেন। আমি বললাম, 'কিসের শব্দ হলো?'

তিনি নিচু গলায় বললেন, 'ও কিছু না, আপনি গল্প শুনুন। আজ ঘুমিয়ে কাজ নেই, আসুন গল্প করে রাত পার করে দিই।'

গা-ছমছমে পরিবেশ। বাড়ির লাগোয়া ঝাঁকড়া কামিনী গাছ থেকে কামিনী ফুলের নেশা-ধরানো গন্ধ আসছে। কুয়ার আশেপাশে অসংখ্য জোনাকি জ্বলছে-নিভছে। উঠোনের চুলা থেকে ভেসে আসছে পোড়া কাঠের গন্ধ। আকাশ-ভরা নক্ষত্রবীথি।

সুধাকান্ত বাবু গল্প শুরু করলেন।

'যুবক বয়স থেকেই আমাকে সবাই ডাকত সাধুবাবা।

'যদিও ঠিক সাধু বলতে যা বোঝায় আমি তা নই। তবে প্রকৃতিটা একটু ভিন্ন ছিল। সবকিছু থেকে নিজেকে দূরে-দূরে রাখার স্বভাব আমার ছিল। শ্মশান-কবরস্থান এইসব আমাকে ছোটবেলা থেকেই আকর্ষণ করত। অল্প বয়স থেকেই শ্মশান এবং কবরস্থানের আশেপাশে ঘুরঘুর করতাম। আমার বাবা শ্যামাকান্ত ভৌমিক তখন জীবিত। আমার মতিগতি দেখে অল্প বয়সেই আমার বিবাহ ঠিক করলেন। পাশের গ্রামের মেয়ে। ভবানী মিত্র মহাশয়ের প্রথমা কন্যা আরতি। খুবই রূপবতী মেয়ে। গ্রামাঞ্চলে এরকম মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। আমি বিবাহ করতে রাজি হলাম। কথাবার্তা পাকাপাকি হয়ে যাবার পর একটা দুর্ঘটনায় মেয়েটা মারা যায়।'

'কী দুর্ঘটনা?'

'সাপের কামড়। আমাদের এই অঞ্চলে সাপের উপদ্রব আছে। বিশেষ করে কেউটে সাপ।'

'তারপর কী হলো বলুন।'

'মেয়েটির মৃত্যুতে খুব শোক পেলাম। প্রায় মাথা খারাপের মতো হয়ে গেল। কিছুই ভালো লাগে না। রাতবিরাতে শ্মশানে গিয়ে বসে থাকি। সমাজ-সংসার কিছুতেই মন বসে না। গভীর বৈরাগ্য। কিছুদিন সাধু-সন্ন্যাসীর খোঁজ করলাম। ইচ্ছা ছিল উপযুক্ত গুরুর সন্ধান পেলে মন্ত্র নেব। তেমন কাউকে পেলাম না।...

'আমার বাবা অন্যত্র আমার বিবাহের চেষ্টা করলেন। আমি রাজি হলাম না। বাবাকে বুঝিয়ে বললাম যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা না যে আমি সংসারের বন্ধনে আটকা পড়ি। পরিবারের অন্যরাও চেষ্টা করলেন– আমি সম্মত হলাম না। এসব আমার প্রথম যৌবনের কথা। না– বললে আপনি গল্পটা ঠিক বুঝতে পারবেন না। আপনি কি বিরক্ত হচ্ছেন?'

আমি বললাম 'না, বিরক্ত হব কেন?'

সুধাকান্তবাবু বললেন, 'প্রথম যৌবনের কথা সবাই খুব আগ্রহ করে বলে। আমি বলতে পারি না।'

'আপনি তো ভালোই বলছেন। থামবেন না– বলতে থাকুন।'

সুধাকান্ত বাবু আবার শুরু করলেন–

'এরপর অনেক বছর কাটল। শ্মশানে-শ্মশানে ঘুরতাম বলেই বোধহয় ঈশ্বর আমার ঘরটাকেই শ্মশান করে দিলেন। পুরোপুরি একা হয়ে গেলাম। মানুষ যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেয়। আমিও মানিয়ে নিলাম। আমার প্রকৃতির মধ্যে এক ধরনের একাকিত্ব ছিল, কাজেই আমার খুব অসুবিধা হলো না। এখন আমি মূল ঘটনায় চলে আসব, তার আগে আপনি কি চা খাবেন?'

'জি না।'

'খান একটু চা ভালো লাগবে।'

আমার মনে হলো ভদ্রলোকের নিজেরই চা খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমি বললাম, 'ঠিক আছে বানান। একটু ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগছে অবশ্যি।'

'ভিতরে গিয়ে বসবেন?'

'জি না, এখানেই ভালো লাগছে।'

চা শেষ করার পর দ্বিতীয় দফায় গল্প শুরু হলো। এইখানে আমি একটা মজার ব্যাপার লক্ষ করলাম। আমার কাছে মনে হলো ভদ্রলোকের গলার স্বর পাল্টে গেছে। আগে যে স্বরে কথা বলছিলেন, এখন সেই স্বরে বলছেন না। একটা পরিবর্তন হয়েছে। আমার মনের ভুল হতে পারে। অনেক সময় পরিবেশের কারণে সবকিছু অন্য রকম মনে হয়।

সুধাকান্ত বাবু বলতে শুরু করলেন–

'গত বৎসরের কথা। কার্তিক মাস। আমি বাড়িতে ফিরছি। রাত প্রায় দশটা কিংবা তার চেয়ে বেশিও হতে পারে। আমার ঘড়ি নেই, সময়ের হিসাব ঠিক থাকে না।'

আমি সুধাকান্ত বাবুকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার স্কুল তো নিশ্চয়ই চারটা-পাঁচটার দিকে ছুটি হয়। এত রাতে ফিরছিলেন কেন?'

সুধাকান্ত বাবু নিচু গলায় বললেন, 'রোজই এই সময়ে বাড়ি ফিরি। সকাল-সকাল বাড়ি ফেরার কোনো উৎসাহ বোধ করি না। পাবলিক লাইব্রেরি আছে। ঐখানে পত্রিকাটত্রিকা পড়ি, গল্পের বই পড়ি।'

'বলুন তারপর কী হলো।'

'তারিখটা হচ্ছে বারোই কার্তিক, সোমবার। আমি মানুষ হিসাবে বেশ সাহসী। রাতবিরাতে একা-একা ঘোরাফেরা করি। ঐ রাতে রাস্তায় নেমেই আমার ভয়-ভয় করতে লাগল। কী জন্যে ভয় করছে সেটাও বুঝলাম না। তখন মনে হলো– রাস্তায় একটা পাগলা কুকুর বের হয়েছে, ভয়টা বোধহয় ঐ কুকুরের কারণে। আমি একটা লাঠি হাতে নিলাম।...

‘শুক্লপক্ষের রাত। ফকফকা জ্যোৎস্না, তবু পরিষ্কার সবকিছু দেখা যাচ্ছে না। কারণ কুয়াশা। কার্তিক মাসের শেষে এদিকে বেশ কুয়াশা হয়।...

‘নদীর কাছাকাছি আসতেই কুকুরটাকে দেখলাম। গাছের নিচে শুয়ে ছিল। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়াল এবং পিছনে-পিছনে আসতে লাগল। মাঝে-মাঝে চাপা শব্দ করছে। পাগলা কুকুর পিছনে-পিছনে আসছে, আমি এগুচ্ছি– ব্যাপারটা খুব ভয়াবহ। যে কোনো মুহূর্তে এই কুকুর ছুটে এসে কামড়ে ধরতে পারে। আমি কুকুরটাকে তাড়াবার চেষ্টা করলাম। ঢিল ছুঁড়লাম, লাঠি দিয়ে ভয় দেখালাম। কুকুর নড়ে না, দাঁড়িয়ে থাকে। চাপা শব্দ করতে থাকে। আমি হাঁটতে শুরু করলেই সেও হাঁটতে শুরু করে।...

‘যাই হোক, আমি কোনোক্রমে নদীর পাড়ে এসে পৌঁছলাম। তখন আমার খানিকটা সাহস ফিরে এলো। কারণ, পাগলা কুকুর পানিতে নামে না। পানি দেখলেই এরা ছুটে পালায়।...

‘অদ্ভুত কাণ্ড, কুকুর পানি দেখে ছুটে পালাল না! আমার পিছনে-পিছনে পানিতে নেমে পড়ল। আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না।...

‘আমি নদীর ও-পারে উঠলাম। কুকুরটাও উঠল– আর ঠিক তখন একটা ব্যাপার ঘটল।’

সুধাকান্ত বাবু থামলেন।

আমি বিরক্ত গলায় বললাম, ‘আপনি জটিল জায়গাগুলিতে দয়া করে থামবেন না। গল্পের মজা নষ্ট হয়ে যায়।’

সুধাকান্ত বাবু বললেন, ‘এটা কোনো গল্প না। ঘটনাটা কীভাবে বলব ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না বলে থেমেছি।’

‘আপনি মোটামুটিভাবে বলুন, আমি বুঝে নেব।’

‘কুকুরটা আমার খুব কাছাকাছি চলে এলো। পাগলা কুকুর আপনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন কি-না জানি না। ভয়ংকর দৃশ্য! সারাক্ষণ হাঁ করে থাকে। মুখ দিয়ে লাল পড়ে, চোখের দৃষ্টিটাও অন্য রকম। আমি ভয়ে কাঠ হয়ে গেছি। ছুটে পালাব বলে ঠিক করেছি, ঠিক তখন কুকুরটা কেন জানি ভয় পেয়ে গেল। অস্বাভাবিক ভয়। একবার এ-দিকে যাচ্ছে, একবার ও-দিকে যাচ্ছে। চাপা আওয়াজটা তার গলায় আর নেই। সে ঘেউঘেউ করছে। আমার কাছে মনে হলো, সে কুকুরের ভাষায় আমাকে কী যেন বলার চেষ্টা করছে। এ-রকম চলল মিনিট পাঁচেক। তার পরই সে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাঁতরে ও-পারে চলে গেল। পুরোপুরি কিন্তু গেল না, ও-পারে দাঁড়িয়ে রইল এবং ক্রমাগত ডাকতে লাগল।’

‘তারপর?’

‘আমি একটা সিগারেট ধরালাম। তখন আমি ধূমপান করতাম। মাস তিনেক হলো ছেড়ে দিয়েছি। যাই হোক, সিগারেট ধরাবার পর ভয়টা পুরোপুরি কেটে গেল। হাত থেকে লাঠি ফেলে দিলাম। বাড়ির দিকে রওনা হব বলে ভাবছি, হঠাৎ মনে হলো নদীর ধার ঘেঁষে বড়-হওয়া ঘাসগুলোর মাঝখান থেকে কী-একটা যেন নড়ে উঠল।’

'আপনি আবার ভয় পেলেন?'

'না, ভয় পেলাম না। একবার ভয় কেটে গেলে মানুষ চট করে আর ভয় পায় না। আমি এগিয়ে গেলাম।'

'কুকুরটা তখনো আছে?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'তারপর বলুন।'

'কাছাকাছি এগিয়ে গিয়ে দেখলাম একটা মেয়ের ডেডবডি। এগার-বারো বছর বয়স। পরনে ডোরাকাটা শাড়ি।'

'বলেন কী আপনি!'

'যা দেখলাম তাই বলছি।'

'মেয়েটা যে মরে আছে তা বুঝলেন কী করে?'

'যে কেউ বুঝবে। মেয়েটা মরে শক্ত হয়ে আছে। হাত মুঠিবদ্ধ করা। মুখের কষে রক্ত জমে আছে।'

'কী সর্বনাশ!'

'আমি দীর্ঘ সময় মেয়েটার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম।'

'ভয় পেলেন না?'

'না, ভয় পেলাম না। আপনাকে তো আগেই বলেছি একবার ভয় পেলে মানুষ দ্বিতীয় বার চট করে ভয় পায় না।'

'তারপর কী হলো বলুন।'

'মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। বাচ্চা একটা মেয়ে এইভাবে মরে পড়ে আছে, কেউ জানছে না। কীভাবে না জানি বেচারি মরল। ডেডবডি এখানে ফেলে রেখে যেতে ইচ্ছা করল না। ফেলে রেখে গেলে শিয়াল-কুকুরে ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে। আমার মনে হলো এই মেয়েটাকে নিয়ে যাওয়া উচিত।'

'আশ্চর্য তো!'

'আশ্চর্যের কিছু নেই। আমার অবস্থায় পড়লে আপনিও ঠিক তাই করতেন।'

'না, আমি তা করতাম না। চিৎকার করে লোক ডাকাডাকি করতাম।'

'আশেপাশে কোনো বাড়িঘর নেই। কাকে আপনি ডাকতেন?'

'তারপর কী হলো বলুন।'

সুধাকান্ত বাবু বললেন, 'আপনি আমাকে একটা সিগারেট দিন। সিগারেট খেতে ইচ্ছা করছে।'

আমি সিগারেট দিলাম। বৃদ্ধ সিগারেট ধরিয়ে খকখক করে কাশতে লাগলেন।

আমি বললাম, 'তারপর কী হলো বলুন।'

সুধাকান্ত বাবু বললেন, 'ঘটনাটা এখানে শেষ করে দিলে কেমন হয়? আমার কেন জানি আর বলতে ইচ্ছা করছে না।'

'ইচ্ছে না করলেও বলুন। এখানে গল্প শেষ করার প্রশ্নই ওঠে না।'

'এটা গল্প না।'

'গল্প না যে তা বুঝতে পারছি। তারপর বলুন আপনি কী করলেন। মেয়েটাকে তুললেন?'

'হ্যাঁ তুললাম। কেন তুললাম সেটাও আপনাকে বলি। একটা অপরিচিত মেয়ের শবদেহ কেউ চট করে কোলে তুলে নিতে পারে না। আমি এই কাজটা করলাম, কারণ এই বালিকার মুখ দেখতে অবিকল...,

সুধাকান্ত বাবু থেমে গেলেন। আমি বললাম, 'মেয়েটি দেখতে ঐ মেয়েটির মতো, যার সঙ্গে আপনার বিয়ের কথা হয়েছিল। আরতি?'

'হ্যাঁ, আরতি। আপনার স্মৃতিশক্তি তো খুব ভালো!'

'আপনি আপনার গল্পটা বলে শেষ করুন।'

'মেয়েটি দেখতে অবিকল আরতির মতো। আমি মাটি থেকে তাকে তুললাম। মড়া মানুষের শরীর ভারী হয়ে যায়, লোকে বলে। আমি দেখলাম মেয়েটার শরীর খুব হালকা। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, মেয়েটাকে তোলার সঙ্গে-সঙ্গে কুকুরটা চিৎকার বন্ধ করে দিল। আমার কাছে মনে হলো চারদিক হঠাৎ যেন অস্বাভাবিক নীরব হয়ে গেছে। আমি মেয়েটাকে নিয়ে রওনা করলাম।'

'আপনার ভয় করল না?'

'না, ভয় করে নি। মেয়েটার জন্যে মমতা লাগছিল। আমার চোখে প্রায় পানি এসে গিয়েছিল। কার-না-কার মেয়ে, কোথায় এসে মরে পড়ে আছে। বাড়িতে এসে পৌঁছলাম। মনে হচ্ছে নিশুতি রাত। আমি কোলে করে একটা মৃতা বালিকা নিয়ে এসেছি, অথচ আমার মোটেও ভয় করছে না। আমি মেয়েটিকে ঘাড়ের উপর শুইয়ে রেখেই তালা খুলে ঘরে ঢুকলাম। তখন কেন জানি বুকটা কেঁপে উঠল। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো। আমি ভাবলাম ঘর অন্ধকার বলেই এরকম হচ্ছে, আলো জ্বাললেই ভয় কেটে যাবে। মেয়েটাকে আমি বিছানায় শুইয়ে দিলাম।...

'খাটের নিচে হারিকেন থাকে। আমি হারিকেন বের করলাম। ভয়টা কেন জানি ক্রমেই বাড়তে লাগল। মনে হলো ঘরের বাইরে অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে। অবাক হয়ে আমার কাণ্ডকারখানা দেখছে। যেন আমার সমস্ত আত্মীয়স্বজনরা চলে এসেছে। আমার বাবা, আমার ঠাকুরদা, আমার ছোট পিসি– কেউ বাদ নেই। ওরা যে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করছে, তাও আমি শুনতে পাচ্ছি।...

'হারিকেন জ্বালাতে অনেক সময় লাগল। হাত কেঁপে যায়। দেশলাইয়ের কাঠি নিভে যায়, সলতায় আগুন ধরতে চায় না। টপটপ করে আমার গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। শেষ পর্যন্ত হারিকেন জ্বলল। আমার নিশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এলো। আমি খাটের দিকে তাকালাম– এটা আমি কী দেখছি! এটা কি সম্ভব? এ-সব কী? আমি দেখলাম, মেয়েটা খাটের উপর বসে আছে। বড়-বড় চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমার পায়ের নিচে মাটি কেঁপে উঠল। মনে হলো মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছি।...

'স্পষ্ট শুনলাম উঠোন থেকে ভয়ার্ত গলায় আমার বাবা ডাকছেন, ও সুধাকান্ত, ও সুধাকান্ত, তুই বেরিয়ে আয়। ও সুধাকান্ত, তুই বেরিয়ে আয়। ও বাপধন, বেরিয়ে আয়।...'

'আমি বেরিয়ে আসতে চাইলাম, পারলাম না। পা যেন মাটির সঙ্গে গেঁথে গেছে। সমস্ত শরীর পাথর হয়ে গেছে। আমি মেয়েটির উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারলাম না। মেয়েটি একটু যেন নড়ে উঠল। কিশোরীদের মতো নরম ও কোমল গলায় একটু টেনে-টেনে বলল, "তুমি একা-একা থাকো। বড়ো মায়া লাগে গো! কত বার ভাবি তোমারে দেখতে আসব। তুমি কি আমারে চিনতে পারছ? আমি আরতি গো, আরতি। তুমি কি আমারে চিনছ?"

'আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো বললাম, "হ্যাঁ।...

"তোমার জন্যে বড় মায়া লাগে গো, বড় মায়া লাগে। একা-একা তুমি থাকো। বড় মায়া লাগে। আমি কত ভাবি তোমার কথা। তুমি ভাব না?"

'আমি যন্ত্রের মতো বললাম, "ভাবি"।...

'আমার মনে হলো বাড়ির উঠোনে আমার সমস্ত মৃত আত্মীয়স্বজন ভিড় করেছে। আট বছর বয়সে আমার একটা বোন পানিতে পড়ে মারা গিয়েছিল। সেও ব্যাকুল হয়ে ডাকছে– ও দাদা, তুই বেরিয়ে আয় দাদা। আমার ঠাকুরমার ভাঙা-ভাঙা গলাও শুনলাম– ও সুধাকান্ত, সুধাকান্ত।...

'খাটের উপর বসে থাকা মেয়েটা বলল, 'তুমি ওদের কথা শুনতেছ কেন গো? এত দিন পরে তোমার কাছে আসলাম। আমার মনটা তোমার জন্যে কান্দে। ওগো তুমি আমার কথা ভাব না? ঠিক করে বলো– ভাব না?"

"ভাবি।"

"আমার গায়ে হাত দিয়ে বলো, ভাবি। ওগো আমার গায়ে হাত দিয়ে বলো।"...

'আমি একটা ঘোরের মধ্যে আছি। সবটাই মনে হচ্ছে স্বপ্ন। স্বপ্নে সবই সম্ভব। আমি মেয়েটির গা স্পর্শ করবার জন্যে এগুলাম, তখনি আমার মৃতা মা উঠোন থেকে চেঁচালেন– খবরদার সুধাকান্ত, খবরদার!...

'আমার ঘোর কেটে গেল। এ আমি কী করছি? এ আমি কী করছি? আমি হাতে ধরে রাখা হারিকেন ছুঁড়ে ফেলে ছুটে ঘর থেকে বেরুতে গেলাম। খাটের উপর বসে থাকা মেয়েটি পিছন থেকে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমার ডান পায়ের গোড়ালি কামড়ে ধরল। ভয়াবহ কামড়! মনে হলো পায়ের হাড়ে সে দাঁত ফুটিয়ে দিয়েছে।...

'সে হাত দিয়ে আমাকে ধরল না। কামড়ে ধরে রাখল। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করলাম বেরিয়ে যেতে। কিছুতেই পারলাম না। এতটুকু একটা মেয়ে– কী প্রচণ্ড তার শক্তি! আমি প্রাণপণে চেঁচালাম– কে কোথায় আছ, বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও। তখন একটা ব্যাপার ঘটল। মনে হলো কালো একটা কী-যেন উঠোন থেকে ঘরের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটির উপর। চাপা গর্জন শোনা যেতে লাগল। মেয়েটি আমাকে ছেড়ে দিল। আমি পা টানতে টানতে উঠোনে চলে এলাম।...

'উঠোনে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারলাম ভিতরে ধস্তাধস্তি হচ্ছে। ধস্তাধস্তি হচ্ছে ঐ পাগলা কুকুর এবং মেয়েটার মধ্যে। মেয়েটা তীব্র গলায় বলছে– ছাড়, আমাকে ছাড়।...

'কুকুরটা ক্রুদ্ধ গর্জন করছে। সেই গর্জন ঠিক কুকুরের গর্জনও নয়। অদেখা ভুবনের কোনো পশুর গর্জন। সেই গর্জন ছাপিয়েও মেয়েটির গলার স্বর শোনা যাচ্ছে– আমারে খাইয়া ফেলতাছে। ওগো তুমি কই? আমারে খাইয়া ফেলতাছে।'

সুধাকান্ত বাবু থামলেন।

আমি বললাম, 'তারপর?'

তিনি জবাব দিলেন না। আমি আবার বললাম, 'তারপর কী হলো সুধাকান্ত বাবু?'

তিনি আমার দিকে তাকালেন। যেন আমার প্রশ্নই বুঝতে পারছেন না। আমি দেখলাম তিনি থরথর করে কাঁপছেন। আমি বললাম, 'কী হলো সুধাকান্ত বাবু?'

তিনি কাঁপা গলায় বললেন, 'ভয় লাগছে। দেয়াশলাইটা একটু জ্বালান তো!'

আমি দেয়াশলাই জ্বাললাম। সুধাকান্ত বাবু তাঁর পা বের করে বললেন, 'দেখুন, কামড়ের দাগ দেখুন।'

আমি গভীর ক্ষতচিহ্নের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সুধাকান্ত বাবু বললেন, 'ও এখনো আসে। বাড়ির পিছনে থপথপ করে হাঁটে। নিশ্বাস ফেলে। জানালার পাট হঠাৎ করে বন্ধ করে দিয়ে ভয় দেখায়। হাসে। নাকি সুরে কাঁদে। একেক দিন খুব বিরক্ত করে। তখন ঐ কুকুরটাও আসে। হুটোপুটি শুরু হয়ে যায়। সাধারণত কৃষ্ণপক্ষের রাতেই বেশি হয়।'

আমি বললাম, 'এটা কি কৃষ্ণপক্ষ?'

সুধাকান্ত বাবু বললেন, 'না। চাঁদ দেখতে পাচ্ছেন না?'

আমি বললাম, 'আপনি তো ভাই ভয়াবহ গল্প শোনালেন। আমি তো এখন রাতে ঘুমুতে পারব না।'

'ঘুমানোর দরকার নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে সূর্য উঠবে। চাঁদ ডুবে গেছে দেখছেন না?'

আমি ঘড়ি দেখলাম। চারটা বাজতে কুড়ি মিনিট। সত্যি-সত্যি রাত শেষ হয়ে গেছে।

সুধাকান্ত বাবু বললেন, 'চা খাওয়া যাক, কি বলেন?'

'হ্যাঁ, খাওয়া যাক।'

তিনি চুলা ধরিয়ে কেটলি বসিয়ে দিয়ে নিচু গলায় বললেন, 'বড়ো বিরক্ত করে। মাঝে-মাঝে ঢিল মারে টিনের চালে, থু-থু করে থুথু ফেলে। ভয় করে। রাতবিরাতে বাথরুমে যেতে হলে হাতে জ্বলন্ত আগুন নিয়ে যেতে হয়। গলায় এই দেখুন একটা অষ্টধাতুর কবচ। কোমরে সবসময় একটা লোহার চাবি বাঁধা, তবু ভয় কাটে না।'

'বাড়ি ছেড়ে চলে যান না কেন?'

'কোথায় যাব বলেন? পূর্বপুরুষের ভিটে।'

'কাউকে সঙ্গে এনে রাখেন না কেন?'

'কেউ থাকতে চায় না রে ভাই, কেউ থাকতে চায় না।'

সুধাকান্ত বাবু চায়ের কাপ হাতে তুলে দিলেন। চুমুক দিতে যাব, তখনি বাড়ির একটা কপাট শব্দ করে নড়ে উঠল। আমি চমকে উঠলাম। হাওয়ার কোনো বংশও নেই– কপাটে শব্দ হয় কেন?

আমি সুধাকান্ত বাবুর দিকে তাকালাম। তিনি সহজ গলায় বললেন, 'ভয়ের কিছু নেই– চা খান। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভোর হবে।'

বাড়ির পিছনের বনে খচমচ শব্দ হচ্ছে। আসলে আমি অস্থির বোধ করছি। এই অবস্থা হবে জানলে কে আসত এই লোকের কাছে! আমার ইচ্ছে করছে ছুটে পালিয়ে যাই। সুধাকান্ত বাবু বললেন, 'ভয় পাবেন না।'

আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি একমনে মন্ত্র আওড়াতে লাগলেন।

নিশ্চয়ই ভূত-তাড়ানো মন্ত্র। আমি খুব চেষ্টা করলাম ছোটবেলায় শেখা আয়াতুল কুরসি মনে করতে। কিছুতেই মনে পড়ল না। মাথা পুরোপুরি এলোমেলো হয়ে গেছে। গা দিয়ে ঘাম বেরুচ্ছে। ঠিকমতো নিশ্বাসও নিতে পারছি না। মনে হচ্ছে বাতাসে অক্সিজেন হঠাৎ করে অনেকখানি কমে গেছে। ভয় নামক ব্যাপারটি যে কত প্রবল এবং কী-রকম সর্বগ্রাসী, তা এই প্রথম বুঝলাম।

একসময় ভোর হলো।

ভোরের পাখি ডাকতে লাগল। আকাশ ফর্সা হলো। তাকিয়ে দেখি গায়ের পাঞ্জাবি ভিজে জবজব করছে।

আমার মামাতো ভাইয়ের বিয়েটা শেষ পর্যন্ত হলো না। মেয়ে কিছুতেই কবুল বলল না। যত বার বলা হলো, 'মা, বলো কবুল।'

তত বারই মেয়ে কঠিন গলায় বলল, 'না।'

আমি ছেলের পক্ষের সাক্ষীদের একজন। বড় বিব্রত বোধ করতে লাগলাম। মেয়ের এক খালা বললেন, 'আপনারা একটু পরে আবার আসুন। বাড়িতে এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। মনটন খারাপ। বুঝতেই পারছেন।'

আমরা চলে এলাম। ঘণ্টাখানেক পর আবার গেলাম। বলা হলো, 'মা, বলো তো কবুল।' মেয়েটি অস্ফুট গলায় কী যেন বলল। মেয়ের খালা বললেন, 'এই তো বলেছে। মেয়েমানুষ চিৎকার করে বলবে নাকি? আমি শুনেছি, পরিষ্কার বলেছে। এখন যান, ছেলের কবুল নিয়ে আসুন।'

আমি দৃঢ় গলায় বললাম, 'আমি কিছু শুনতে পাই নি। পরিষ্কার করে বলতে হবে।'

উকিল বললেন, 'মা, বলো কবুল।'

মেয়েটি এবার স্পষ্ট করে বলল, 'না।' বলেই তীব্র চোখে আমার দিকে তাকাল। সেই চোখে রাগ ছিল, ঘৃণা ছিল, কিঞ্চিৎ অভিমানও ছিল। যেন সে বলছে– কেন তোমরা আমাকে কষ্ট দিচ্ছ? তোমাদের পায়ে পড়ি দয়া করে আমাকে মুক্তি দাও।

আমি বললাম, 'বিয়ের ব্যাপারটা আপাতত বন্ধ থাকুক। শোকের ধাক্কাটা কমুক, তারপর দেখা যাবে।'

আমরা চলে এলাম। মফস্বলের ঐ শহরের সাথে কোনোরকম সম্পর্ক রইল না। তবে শহরটার স্মৃতি আমার মনে কাঁটার মতো বিঁধে রইল। স্মৃতির সবটুকুই গভীর বেদনার। আমার মামা ওখান থেকে ফিরে আসার পরপরই মাইয়ো কার্ডিয়াক ইনফ্রাকশানে মারা গেলেন। ছেলে বৌ দেখার খুব শখ ছিল, সেই শখ মিটল না। মামাতো ভাইটিও বিয়ে করতে রাজি হলো না। বিচিত্র কারণে সে ঐ মেয়েটির ছবি বুকে পুষতে লাগল। শুধুমাত্র তার মুখের দিকে তাকিয়েই আবার বছরখানেক পর গেলাম ঐ শহরে। শুনলাম মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে– ছেলে ডাক্তার।

সুধাকান্ত বাবুর সঙ্গেও দেখা হলো। আশ্চর্যের ব্যাপার, তিনি আমাকে চিনতে পারলেন না! যখন বললাম, 'আপনার সঙ্গে একবার সারারাত কাটালাম, আপনার কিছুই মনে নেই?' তিনি বললেন, 'ও আচ্ছা, মনে পড়েছে।' তাঁর চোখ-মুখ দেখেই বুঝলাম কথাগুলি তিনি ভদ্রতা করেই বললেন, আসলে কিছুই মনে পড়ে নি।

ভদ্রলোক আমাকে ভুলে গিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু আমি তাঁকে মনে রেখেছি এবং বেশ ভালোভাবেই মনে রেখেছি। তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা প্রায়ই মনে হতো। সেই অভিজ্ঞতায় আমারও কিছু অংশ আছে। কপাটের শব্দ আমি নিজের কানে শুনে এসেছি। বাতাস নেই, কিছু নেই, অথচ শব্দ করে কে যেন কপাট বন্ধ করল।

কাচের চুড়ির শব্দ। বাড়ির পিছনে খচখচ আওয়াজ– সবই আমার নিজের কানে শোনা।

সুধাকান্ত বাবুর এই গল্প অনেকের সঙ্গেই করেছি। খুব আগ্রহ নিয়েই করেছি। ঝড় বৃষ্টির রাতে যখনই ভূতের গল্পের আসর বসেছে, আমি এই গল্প বলেছি। তবে গল্প তেমন জমাতে পারি নি। আমি যেমন অভিভূত হয়েছিলাম, আমি লক্ষ করেছি আমার গল্পের শ্রোতারা তার একশ' ভাগের এক ভাগও হয় না। অথচ আমি নিজে খুব ভালো গল্প বলতে পারি। হয়তো পরিবেশ একটা ব্যাপার। সুধাকান্ত বাবুর বাড়িতে আধো-জ্যোৎস্নায় যে পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, ঢাকা শহরের ড্রয়িংরুমে সেই পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব নয়। তবু এটি আমার একটি প্রিয় গল্প। যত বার এই গল্প বলেছি, তত বার ঐ রাতের কথা মনে পড়েছে– এক ধরনের শিহরণ বোধ করেছি।

বছর তিনেক পরের কথা।

সন্ধ্যা সাতটার মতো বাজে। একটা 'সেমিনার টক' তৈরি করছি। বিষয়-পরিবেশ দূষণে পলিমারের ভূমিকা। চারদিকে কাগজপত্র, চার্ট, গ্রাফ নিয়ে বসেছি। সব এলোমেলো অবস্থায় আছে। ঠিক করে রেখেছি, কাজ শেষ না করে উঠব না।

মার্ফি'স ল' বলে একটা ব্যাপার আছে। মার্ফি'স বলে– Anything that can go wrong will go wrong—আমার বেলাও তাই হলো। একের পর এক সমস্যা হতে লাগল। লিখতে গিয়ে দেখি বলপয়েন্টে কালি আসছে না। কালির কলম নিয়ে দেখা গেল ঘরে কালি নেই।

একের পর এক টেলিফোন আসতে লাগল। আমার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাই এত দিন থাকতে আজই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন আমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে। তাঁদের

কথাও দেখি অনেক জমে আছে, কিছুতেই শেষ হয় না। আমি টেলিফোন রিসিভার উঠিয়ে রাখলাম। দোকান থেকে এক ডজন বলপয়েন্ট আনিয়ে বসলাম, আর তখন আমার বড় মেয়ে বলল, 'বাবা, একজন লোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'তোমাকে না বলেছি, কেউ এলে বলবে আমি বাসায় নেই?'

আমার মেয়ে বলল, 'আমি মিথ্যা বলতে পারি না বাবা।'

'মিথ্যা কথা বলতে পারো না মানে? আমার তো ধারণা তুমি সারাক্ষণই মিথ্যা কথা বলো।'

'মঙ্গলবারে বলি না। মঙ্গলবার হচ্ছে সত্য-দিবস।'

অনেক কষ্টে রাগ সামলালাম। কিছু দিন আগে কী একটা নাটকে দেখিয়েছে মঙ্গলবার সত্য-দিবস, সেদিন মিথ্যা বলা যাবে না।

আমি মনের বিরক্তি চেপে রেখে বসার ঘরে ঢুকলাম। অপরিচিত এক ভদ্রলোক বসে আছেন। অসম্ভব রোগা, লম্বা একজন মানুষ– যাকে দেখলেই সরলরেখার কথা মনে হয়। এই গরমে গলায় একটা মাফলার। চোখে মোটা চশমা। ভদ্রলোক বসে আছেন মূর্তির মতো। মনে হচ্ছে ধ্যানে বসেছেন।

ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। লম্বাটে মুখ। দাড়ি আছে। চুল লম্বা। দাড়ি, চুল, পরনের কালো কোট সবই কেমন যেন এলোমেলো। প্রথম দর্শনে মনে হয় ভবঘুরে ধরনের কেউ। তবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে এই ভাবটা চলে যায়। মনে হয় লাজুক ধরনের একজন মানুষ এসেছেন। যে কোনো কারণেই হোক মানুষটা বিব্রত বোধ করছেন।

আমি বললাম, 'আপনি কি আমার কাছে এসেছেন?'

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'জি।'

'আজ আমি একটা বিশেষ কাজে ব্যস্ত। আপনি কি অন্য একদিন আসতে পারেন?'

'জি, পারি।'

'তাহলে তাই করুন।'

'জি আচ্ছা।'

বলেই ভদ্রলোক আবার বসে পড়লেন। আমি বিস্মিত হয়ে তাকালাম। ভদ্রলোক বললেন, 'বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, আপনি বোধহয় লক্ষ করেন নি। আমি সঙ্গে ছাতা আনি নি। বৃষ্টিটা কমলেই চলে যাব।'

আমি ফিরে এসে আমার কাজে মন দিলাম। তিন ঘণ্টা একনাগাড়ে কাজ করলাম। অসাধ্যসাধন যাকে বলে। আর কোনো ঝামেলা হলো না। মার্ফি সাহেবের আইন দেখা যাচ্ছে সবসময় কাজ করে না। আমি ভুলেই গেলাম যে বসার ঘরে একজন ভদ্রলোক বসে আছেন। কী কারণে যেন বসার ঘরে গিয়েছি, ভদ্রলোককে দেখে চমকে উঠলাম।

'আপনি আছেন এখনো?'

'জি।'

'বৃষ্টি তো থেমে গেছে!'

'তা গেছে, কিন্তু কাউকে কিছু না বলে যাই কী করে?'

আমি লজ্জিত বোধ করলাম। ভদ্রলোক দীর্ঘ সময় একা-একা বসে আছেন। বসার ঘরে কেউ আসে নি, কারণ আমার টিভি শোবার ঘরে। সবাই টিভির সামনে চোখ বড়-বড় করে বসে আছে। টিভিতে নিশ্চয়ই কোনো নাটক হচ্ছে।

আমি বললাম, 'আপনাকে কি ওরা চা দিয়েছে?'

'জি না।'

'চা খাবেন এক কাপ?'

'আরেক দিন যখন আসব, তখন খাব।'

আমি বললাম, 'আরেক দিন আসার দরকার নেই। আজই বলে ফেলুন। চট করে কি বলতে পারবেন?'

'না, পারব না। আমি আরেক দিন আসব।'

'আপনার নামটা তো জানা হলো না।'

'আমার নাম মিসির আলি।'

'আমি কি আপনাকে চিনি?'

'জি না। চেনার কোনো কারণ নেই। আমি অ্যাবনর্ম্যাল সাইকোলজি বিষয়ে পড়াশোনা করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্টটাইম শিক্ষক।'

'আমার সঙ্গে আপনার যোগাযোগের কারণটা আমি বুঝতে পারছি না।'

'আরেক দিন যখন আসব, আপনাকে বুঝিয়ে বলব। আজ যাই, রাত হয়ে গেছে।'

ভদ্রলোক চলে গেলেন। ভদ্রলোককে বেশ আত্মভোলা লোক বলেও মনে হলো। একটা পলিথিনের ব্যাগ ফেলে গেছেন। ব্যাগে একটা পাউরুটি এবং ছোট ছোট দুটো কলা। মনে হচ্ছে ভদ্রলোকের সকালবেলার নাশতা।

আমি বুঝতে পারলাম না, অ্যাবনর্ম্যাল সাইকোলজির একজন অধ্যাপক আমার কাছে ঠিক কী চান? আমার আচার-আচরণে অস্বাভাবিক কিছু তো নেই। রহস্যটা কী?

এক সপ্তাহ পর ভদ্রলোক আবার এলেন।

আমিই দরজা খুললাম। ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?'

আমি বললাম, 'পারছি। আপনার নাম মিসির আলি। আপনি অ্যাবনর্ম্যাল সাইকোলজির একজন অধ্যাপক। গত সপ্তাহে আমার এখানে এসে একটা পাউরুটি এবং দুটো কলা ফেলে গেছেন।'

ভদ্রলোক হেসে ফেললেন। হাসিটি সুন্দর। শিশুর সারল্যমাখা। আজকাল মাপা হাসি ছাড়া আমরা হাসতে পারি না।

মিসির আলি বললেন, 'আপনার মেয়েটাকে একটু ডাকবেন? তার জন্যে এক প্যাকেট চকলেট এনেছি।'

আমি খানিকটা বিরক্ত হলাম। অপরিচিত লোক দামি চকলেটের প্যাকেট নিয়ে এলে বুঝতে হবে কিছু ব্যাপার আছে।

'আবার চকলেট কেন?'

'আপনার জন্যে তো আনি নি, আপনি বিরক্ত হচ্ছেন কেন? আপনার মেয়েটিকে আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। পছন্দের মানুষকে কিছু দিতে ইচ্ছে করে। আপনি কোনো রকম অস্বস্তি বোধ করবেন না। এই উপহারে কোনো রকম স্বার্থ জড়িত নেই। আমি আপনার কাছে কিছু চাইতে আসি নি।'

আমি খানিকটা লজ্জিত বোধ করলাম। ভদ্রলোককে ঘরে বসিয়ে চকলেটের প্যাকেট ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে বললাম, 'কী করতে পারি আপনার জন্যে?'

মিসির আলি বললেন, 'আপনার কাছে আমার এক কাপ চা পাওনা আছে। ঐ পাওনা চা খাওয়াতে পারেন।'

'চা আসবে। এখন আসল ব্যাপারটা বলুন।'

'আপনার কি কোনো তাড়া আছে?'

'না, তাড়া নেই।'

'আমি আপনার কাছে সুধাময় বাবু সম্পর্কে কিছু জানতে এসেছি। আপনি যদি কষ্ট করে বলেন... ।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'সুধাময় বাবু কে?'

'আপনি এই নামে কাউকে চেনেন না?'

'জি না।'

'সুধাময় বাবুর বাড়িতে আপনি কি এক রাত কাটান নি, যেখানে আপনার একটা ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয়।'

'আপনি কি সুধাকান্ত বাবুর কথা বলছেন?'

'নাম সুধাকান্ত হতে পারে। গল্পটা আমাকে যে বলেছে, সে সম্ভবত নামে গণ্ডগোল করেছে।'

আমি বললাম, 'আপনি কি আমাকে দয়া করে গুছিয়ে বলবেন ব্যাপারটা কী? সুধাকান্ত বাবুকে আমি ঠিকই চিনি। একটা অসাধারণ গল্প তাঁর মুখ থেকে শুনেছি। আপনার সঙ্গে সেই গল্পের কী সম্পর্ক বুঝতে পারছি না।'

মিসির আলি বললেন, 'আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। তবে রহস্যময় ব্যাপারগুলোর প্রতি আমার একটা আগ্রহ আছে। পৃথিবীতে অনেক রহস্যময় ব্যাপার ঠিকই ঘটে। আবার অনেক কিছু ঘটে– যেগুলোকে আপাতদৃষ্টিতে খুব রহস্যময় মনে হলেও আসলে রহস্যময় নয়। আমি ব্যাপারটা বুঝতে চাই। সুধাকান্ত বাবুর চরিত্র আমাকে খানিকটা কৌতূহলী করেছে, কারণ ওর চরিত্রে কিছু অস্বাভাবিক দিক আছে। ঐ সম্পর্কে আমি ভালোভাবে জানতে চাই। তাছাড়া আপনার গল্পটাও বেশ মজার। এর মধ্যে এমন কিছু এলিমেন্ট আছে, যা প্রচলিত ভূতের গল্পে থাকে না।'

'আপনি কি ভূতের গল্প নিয়ে গবেষণা করছেন নাকি?'

'জি না। কিছু কিছু গল্পের প্রতি একধরনের ফ্যাসিনেশন জন্মে যায়। ব্যাপারটা কী, ভালোমতো জানতে ইচ্ছে করে।'

‘আমার গল্প আপনি কার কাছ থেকে শুনেছেন?’

‘আমার এক ছাত্রের মুখে শুনেছি। সে শুনেছে আপনার কাছে। নাম হচ্ছে রুস্তম। তার কাছ থেকেই আমি আপনার ঠিকানা নিয়েছি।’

‘আপনি বলছিলেন গল্পটাতে মজার কিছু এলিমেন্ট আছে, সেগুলো কী?

‘যেমন ধরুন কুকুরের ব্যাপারটা। একদল কুকুর সুধাকান্ত বাবুকে ঘিরে ধরল। তারপর তাকে ঘিরে চক্রাকারে হাঁটতে লাগল এবং একটি বিশেষ দিকে নিয়ে যেতে লাগল। যেখানে নিয়ে গেল সেখানে একটা যুবতীর নগ্ন মৃতদেহ, যাকে কিছুক্ষণ আগেই হত্যা করা হয়েছে।’

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ‘এ-রকম কিছুই কিন্তু গল্পে নেই। কোনো নগ্ন যুবতীর মৃতদেহ পড়ে ছিল না। একটি বালিকার ডেডবডি ছিল। তার পরনে শাড়ি ছিল।’

মিসির আলি হাসতে-হাসতে বললেন, ‘আমিও তাই ভাবছিলাম। গল্প যখন একজনের মুখ থেকে অন্য জনের মুখে যায়, তখন ডালপালা ছড়ায়। অনেক সময় মূল গল্প খুঁজে পাওয়া যায় না। এই জন্যেই আমি এসেছি আপনার মুখ থেকে গল্পটা শোনার জন্যে। যদি আপনার কষ্ট না হয়।’

‘আমার কোনো কষ্ট হবে না। আমি আগ্রহ করে গল্পটা বলব।’

মিসির আলি কোটের পকেট থেকে নোট বই এবং কলম বের করলেন। আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ‘আপনি কি নোট করছেন নাকি!’

‘দু’-একটা পয়েন্ট লিখে রাখব। আমার স্মৃতিশক্তি ভালো, তবু মাঝে মাঝে কিছু নোট রাখি। স্মৃতি মানুষকে প্রতারণা করে, লেখা করে না।’

চা চলে এলো। চা খেতে খেতে ভদ্রলোক গল্প শুনলেন। তবে গল্প বলে আমি কোনো আরাম পেলাম না। ভদ্রলোক গল্পের মাঝখানে একবারও বললেন না– অদ্ভুত তো! তারপর কী হলো? কী আশ্চর্য!

তিনি পাথরের মতো মুখ করে গল্প শুনলেন এবং গল্প শেষ হওয়ামাত্র বললেন, ‘আচ্ছা তাহলে যাই। আপনাকে কষ্ট দিলাম, কিছু মনে করবেন না।’

আমি বললাম, ‘আপনার কাজ হয়ে গেল?’

‘জি।’

‘গল্পটা কি আপনার কাছে অদ্ভুত মনে হয় নি?’

‘জি না, ভূতের গল্প সাধারণত এ রকমই হয়। নতুনত্ব কিছু নেই। আমার শুধু একটা প্রশ্ন, মেয়েটার ডেডবডি কি শেষ পর্যন্ত ছিল?’

‘তার মানে?’

‘এ জাতীয় গল্পে ডেডবডি শেষ পর্যন্ত থাকে না। বাতাসে মিলিয়ে যায় কিংবা কুকুর খেয়ে ফেলে। আপনি জানেন কী হয়েছিল?’

‘আমি জানি না, আমি জিজ্ঞেস করি নি। আপনি গল্পটার কিছুই বিশ্বাস করেন নি, তাই না?’

‘জি না।’

'কেন, দয়া করে বলবেন কি?'

'এই জাতীয় ভয়াবহ অভিজ্ঞতা যখন হয়, তখন মানুষ খুব কনফিউজড্ অবস্থায় থাকে। কোনো ঘটনাই সে পরিষ্কার দেখে না। যা দেখে তাও সে গুছিয়ে বলতে পারে না। অথচ আপনার সুধাকান্ত বাবু চমৎকারভাবে সব বর্ণনা করলেন। অতি সূক্ষ্ম ডিটেলও বাদ দিলেন না। এই জিনিস পাওয়া যায় তৈরি করা গল্পে।'

আমি বললাম, 'সব মানুষ তো এক রকম নয়। কিছু কিছু মানুষ বিপর্যয়ের সময়ও মাথা ঠাণ্ডা রাখে।'

'তা রাখে। যেমন আমি নিজেই রাখি।'

'তার পরেও আপনি বললেন এটা একটা গল্প?'

'জি।'

'কেন বলুন তো?'

'সুধাকান্তবাবু আপনার কথামতো একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ, সাধু-প্রকৃতির লোক। এই ধরনের একজন মানুষ বিপদে ঈশ্বরের নাম নেবে, গায়ত্রী মন্ত্র পড়বে। একজন নাস্তিক পর্যন্ত যে কাজটা করবে, তিনি করেন নি। ঘটনা সত্যি-সত্যি ঘটলে তিনি তা অবশ্যই করতেন। যেহেতু ঘটনাটা বানানো, কাজেই এই গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা বাদ পড়েছে।'

আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইলাম। লোকটার ওপর খানিকটা রাগ হচ্ছে। এককথায় সে বলে দিল গল্প বানানো?

মিসির আলি বললেন, 'আপনার সঙ্গে যখন গল্প করছিলেন, তখন ভয় পেয়ে ভদ্রলোক মন্ত্রপাঠ শুরু করলেন, অথচ ঐ রাতে করলেন না। ব্যাপারটা অদ্ভুত না?'

আমি বললাম, 'সুধাকান্ত বাবু শুধু শুধু এরকম একটা গল্প বানাবেন কেন? এই রকম একটা গল্প তৈরির পিছনে কোনো একটা কারণ থাকবে নিশ্চয়ই।'

'তা তো থাকবেই। তাঁরও আছে।'

'কী কারণ?'

'অনেক কারণ হতে পারে। তবে আমার যা মনে হয়, তা হচ্ছে উনি নিঃসঙ্গ ধরনের মানুষ, এই জাতীয় একটা গল্প তৈরি করে নিজে সবার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছেন। এটা একজন নিঃসঙ্গ মানুষের জন্যে কম কথা নয়।'

মিসির আলি লোকটির প্রতি আমার ভক্তি হলো। লজিক বা 'যুক্তি' নামক ব্যাপারটা যে কত শক্তিশালী হতে পারে, মিসির আলি তা আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

আমি বললাম, 'এই গল্পটা যে সত্যি, এটা আপনি কখন স্বীকার করবেন? অর্থাৎ কোন প্রমাণ উপস্থিত করলে আপনি গল্পটা মেনে নেবেন?'

মিসির আলি হাসতে হাসতে বললেন, 'ঐ মেয়েটির ডেডবডি যদি অন্যরা দেখে থাকে এবং কবর দেওয়া হয় বা দাহ করা হয়, তবেই আমি ঘটনাটা মেনে নেব।'

'আমি আপনাকে খবরটা এনে দেব। আমি চিঠি লিখে খবরটা জোগাড় করব। আপনি আপনার ঠিকানা লিখে রেখে যান।'

মিসির আলি তাঁর ঠিকানা লিখে রেখে চলে গেলেন। আশ্চর্য কাণ্ড, আজও তাঁর

পলিথিনের ব্যাগ ফেলে গেলেন। ব্যাগের ভেতর ছোট্ট একটা পাউরুটি, একটা কলা এবং এক টুকরো মাখন। গরমে সেই মাখন গলে ব্যাগময় ছড়িয়ে পড়েছে।

চিঠি লিখলাম আমার মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে যে মেয়েটির বিয়ের কথা হয়েছিল, সেই মেয়ের বড়চাচাকে। আমার ধারণা ছিল ভদ্রলোক জবাব দেবেন না। যে পরিচয়ের সূত্র ধরে চিঠি লিখেছি, সেই সূত্রে চিঠির জবাব দেওয়ার কথা নয়। ভদ্রলোক কিন্তু জবাব দিলেন। এবং বেশ গুছিয়েই জবাব দিলেন।

> 'আপনার পত্র পাইয়াছি।
>
> এক নিতান্ত দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় আপনাদের সহিত পরিচয় হইয়াছিল। আপনি যে সেই পরিচয় মনে রাখিয়া পত্র দিয়াছেন তাহাতে কৃতজ্ঞ হইলাম। আপনি আমার ভাইস্তি প্রসঙ্গে জানিতে চাহিয়াছেন। দুই বৎসর আগে তাহার বিবাহ হইয়াছে। এই খবর তো আপনার জানা। সে এখন তাহার স্বামীর সহিত ইরাকে আছে। তাহার স্বামী একজন ডাক্তার। আপনাদের দোয়ায় তাহারা ভালোই আছে।
>
> দ্বিতীয় যে বিষয়টি আপনি জানিতে চাহিয়াছেন, তাহার সবই সত্য। কুকুরের কামড়ে ছিন্নভিন্ন বালিকাটির দেহ আমরা সবাই দেখিয়াছি। তাহার মৃতদেহ সৎকারের কোনো ব্যবস্থা হয় নাই, কারণ বালিকাটি হিন্দু কি মুসলিম তাহা জানা সম্ভব হয় নাই।
>
> ঘটনাটি সেই সময় জনমনে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার মফস্বল পাতায় খবরও ছাপা হইয়াছিল।
>
> অধিক আর কি? আমরা ভালো আছি। আপনার সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি।'

আমি চিঠিটি ডাকযোগে মিসির আলির ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলাম। মনে মনে হাসলাম। অভ্রান্ত যুক্তিও মাঝে মাঝে অচল হয়ে যায়। এই চিঠিটা হচ্ছে তার প্রমাণ।

চিঠি পাঠাবার তৃতীয় দিনের মাথায় মিসির আলি এসে উপস্থিত। আমি হেসে বললাম, 'কি, গল্পটা এখন বিশ্বাস করলেন?'

মিসির আলি শুকনো গলায় বললেন, 'হুঁ।'

তাঁকে খুব চিন্তিত মনে হলো।

আমি বললাম, 'আপনাকে এত চিন্তিত মনে হচ্ছে কেন?'

মিসির আলি বললেন, 'আমি আপনার কাছ থেকে গল্পটা আবার শুনতে চাই।'

'কেন?

'প্লিজ, আরেক বার বলুন।'

'আবার কেন?'

'বলুন শুনি।'

আমি দ্বিতীয় বার গল্পটা শুরু করলাম। এক জায়গায় মিসির আলি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'কত তারিখ বললেন?'

'বারোই কার্তিক। এই তারিখে ঘটনাটা ঘটল।'

'বারোই কার্তিক তারিখটা আপনার মনে আছে?'

'হ্যাঁ, আছে। প্রথম বার যখন আপনাকে গল্পটা বলি, তখনও তো বারোই কার্তিক বলেছিলাম বলে আমার মনে হয়।'

'হ্যাঁ বলেছিলেন। আজও সেই একই তারিখ বলেন কি-না তাই দেখতে চেয়েছি। এই তারিখটা বেশ জরুরি।'

'জরুরি কেন?'

'বলছি কেন। তার আগে আপনি বলুন বারো তারিখটা আপনার মনে রইল কেন? এসব দিন-তারিখ তো আমাদের মনে থাকে না।'

'বারো তারিখ আমার বড়মেয়ের জন্মদিন। কাজেই সুধাকান্ত বাবু বারো তারিখ বলামাত্র আমার মনে গেঁথে গেল। তা ছাড়া আমার স্মৃতিশক্তি ভালো।'

'তাই তো দেখছি!'

'এখন বলুন তারিখটা এত জরুরি কেন?'

'যে-বছরে ঘটনাটা ঘটল, আমি সেই বছরের পঞ্জিকা দেখেছি। বারো তারিখ হচ্ছে ২৪শে অক্টোবর। স্কুল ছুটি থাকে। ঐদিন লক্ষ্মীপূজার বন্ধ। কাজেই আপনার সুধাকান্ত বাবু আপনাকে একটা মিথ্যা কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, ঐদিন স্কুল করেছেন।'

'হয়তো উনিই তারিখটা ভুল বলেছেন।'

'হ্যাঁ, তা হতে পারে। তবে আমি তাঁর নিজের মুখে ঘটনাটা শুনতে চাই।'

'আবার শুনতে চান?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছি না।'

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'বিশ্বাস করতে না চাইলে করবেন না। আপনাকে বিশ্বাস করতেই হবে এমন কোনো কথা আছে?'

মিসির আলি বললেন, 'আপনি কি একটু যাবেন আমার সঙ্গে?'

'কোথায়?'

'ঐ জায়গায়।'

'কেন?'

'তাহলে জেনে আসতাম তারিখটা বারো কি-না।'

'আপনি কি পাগল নাকি ভাই?'

মিসির আলি বললেন, 'ব্যাপারটা খুব জরুরি। আমাকে জানতেই হবে।'

'জানতে হলে আপনি যান। আমি আপনাকে ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি।'

'আপনি যাবেন না?'

'জি না। আজেবাজে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় আমার নেই।'

'এটা আজেবাজে ব্যাপার না।'

'আমার কাছে আজেবাজে। আমার যাবার প্রশ্নই ওঠে না।'

মিসির আলি মুখ কালো করে উঠে গেলেন। আমি মনে মনে বললাম, ভালো পাগলের পাল্লায় পড়েছি। লোকটা মনে হলো অ্যাবনর্ম্যাল। অ্যাবনর্ম্যাল সাইকোলজি করতে করতে নিজেও ঐ পর্যায়ে পৌঁছেছে। এরা দেখি বিপজ্জনক ব্যক্তি!

মিসির আলি যে কী পরিমাণ বিপজ্জনক ব্যক্তি তা টের পেলাম দিন দশেক পর। আমার ঠিকানায় মিসির আলির এক চিঠি এসে উপস্থিত।

'ভাই,

আপনি কেমন আছেন?

আমি সুধাকান্ত বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। দেখা হয় নি। উনি তাঁর দূর সম্পর্কের এক বোনের বাড়ি চলে গিয়েছেন বলে দেখা হয় নি। শুনলাম, তিনি সেখানে পুরো গরমের ছুটিটা কাটাবেন। যাই হোক, ওঁর অনুপস্থিতিতে আমি কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি। থানায় গিয়ে থানার রেকর্ডপত্র দেখেছি। ঐখানে ঘটনার তারিখ ২৩শে অক্টোবর দিবাগত রাত। অর্থাৎ ১১ই কার্তিক। কাজেই সুধাকান্ত বাবু তারিখ বলায় একটু ভুল করেছেন বলে মনে হয়। আমি স্থানীয় স্কুলের হেডমাস্টার সাহেবের সঙ্গেও কথা বলেছি। তিনি বলেছেন, ঐদিন সুধাকান্ত বাবু ঠিকই সারা দিন ক্লাস করেছেন। কাজেই সুধাকান্ত বাবু মিথ্যা বলেন নি। তারিখে ভুল করেছেন।

তারিখ ভুল করা খুব অস্বাভাবিক নয়। ভদ্রলোকের স্মৃতিশক্তি তেমন ভালো না। কারণ আপনার মুখেই শুনেছি দ্বিতীয় বার যখন তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয়, তখন তিনি আপনাকে চিনতে পারেন নি।

থানার ওসি সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম– পোস্টমর্টেম করা হয়েছিল কি? উনি বললেন– পোস্টমর্টেমের মতো অবস্থা ছিল না। কুকুর সব ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়ে ফেলেছে। ছিন্নভিন্ন কিছু অংশ ছড়িয়ে ছিল। গ্রামের অন্যরাও তাই বলল।

মেয়েটি কোথাকার তাও জানা যায় নি। আমি এত দিন পর এসব খোঁজ করছি দেখে তারা প্রথমে একটু অবাক হলেও পরে আমাকে আগ্রহ করে সাহায্য করেছে, কারণ তাদের বলেছি আমার কাজই হচ্ছে রহস্যময় ঘটনা সংগ্রহ করা। গ্রামবাসীদের ধারণা, মেয়েটির অশরীরী আত্মা এখনো ঐ বাড়িতে ঘুরে বেড়ায়। নানান রকম শব্দ শোনা যায়। মেয়েলি কান্না, দরজা-জানালা আপনা-আপনি বন্ধ হওয়া– এইসব। আমি ব্যাপারটা পরীক্ষা করার জন্যে দু'রাত এই বাড়ির উঠোনে বসে ছিলাম। তেমন কিছু দেখি নি বা শুনি নি। তবে একবার বাড়ির পিছনে মানুষ দৌড়ে যাবার শব্দ

শুনেছি। এটা শেয়ালের দৌড়ে যাবার শব্দও হতে পারে। সারা জীবন শহরে মানুষ হয়েছি বলে এই জাতীয় শব্দের সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় নেই।

আপনাকে চিঠিতে সব জানাচ্ছি, কারণ আমার শরীরটা খুবই খারাপ। ওখান থেকে এসেই প্রবল জ্বরে পড়ে যাই। একবার রক্তবমি হয় বলে ভয় পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি। এখন আছি মিটফোর্ড হাসপাতালে। ওয়ার্ড দু'শ' তেত্রিশ। বেড নাম্বার সতের। আপনি যদি আসেন তাহলে খুব খুশি হব। সুধাকান্ত বাবু প্রসঙ্গে একটা জরুরি আলাপ ছিল। আশা করি আপনি ভালো আছেন।'

আমি এই চিঠি ফেলে দিলাম। একটা পাগল লোককে শুরুতে খানিকটা প্রশ্রয় দিয়েছি বলে আফসোস হতে লাগল। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে এই লোক আমার পিছনে জোঁকের মতো লেগে থাকবে এবং জীবনটা অস্থির করে তুলবে।

তাকে হাসপাতালে দেখতে যাবার পিছনেও কোনো যুক্তি খুঁজে পেলাম না। দেখতে যাওয়া মানে তাকে প্রশ্রয় দেওয়া। দূরে দূরে থাকাই ভালো। দেখা হলে বলা যাবে– চিঠি পাই নি। বাংলাদেশে চিঠি না-পাওয়া এমন কিছু অবিশ্বাস্য ব্যাপার না। খুবই স্বাভাবিক।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, হাসপাতালেই নিতান্ত কাকতালীয়ভাবে মিসির আলির সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। টেম্পোর সঙ্গে অ্যাকসিডেন্ট করে আমার এক কলিগ পা ভেঙে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাঁকে দেখে ফিরে আসছি, হঠাৎ শুনি পিছন থেকে চিকন গলায় কে যেন আমাকে ডাকছে, 'হুমায়ূন সাহেব। এই যে হুমায়ূন সাহেব।'

তাকিয়ে দেখি আমাদের মিসির আলি।

বিছানার সঙ্গে মিশে আছেন। গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না। চিঁচিঁ আওয়াজ হচ্ছে। আমি বললাম, 'আপনার এ কী অবস্থা!'

'অসুখটা কাহিল করে ফেলেছে। গতকাল পর্যন্ত ধারণা ছিল মারা যাচ্ছি। আজ একটু ভালো।'

'ভালোর বুঝি এই নমুনা?'

'রক্ত পড়াটা বন্ধ হয়েছে। তবে ব্যথা সারে নি। ভাই, বসুন। আপনি আমাকে দেখতে এসেছেন, বড়ই আনন্দ হচ্ছে। আসছেন না দেখে ভাবছিলাম হয়তো চিঠি পান নি।'

আমি খানিকটা লজ্জিত বোধ করতে লাগলাম। একবার ইচ্ছা হলো সত্যি কথাটা বলি। বলি যে, তাঁকে দেখতে আসি নি, ভাগ্যচক্রে দেখা হয়ে গেল। পরক্ষণেই মনে হলো, সব সত্যি কথা বলতে নেই।

'হুমায়ূন সাহেব।'

'জি?'

'বসুন ভাই, একটু বসুন।'

আমি বসলাম। মিসির আলি বললেন, 'আপনাকে দেখে ভালো লাগছে। একটা বিশেষ কারণে মনটা খুব খারাপ ছিল।'

'বিশেষ কারণটা কী?'

'এগার নম্বর বেডটার দিকে তাকিয়ে দেখুন। আলসারের পেশেন্ট। কিছু খেতে পারে না। হাসপাতাল থেকে যে খাবার দেয়, সবটাই রেখে দেয়। তখন কী হয় জানেন, তার ছোট ভাই সেটা খায়। খুব তৃপ্তি করে খায়। দিন-রাত বড় ভাইয়ের কাছে সে যে বসে থাকে, ঐ খাবারের আশাতেই বসে থাকে। আজ কী হয়েছে জানেন? বড় ভাইয়ের শরীর বোধহয় একটু ভালো হয়েছে, সে তার খাবার সব খেয়ে ফেলেছে। ছোট ভাইটা অভুক্ত অবস্থায় সারা দিন বসে আছে। অসম্ভব কষ্ট হয়েছে আমার, বুঝলেন। চোখে পানি এসে গিয়েছিল। আমাদের দেশের মানুষগুলো এত গরিব কেন বলুন তো ভাই?'

আমি মিসির আলির প্রশ্নের জবাব দিতে পারলাম না। এগার নম্বর বেডের দিকে তাকালাম। ষোল-সতের বছরের একজন যুবক অসুস্থ ভাইয়ের পাশে বসে আছে। আমি বললাম, 'ছেলেটি কি এখনো না-খেয়ে আছে?'

'হ্যাঁ। আমি নার্সের হাতে তার জন্যে পঞ্চাশটা টাকা পাঠিয়েছিলাম। সে রাখে নি। বড়ই কষ্ট হচ্ছে হুমায়ূন সাহেব।'

আমি মিসির আলির হাত ধরলাম। এই প্রথম বুঝলাম– এই মানুষটি আমাদের আর দশটি মানুষের মতো নয়। এই রোগা আধপাগলা মানুষটির হৃদয়ে সমুদ্রের ভালোবাসা সঞ্চিত আছে। এদের স্পর্শ করলেও পুণ্য হয়।

'হুমায়ূন সাহেব।'

'জি?'

'এই খাতাটা আপনি মনে করে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।'

'কী খাতা?'

'সুধাকান্ত বাবুর বিষয়ে এই খাতায় অনেক কিছু লিখে রেখেছি। বাসায় নিয়ে মন দিয়ে পড়বেন।'

'শরীরের এই অবস্থায়ও আপনি সুধাকান্ত বাবুকে ভুলতে পারেন নি?'

'হাসপাতালে শুয়ে-শুয়ে এইটা নিয়েই শুধু ভাবতাম। কিছু করার ছিল না তো। অনেক নতুন-নতুন পয়েন্ট ভেবে বের করেছি। সব লিখে ফেলেছি।'

'ভালো করেছেন। এখন বিশ্রাম করুন। আমি খাতা নিয়ে যাচ্ছি। কাল আবার আসব।'

মিসির আলি নিচু গলায় বললেন, 'একবার কি চেষ্টা করে দেখবেন ঐ ছেলেটিকে বাইরে নিয়ে কিছু খাওয়ানো যায় কি-না?'

'আমি দেখব। আপনি এই নিয়ে ব্যস্ত হবেন না।'

'আমি ব্যস্ত হচ্ছি না।'

চলে আসার আগে আগে মিসির আলি বললেন, 'আপনি কষ্ট করে আমাকে দেখতে এসেছেন, আমি খুবই আনন্দিত।'

আমি আবার লজ্জা পেলাম।

ব্যক্তিগত কাজ অনেক জমে ছিল, মিসির আলির খাতা নিয়ে বসা হলো না। আমি তেমন উৎসাহও বোধ করছিলাম না। সামান্য গল্প নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ির আমি কোনো অর্থ দেখি না। আমি লক্ষ করেছি– গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বেশিরভাগ মানুষ সম্পূর্ণ অবহেলা করে, মাতামাতি করে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে। মিসির আলিও নিশ্চয় এই গোত্রের। পরিবার-পরিজনহীন মানুষদের জন্যে এর অবশ্যি প্রয়োজন আছে। কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত থাকা– জীবন পার করে দেওয়া।

এক রাতে শোবার আগে খাতা নিয়ে বসলাম। পাতা উল্টে আমার আক্কেলগুড়ুম। একশ' ছিয়াশি পৃষ্ঠার ঠাসবুনোন লেখা। সুধাকান্ত বাবু এবং তার গল্প নিয়ে যে এত কিছু লেখা যায় কে জানত! পরিষ্কার গোটা গোটা লেখা। পড়তে খুব আরাম।

অবাক হয়ে লক্ষ করলাম আমাকে নিয়ে তিনি আট পৃষ্ঠা লিখেছেন। সেই অংশটিই প্রথম পড়লাম। শুরুটা এ রকম–

'নাম : হুমায়ূন আহমেদ।

বিবাহিত, তিন কন্যার জনক। পেশা অধ্যাপনা।

বদমেজাজি। অহঙ্কারী। অধ্যাপকদের যেটা বড় ত্রুটি– অন্যদের বুদ্ধিমত্তা খাটো করে দেখা, ভদ্রলোকের তা আছে।

এই ভদ্রলোকের স্মৃতিশক্তি ভালো। তিনি গল্পটি দু'বার আমাকে বলেছেন। দু'বারই এমনভাবে বলেছেন যে, একটি শব্দ এদিক-ওদিক হয় নি। তাঁর কথাবার্তায় চিরকুমার সুধাকান্ত বাবুর প্রতি গভীর মমতা টের পাওয়া যায়। এই মমতার উৎস কী?

সুধাকান্ত বাবু এই ভদ্রলোককে ক্ষুধার্ত অবস্থায় চমৎকার কিছু খাবার রান্না করে খাইয়েছেন– এইটাই কি একমাত্র কারণ? আমার মনে হয় সুধাকান্ত বাবুর চেহারা, কথাবার্তাও ভদ্রলোকের ওপর খানিকটা প্রভাব ফেলেছে। সুধাকান্ত বাবু অতি অল্প সময়ে এই বুদ্ধিমান মানুষটিকে প্রভাবিত করেছেন। কাজেই ধরে নেওয়া যায়, মানুষকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা সুধাকান্ত বাবুর আছে। আমরা তাহলে কি ধারণা করতে পারি না, সুধাকান্তবাবু তাঁর আশেপাশের মানুষদেরও প্রভাবিত করেছেন?'

সুধাকান্ত বাবুকে নিয়ে তিনটি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম– পূর্বপরিচয়। এই অংশে সুধাকান্ত বাবুর পরিবারের যাবতীয় বিবরণ আছে।

বাবার নাম, দাদার নাম, মার নাম। তাঁরা কে কেমন ছিলেন, কী করতেন, কে কীভাবে মারা গেলেন। দেশত্যাগ করলেন কবে। কেন করলেন। এত তথ্য ভদ্রলোক কীভাবে জোগাড় করলেন, কেনইবা করলেন কে জানে!

দ্বিতীয় অধ্যায়টির নাম– সুধাকান্ত বাবু ও তাঁর বাগদত্তা। এই অধ্যায়টি বেশ ছোট। পড়ে মনে হলো মিসির আলি তেমন কোনো তথ্য জোগাড় করতে পারেন নি।

তৃতীয় অধ্যায় সুধাকান্ত বাবুর চরিত্র এবং মানসিকতা নিয়ে। শুরুটা এমন–

ভদ্রলোক নিজেকে সাধুশ্রেণীতে ফেলেছেন। শুরুতেই তিনি বলছেন যে, সাধু-সন্ন্যাসীর জীবনযাত্রায় তাঁর আগ্রহ আছে। শ্মশানে-শ্মশানে ঘুরতেন এবং স্থানীয় লোকজনও তাঁকে সাধুবাবা বলে। নিজের সাধু-চরিত্রটির প্রতি ভদ্রলোকের দুর্বলতা আছে। এই দুর্বলতার কারণ কী? প্রকৃত সাধুশ্রেণীর লোক শুরুতেই অন্যকে বলে না আমি সাধু। ইনি তা বলছেন, কাজেই ধরে নেওয়া যাক ইনি আমাদের মতোই দোষ-গুণসম্পন্ন সাধারণ একজন মানুষ।

তিনি নিঃসঙ্গ জীবন ঠিক পছন্দ করেন বলেও মনে হলো না। অনেক রাতে বাড়ি ফেরেন, যাতে একা-একা খুব অল্প সময় তাঁকে থাকতে হয়। একজন সাধকশ্রেণীর মানুষের চরিত্রের সঙ্গেও ব্যাপারটা মিশ খায় না।...

মিসির আলির খাতা শেষ করতে করতে রাত দুটো বেজে গেল। পরিশিষ্ট অংশে ভদ্রলোক ছ'টি প্রশ্ন তুলেছেন। এবং বলছেন– রহস্য উদ্ধারের জন্যে এই প্রশ্নগুলির জবাব জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই ছ'টি প্রশ্ন পড়ে আমার মাথা ঘুরতে লাগল। এ কী কাণ্ড! মিসির আলি সাহেবের খাতা আবার গোড়া থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়লাম। ছ'টা প্রশ্নের কাছে এসে আবার চমকালাম। আমার মাথা ঘুরতে লাগল। ইচ্ছে করল এক্ষুনি ছুটে যাই মিসির আলির কাছে।

মিসির আলি সাহেব আজ অনেক সুস্থ। গায়ে চাদর জড়িয়ে বিছানায় বসে আছেন। হাতে শিবরাম চক্রবর্তীর বই 'জন্মদিনের উপহার'। কিছুক্ষণ পড়ছেন, তারপর গা দুলিয়ে হাসছেন। আবার পড়ছেন, আবার হাসছেন।

আশেপাশের রুগীরা ব্যাপারটায় বেশ মজা পাচ্ছে। আগ্রহ এবং কৌতূহল নিয়ে তারা দেখছে এই বিচিত্র মানুষটাকে।

আমার দিকে চোখ পড়তেই মিসির আলি বললেন, 'শিবরামের বাঘের গল্পটা পড়েছেন? অসাধারণ! সকাল থেকে এখন পর্যন্ত এগারো বার গল্পটা পড়লাম।'

'তাই নাকি?'

'আমার কী মনে হয় জানেন? হাসপাতালের রুগীদের জন্যে এই জাতীয় বই অষুধপত্রের সঙ্গে দেওয়া দরকার। প্রাণ খুলে কয়েক বার হাসতে পারলে যে কোনো অসুখ অনেকটা কমে যায় বলে আমার ধারণা।'

'আপনার তাহলে কমে গেছে?'

'জি।'

আমি বললাম, 'আপনার খাতাটা কাল রাতে পড়ে শেষ করেছি। আমার মনে হয়, যে ছ'টি প্রশ্ন আপনি তুলেছেন, তার উত্তর জানা প্রয়োজন।'

'প্রয়োজন তো বটেই।'

'আমি আপনার সঙ্গে যাব এবং সুধাকান্ত বাবুর সঙ্গে কথা বলব।'

মিসির আলি হাসতে হাসতে বললেন, 'আমি জানতাম আপনি এই কথা বলবেন।'

আমি বললাম, 'কোনো একটা ভৌতিক গল্প শুনলেই কি আপনি এ-রকম করেন, সব রহস্য উদ্ধারের জন্যে লেগে পড়েন?'

মিসির আলি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

আমি বললাম, 'আপনি কি আপনার শোনামতো ভৌতিক গল্পের রহস্য ভেদ করতে পেরেছেন?'

'না, পারি নি। শতকরা বিশ ভাগ ক্ষেত্রে কিছুই করতে পারি নি। আমার আরেকটা খাতা আছে। ঐ খাতার নাম রহস্য খাতা। যেসব সমস্যা আমি সমাধান করতে পারি নি, রহস্য-খাতায় সেইসব লিখে রেখেছি। আপনাকে একদিন পড়তে দেব।'

'ঠিক আছে। আপনার "রহস্য-খাতা" একদিন পড়ব।'

'কিংবা আপনি যদি চান তাহলে ঐখানকার একটা গল্প আপনাকে শোনাতেও পারি।'

'এইখানে বলবেন?'

'অসুবিধা কী? হাসপাতালে একটা ক্যান্টিন আছে। ক্যান্টিনে বসে চা খেতে-খেতে গল্পটা আপনাকে বলতে পারি। আসলে ব্যাপারটা কি জানেন– আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার ভালো লাগছে। একটা গল্প যদি শুরু করি, তাহলে ভদ্রতার কারণেই আপনি গল্প শেষ না করা পর্যন্ত বসে থাকবেন। এটাই হচ্ছে আমার লাভ।'

'আপনার শরীরের এই অবস্থায় আপনি ক্যান্টিনে যেতে পারবেন?'

'পারব। আমাকে যতটা কাহিল দেখাচ্ছে, ততটা কাহিল কিন্তু না। আসুন যাই।'

আমরা ক্যান্টিনে বসলাম।

অবাক হয়ে লক্ষ করলাম হাসপাতাল নোংরা হলেও ক্যান্টিনটা বেশ পরিষ্কার। ভিড় আছে, তবে হৈচৈ নেই। দু'ধরনের চা পাওয়া যাচ্ছে– এক নম্বরী চা এবং দু'নম্বরী চা। এক নম্বরী চা এক টাকা করে, দু' নম্বরীটা তিন টাকা করে। মিসির আলি বললেন, 'একই চা দু'ধরনের কাপে দেওয়া হলো বলে দু'ধরনের দাম। এবং মজার ব্যাপার কী জানেন, সবাই কিন্তু বেশি দামের চা'টা খাচ্ছে। গতকালও চা খেতে এসেছিলাম। একজনকে বলতে শুনলাম– 'এক নম্বরী চা মুখে দেওয়া যায় না। খানিকটা পানি গরম করে এনে দিয়ে দেয়।'

আমি বললাম, 'আপনি কি নিশ্চিত যে দুটো চা-ই এক?'

'হ্যাঁ, নিশ্চিত। প্রমাণ করে দিতে পারি। করব?'

'না, প্রমাণ করতে হবে না। আপনার কথা আমি বিশ্বাস করছি। এখন আপনার গল্পটা বলুন।'

'আপনার কি তাড়া আছে?'

'না, তাড়া নেই। তবু বেশিক্ষণ হাসপাতালে থাকতে আমার ভালো লাগে না।' মিসির আলি সঙ্গে সঙ্গে গল্প শুরু করলেন–

'রহস্য-খাতায় এই গল্পের নম্বর হচ্ছে একুশ। অর্থাৎ এটা একুশ নম্বর গল্প। এর চেয়ে অনেক ভয়ংকর গল্প আমার স্টকে আছে, তুব এটা বলছি, কারণ এটা বলতে গেলে একটা ফার্স্ট-হ্যান্ড স্টোরি। আমার নিজের জীবনে ঘটে নি, তবে যার জীবনে ঘটেছে, সে আমার প্রিয় এক মানুষ। ঘটনাটার সঙ্গে আমার যোগাযোগও প্রত্যক্ষ।'...

'মেয়েটি হচ্ছে আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়-আমার মা'র মামাতো বোনের মেয়ে। গ্রামের মেয়ে। হোস্টেলে থেকে ময়মনসিংহ মমিনুন্নেসা কলেজে পড়ত। সেকেন্ড ইয়ারে উঠে হঠাৎ করে তার বিয়ে হয়ে যায়। খুব বড় ঘরে বিয়ে হয়। ছেলের অর্থ, বিত্ত এবং প্রতিপত্তির কোনো অভাব নেই। পরিবারটিও এ দেশের নামকরা পরিবার। নাম বললেই আপনি চিনবেন, তাই নাম বলছি না। শুধু ধরে নিন যে, এই দেশের রাজনীতিতে এই পরিবারটির প্রত্যক্ষ যোগ আছে।'

'আপনি গল্পটা বলুন। বিত্তবান পরিবারের ব্যাপারে আমার আগ্রহ নেই।'

'আমার নিজেরও নেই এবং আমার ঐ খালার মেয়েটিরও ছিল না। অত্যন্ত ক্ষমতাবান একটি পরিবারে বিয়ে হবার কারণে তার জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। কিছুদিন স্বামীর সঙ্গে ইউরোপ-আমেরিকা ঘুরল। সেই বছর পরীক্ষা দেওয়া হলো না। তার পরের বছরও হলো না, কারণ সে তখন কনসিভ করেছে।...

'সমস্যা শুরু হলো তখন, যখন মেয়েটি বিচিত্র সব স্বপ্ন দেখতে লাগল। প্রতিটি স্বপ্নের মূল বিষয় একটিই– ছোট্ট একটা ছেলে এসে তাকে বলে : মা, তোমাকে একটা কথা বলি, মন দিয়ে শোনো। আমাকে এরা মেরে ফেলবে। যে রাতে আমার জন্ম হবে সেই রাতেই ওরা আমাকে মারবে। তুমি আমাকে রক্ষা করো।...

'বুঝতেই পারছেন, গর্ভবতী একটি মেয়ের কাছে এই জাতীয় স্বপ্ন কতটা ভয়াবহ। মেয়েটি অস্থির হয়ে পড়ল। খেতে পারে না, ঘুমুতে পারে না এবং প্রায় রোজই এই জাতীয় স্বপ্ন দেখে।...

'আমার সঙ্গে মেয়েটির তখন যোগাযোগ হয়। আমি তাকে নানানভাবে বুঝিয়ে বলি যে এটা কিছুই না। গর্ভবতী মেয়েদের অবচেতন মনে একটা মৃত্যুভয় থেকেই যায়। সেই ভয় নানাভাবে প্রকাশ পায়। তোমার বেলায় এইভাবে প্রকাশ পাচ্ছে।

'মেয়েটির স্বামী বিষয়টি নিয়ে খুব বিব্রত বোধ করছিল। সে ঠিক করে রেখেছিল যে মেয়েটির মনের শান্তির জন্যে ডেলিভারির ব্যাপারটা এ দেশে না করে বিদেশের কোনো হাসপাতালে করা হবে।...

'সেটা সম্ভব হলো না। আট মাসের শেষে হঠাৎ করে মেয়েটির ব্যথা উঠল। তাড়াহুড়ো করে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো ঢাকার নামকরা একটা ক্লিনিকে। নর্ম্যাল ডেলিভারি হলো। রাত দুটোয় মেয়েটি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল।'

মিসির আলি থামলেন। ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'অনেকের সঙ্গে আমিও ক্লিনিকে অপেক্ষা করছিলাম। মেয়েটি আমার একজন রোগী, কাজেই আমার খানিকটা

দায়িত্ব আছে। ক্লিনিকের পরিচালক একজন মহিলা ডাক্তার। তিনি আমাকে ডেকে ভেতরে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, 'যে বাচ্চাটির জন্ম হয়েছে তাকে একটু দেখুন।'...

'আমি দেখলাম।

'একটা গামলার ভেতর বাচ্চাটিকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। জেলি ফিশ আপনি দেখেছেন কি-না জানি না, শিশুটির সমস্ত শরীর জেলি ফিশের মতো স্বচ্ছ, থলথলে, গাঢ় নীল রঙ। শুধু মাথাটা মানুষের। মাথাভর্তি রেশমি চুল। বড়-বড় চোখ। হাত-পা কিছু নেই। অক্টোপাসের মতো নলজাতীয় কিছু জিনিস কিলবিল করছে।...

'আমি খুবই সাহসী মানুষ, কিন্তু এই দৃশ্য দেখে ভয়ে গা কাঁপতে লাগল।

'ডাক্তার সাহেব বললেন, "এই শিশুটিকে আপনি কী করতে বলেন?"...

আমি বললাম, "আমার বলায় কিছু আসে-যায় না।" বাচ্চার বাবা-মা কি বলেন?

'বাচ্চার মাকে জানানো হয় নি। তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। বাচ্চার বাবা চান না বাচ্চা বেঁচে থাকুক।'...

'আমি চুপ করে রইলাম। তিনি বললেন, "এ রকম অ্যাবনর্মাল বাচ্চা এম্নিতেই মারা যাবে। আমাদের মারতে হবে না। প্রকৃতি এত বড় ধরনের অ্যাবনর্মালিটি সহ্য করবে না।"

'আমি কিছু বললাম না। বাচ্চাটিকে ফুল স্পিড ফ্যানের নিচে রেখে দেওয়া হলো। প্রচণ্ড শীতের রাত, বাচ্চাটির মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে, এতেই তার মরে যাওয়া উচিত, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার– ভোর পাঁচটায় দেখা গেল, বাচ্চা দিব্যি সুস্থ। বড়-বড় চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, শিস দেওয়ার মতো শব্দ করছে। ভোর সাড়ে পাঁচটায় সবার সম্মতি নিয়ে বাচ্চাটিকে একশ' সিসি ইমাডোজল ইনজেকশন দেওয়া হলো। যে কোনো পূর্ণবয়স্ক লোক এতে মারা যাবে, কিন্তু তার কিছু হলো না। শুধু শিস দেওয়ার ব্যাপারটা একটু কমে গেল। ভোর ছ'টায় দেওয়া হলো পঞ্চাশ সিসি এট্রোজিন সল্যুশন। বাচ্চাটা মারা গেল ছ'টা বিশে। বাচ্চার মা জানতে পারল না। সে তখনো ঘুমে অচেতন।'

মিসির আলি গল্প শেষ করলেন। আমি বললাম, 'তারপর?'

'তারপর আবার কি? গল্প শেষ।'

'বাচ্চাটির মা'র কী হলো?'

'বাচ্চার মা'র কী হলো তা দিয়ে তো আমাদের প্রয়োজন নেই। রহস্য তো এখানে নয়। রহস্য হচ্ছে বাচ্চার মা যে-স্বপ্নগুলি দেখত সেখানে। সেই রহস্য আমি ভেদ করতে পারি নি। সুধাকান্ত বাবুর রহস্যও শেষ পর্যন্ত ভেদ করতে পারব কি না তা জানি না।'

'আমার তো মনে হয় রহস্য ভেদ করেছেন।'

'কাগজপত্রে করেছি। কাগজপত্রে রহস্য ভেদ করা এক জিনিস, বাস্তব অন্য জিনিস। যখন সুধাকান্ত বাবুর মুখোমুখি বসব তখন হয়তো দেখব গুছিয়ে আনা জিনিস সব এলোমেলো হয়ে গেছে। মজার ব্যাপার কী জানেন ভাই? প্রকৃতি রহস্য পছন্দ করে না, সে নিজে কিন্তু খুব রহস্যময়।'

'কবে যাবেন সুধাকান্ত বাবুর কাছে?'

'হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেই যাব। আপনি কি যাবেন আমার সঙ্গে?'

আমি বললাম, 'অবশ্যই।'

রাত প্রায় ন'টা।

আমি এবং মিসির আলি সুধাকান্ত বাবুর বাড়ির উঠোনে বসে আছি। সুধাকান্ত বাবু চুলায় চায়ের পানি চড়িয়েছেন। তিনি আমাদের যথেষ্ট যত্ন করছেন। মিসির আলিকে খুব আগ্রহ নিয়ে বাড়ি ঘুরে-ঘুরে দেখালেন। নানা গল্প করলেন।

বাড়ি আগের মতোই আছে। তবে কামিনী গাছ দুটির একটি নেই। মরে গেছে। কুয়ার কাছে সারি বেঁধে কিছু পেয়ারা গাছ লাগানো হয়েছে, যা আগে দেখি নি।

সুধাকান্ত বাবু বললেন, 'চা খেয়ে আপনারা বিশ্রাম করুন, আমি খিচুড়ি চড়িয়ে দিচ্ছি।'

মিসির আলি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'খিচুড়ি মন্দ হবে না। তা ছাড়া শুনেছি আপনার রান্নার হাত অপূর্ব।'

আমাদের চা দিয়ে সুধাকান্ত বাবু খিচুড়ি চড়িয়ে দিলেন। মিসির আলি বললেন, 'রান্না করতে করতে আপনি আপনার ভৌতিক অভিজ্ঞতার কথা বলুন। এটা শোনার জন্যেই এসেছি। আগেও একবার এসেছিলাম, আপনাকে পাই নি।'

'জানি। খবর দিয়ে এলে থাকতাম। আমি বেশিরভাগ সময়ই থাকি।'

'শুরু করুন।'

সুধাকান্ত বাবু গল্প শুরু করলেন। ভৌতিক গল্পের জন্যে চমৎকার একটা পরিবেশ। অন্ধকার উঠোন। আকাশে নক্ষত্রের আলো। উঠোনের ওপর দিয়ে একটু পরপর হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। একটা তক্ষক ডাকছে। তক্ষকের ডাক বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য ঝিঁঝিপোকা ডেকে উঠছে। ঝিঁঝিপোকা থামতেই তক্ষক ডেকে ওঠে। তক্ষকরা চুপ করতেই ডাকে ঝিঁঝিপোকা। অদ্ভুত কনসার্ট!

সুধাকান্ত গল্প বলে চলেছেন। মিসির আলি মাঝে মাঝে তাঁকে থামাচ্ছেন। গভীর আগ্রহে বলছেন, 'এই জায়গাটা দয়া করে আরেক বার বলুন। অসাধারণ অংশ। গা শিউরে উঠছে।'

সুধাকান্ত বাবু তাতে বিরক্ত হচ্ছেন না। সম্ভবত মিসির আলির গভীর আগ্রহ তাঁর ভাল লাগছে।

যেখানে মেয়েটি সুধাকান্ত বাবুর পা কামড়ে ধরে, সেই অংশ মিসির আলি তিন বার শুনলেন। শেষ বার গভীর আগ্রহে বললেন, 'আপনি যখন পালিয়ে যাচ্ছিলেন তখন মেয়েটি পিছন থেকে আচমকা আপনাকে কামড়ে ধরল?'

'জি।'

'হাত দিয়ে ধরল না, আঁচড় দিল না– শুধু কামড়ে ধরল?'

'জি।'

'দেখি কামড়ের দাগটা।'

তিনি কামড়ের দাগ দেখালেন। মিসির আলি পায়ের দাগ পরীক্ষা করলেন। জড়ানো গলায় বললেন, 'কী অদ্ভুত গল্প! তারপর কী হলো?'

সুধাকান্ত বাবু গল্পে ফিরে গেলেন।

এক সময় গল্প শেষ হলো। সুধাকান্ত বাবু বললেন, 'খিচুড়ি নেমে গেছে। আপনাদের কি এখন দিয়ে দেব? রাত মন্দ হয় নি কিন্তু।'

মিসির আলি বললেন, 'জি, খেয়ে নেব। আপনাকে দু'-একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি।'

'জিজ্ঞেস করুন।'

'মেয়েটি শুধু কামড়ে ধরল– হাত দিয়ে আপনাকে ধরল না কেন?'

'আমি কী করে বলব বলুন। আমার পক্ষে তো জানা সম্ভব না।'

'আমার কিন্তু মনে হয় আপনি জানেন।'

সুধাকান্ত বাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

মিসির আলি বললেন, 'আপনার গল্পের সবচেয়ে দুর্বল অংশ মেয়েটির কামড়ে-ধরা। মেয়েটি কিন্তু পেছন থেকে আপনাকে কামড়ে ধরে নি। পায়ের দাগ দেখেই বোঝা যাচ্ছে কামড়ে ধরেছে সামনে থেকে। আপনার দাগ ভালোভাবে পরীক্ষা করলেই তা বোঝা যায়। আপনাকে আক্রমণ করবার জন্যে মেয়েটি তার হাত ব্যবহার করে নি। কারণ একটাই– সম্ভবত তার হাত পেছন থেকে বাঁধা ছিল। তাই নয় কি?'

সুধাকান্ত বাবুর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। একটি কথাও বললেন না।

মিসির আলি বললেন, 'আপনার গল্পে একটা কুকুর আছে। পাগলা কুকুর। হাইড্রোফোবিয়ার কুকুর কিছুই খায় না। অসহ্য যন্ত্রণায় মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করে। অথচ এই কুকুরটা আস্ত একটি মেয়েকে খেয়ে ফেলল, পাঁচটা সুস্থ কুকুরের পক্ষেও যা সম্ভব নয়। আপনি অসাধারণ একটা ভূতের গল্প তৈরি করেছেন। কিন্তু গল্পে অনেক ফাঁক রয়ে গেছে, তাই না?'

সুধাকান্ত বিড়বিড় করে কী যেন বললেন। আমি কাঠ হয়ে বসে রইলাম। কী শুনছি এসব! মিসির আলি লোকটি এসব কী বলছে!

মিসির আলি বললেন, 'ব্যাপারটা কী হয়েছিল আমি বলি। আপনি চিরকুমার একজন মানুষ। আপনার মনে আছে অবদমিত কামনা-বাসনা। মহাপুরুষরাও কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে নন। কীভাবে যেন আপনি অল্পবয়সি একজন কিশোরীকে আপনার ঘরে নিয়ে এলেন। এই মেয়েটি কীভাবে এলো বুঝতে পারছি না। বাড়ি থেকে পালিয়ে আসতে পারে বা অন্য কিছুও হতে পারে। এই অংশটা আমার কাছে পরিষ্কার না।...

'যাই হোক, মেয়েটিকে আপনার ঘরে নিয়েই আপনি তার হাত বেঁধে ফেললেন। মেয়েটির চিৎকার, কান্নাকাটি আশেপাশের কেউ শুনল না। কারণ আশেপাশে শোনার মতো কেউ নেই। মেয়েটি নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে আপনাকে কামড়ে ধরল। এই একটি অস্ত্রই তার কাছে ছিল।...

'অবশ্যি মেয়েটি নিজেকে রক্ষা করতে পারল না। শেষ পর্যন্ত মারা গেল।...

'আপনি তার মৃতদেহ ঘরেই ফেলে রাখলেন। দরজা-জানালা খুলে রাখলেন, যাতে শেয়াল-কুকুর শবদেহটা খেয়ে ফেলতে পারে। একদিনে তো একটা মানুষ শেয়াল-কুকুরে খেয়ে ফেলতে পারে না। হয়তো দু'দিন বা তিন দিল লাগল। এই সময়টা আপনি নষ্ট করলেন না, ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলেন। ভেবে ভেবে অসাধারণ একটা গল্প তৈরি করলেন। সেই গল্পে সূত্র আছে, কুকুর আছে, অশরীরী আত্মীয়রা আছে। কি সুধাকান্ত বাবু, আমি ঠিক বলি নি? দিন, এখন খাবার দিয়ে দিন– প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। খেয়ে নেব।'

আমি অবাক হয়ে দেখলাম সত্যি সত্যি মিসির আলি খেতে বসেছেন। সুধাকান্ত বাবু তাঁকে থালা এগিয়ে দিচ্ছেন। মিসির আলি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি খাবেন না?'

আমি বললাম, 'না, আমার খিদে নেই।'

মিসির আলি খেতে খেতে বললেন, 'সুধাকান্ত বাবু, আপনার বিরুদ্ধে কেস দাঁড় করাবার মতো কিছু আমার হাতে নেই। যেসব কথা আপনাকে বলেছি, সেসব আমি কোর্টে টেকাতে পারব না, আমি সেই চেষ্টাও করব না। কাজেই আপনার ভয়ের কিছু নেই। তবে আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, আপনি থানায় গিয়ে অপরাধ স্বীকার করবেন। আচ্ছা, মেয়েটার নাম কি ছিল?'

সুধাকান্ত গম্ভীর গলায় বললেন, 'বিন্তি। ওর নাম বিন্তি।'

'ও আচ্ছা, বিন্তি।'

মিসির আলি খুব আগ্রহ করে খাচ্ছেন। আমি দূরে থেকে তাঁকে দেখছি। সুধাকান্ত বাবুও দেখছেন। তাঁর চোখে পলক পড়ছে না। সেই পলকহীন চোখে গভীর বিস্ময়।

মিসির আলি বললেন, 'খিচুড়ি তো ভাই অপূর্ব হয়েছে! আমাকে রেসিপিটা দেবেন তো! আমিও আপনার মতো একা একা থাকি। মাঝে মাঝে খিচুড়ি রান্না করব।' বলেই মিসির আলি বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসলেন। আমি এর আগে এত অদ্ভুতভাবে কাউকে হাসতে শুনি নি, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

পরিশিষ্ট

আমার অধিকাংশ গল্পের শেষ থাকে না বলে পাঠক-পাঠিকারা আপত্তি তোলেন। এই গল্পের আছে। সুধাকান্ত বাবু তাঁর অপরাধ স্বীকার করে থানায় ধরা দিয়েছিলেন। বিচার শুরু হবার আগেই থানা-হাজতে তাঁর মৃত্যু হয়।

সঙ্গিনী

মিসির আলি বললেন, 'গল্প শুনবেন নাকি?'

আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম। রাত মন্দ হয় নি। দশটার মতো বাজে। বাসায় ফেরা দরকার। আকাশের অবস্থাও ভালো না। গুড় গুড় করে মেঘ ডাকছে। আষাঢ় মাস। যে কোনো সময় বৃষ্টি নামতে পারে।

আমি বললাম, 'আজ থাক। আরেকদিন শুনব। রাত অনেক হয়েছে। বাসায় চিন্তা করবে।'

মিসির আলি হেসে ফেললেন।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'হাসছেন কেন?'

মিসির আলি হাসতে হাসতেই বললেন, 'বাসায় কে চিন্তা করবে? আপনার স্ত্রী কি বাসায় আছেন? আমার তো ধারণা তিনি রাগ করে বাচ্চাদের নিয়ে বাবার বাড়িতে চলে গেছেন।'

মিসির আলির পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং সামান্য সূত্র ধরে সিদ্ধান্তে চলে যাবার প্রায় অলৌকিক ক্ষমতার সঙ্গে আমি পরিচিত। তবুও বিস্মিত হলাম। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আজ দুপুরেই বড় ধরনের ঝগড়া হয়েছে। সন্ধ্যাবেলায় সে স্যুটকেস গুছিয়ে বাবার বাড়ি চলে গেছে। একা একা খালি বাড়িতে থাকতে অসহ্য বোধ হচ্ছিল বলে মিসির আলির কাছে এসেছি তবে এই ঘটনার কিছুই বলি নি। আগ বাড়িয়ে পারিবারিক ঝগড়ার কথা বলে বেড়ানোর কোনো মানে হয় না।

আমি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললাম, 'ঝগড়া হয়েছে বুঝলেন কি করে?'

'অনুমানে বলছি!'

'অনুমানটাইবা কি করে করলেন?'

'আমি লক্ষ করলাম, আপনি আমার কাছে কোনো কাজে আসেন নি। সময় কাটাতে এসেছেন। গল্প করছেন এবং আমার গল্প শুনছেন। কোনো কিছুতেই তেমন আনন্দ পাচ্ছেন না। অর্থাৎ কোনো কারণে মন বিক্ষিপ্ত। আমি বললাম, ভাবী কেমন আছেন? আপনি বললেন, ভালো। কিন্তু বলার সময় আপনার মুখ কঠিন হয়ে গেল। অর্থাৎ ভাবীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। আমি তখন নিশ্চিত হবার জন্যে বললাম, আমার সঙ্গে চারটা ভাত খান। আপনি রাজি হয়ে গেলেন। আমি ধরে নিলাম– রাগারাগি হয়েছে এবং আপনার স্ত্রী বাসায় নেই। আপনার একা একা লাগছে বলেই আপনি এসেছেন আমার কাছে। এই সিদ্ধান্তে আসার জন্যে শার্লক হোমস হতে হয় না। একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলেই বুঝা যায়।'

আমি কিছু বললাম না। মিসির আলি বললেন, 'চা চড়াচ্ছি। চা খেয়ে গল্প শুনুন, তারপর এইখানেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। খালি বাসায় একা একা রাত কাটাতে ভাল লাগবে না। তাছাড়া বৃষ্টি নামল বলে।'

'এটাও কি আপনার লজিক্যাল ডিডাকশান?'

'না– এটা হচ্ছে উইশফুল থিংকিং। গরমে কষ্ট পাচ্ছি– বৃষ্টি হলে জীবন বাঁচে। তবে বাতাস ভারী, বৃষ্টির দেরি নেই বলে আমার ধারণা।'

'বাতাসের আবার হাল্কা-ভারী কি?'

'আছে। হাল্কা-ভারীর ব্যাপার আছে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যখন বেড়ে যায় বাতাস হয় ভারী। সেটা আমি বুঝতে পারি মাথার চুলে হাত দিয়ে। জলীয় বাষ্পের পরিমাণের উপর নির্ভর করে মাথার চুল নরম বা শক্ত হয়। শীতকালে মাথার চুলে হাত দিয়ে দেখবেন এক রকম আবার গরমকালে যখন বাতাসে হিউমিডিটি অনেক বেশি তখন অন্যরকম।'

'আমার কাছে তো সব সময় এক রকম লাগে।'

মিসির আলি ঘর ফাটিয়ে হাসতে লাগলেন। ভাবটা এ রকম যেন এরচে' মজার কথা আগে শুনেন নি। আমি বোকার মতো বসে রইলাম। অস্বস্তিও লাগতে লাগল। খুব বুদ্ধিমান মানুষের সঙ্গে গল্প করার মধ্যেও এক ধরনের অস্বস্তি থাকে। নিজেকে খুব তুচ্ছ মনে হয়।

মিসির আলি স্টোভে চায়ের পানি বসিয়ে দিলেন। শোঁ শোঁ শব্দ হতে লাগল। এই যুগে স্টোভ প্রায় চোখেই পড়ে না। মিসির আলি এই বস্তু কোত্থেকে জোগাড় করেছেন কে জানে। কিছুক্ষণ পর পর পাম্প করতে হয়। অনেক যন্ত্রণা।

চায়ের কাপ হাতে বিছানায় এসে বসামাত্র বৃষ্টি শুরু হলো। তুমুল বর্ষণ। মিসির আলি বললেন, 'আমার বেহেশতে যেতে ইচ্ছা করে না কেন জানেন?'

'জানি না।'

'বেহেশতে যেতে ইচ্ছ করে না কারণ সেখানে ঝড়-বৃষ্টি নেই। এয়ার কুলার বসানো একটা ঘরের মতো সেখানকার আবহাওয়া। তাপ বাড়বেও না, কমবেও না। অনন্তকাল একই থাকবে। কোনো মানে হয়?'

'আপনি কি বেহেশত-দোজখ এইসব নিয়ে মাথা ঘামান?'

'না ঘামাই না।'

'সৃষ্টিকর্তা নিয়ে মাথা ঘামান?'

'হ্যাঁ ঘামাই। খুব চিন্তা করি, কোনো কূল-কিনারা পাই না। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম গ্রন্থ কি বলে জানেন? বলে– সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর পারেন না এমন কিছুই নেই। তিনি সব পারেন। অথচ আমার ধারণা তিনি দু'টা জিনিস পারেন না যা মানুষ পারে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'উদাহরণ দিন।'

'সৃষ্টিকর্তা নিজেকে ধ্বংস করতে পারেন না। মানুষ পারে। আবার সৃষ্টিকর্তা দ্বিতীয় একজন সৃষ্টিকর্তা তৈরি করতে পারেন না। মানুষ কিন্তু পারে, সে সন্তানের জন্ম দেয়।'

'আপনি তাহলে একজন নাস্তিক?'

'না আমি নাস্তিক না। আমি খুবই আস্তিক। আমি এমন সব রহস্যময় ঘটনা আমার চারপাশে ঘটতে দেখেছি যে বাধ্য হয়ে আমাকে আস্তিক হতে হয়েছে। ব্যাখ্যাতীত সব ঘটনা। যেমন স্বপ্নের কথাটাই ধরুন। সামান্য স্বপ্ন অথচ ব্যাখ্যাতীত একটা ঘটনা।'

'ব্যাখ্যাতীত হবে কেন? ফ্রয়েড তো চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন বলে শুনেছি!'

'মোটেই চমৎকার ব্যাখ্যা করেন নি। স্বপ্নের পুরো ব্যাপারটাই তিনি অবদমিত কামনার উপর চাপিয়ে দিয়ে লিখলেন– Interpretations of dream; তিনি শুধু বিশেষ এক ধরনের স্বপ্নই ব্যাখ্যা করলেন। অন্য দিক সম্পর্কে চুপ করে রইলেন। যদিও তিনি খুব ভালো করে জানতেন মানুষের বেশ কিছু স্বপ্ন আছে যা ব্যাখ্যা করা যায় না। তিনি এই নিয়ে প্রচুর কাজও করেছেন কিন্তু প্রকাশ করেন নি। নষ্ট করে ফেলেছেন। তাঁর ছাত্র প্রফেসর জাং কিছু কাজ করেছেন– মূল সমস্যায় পৌঁছতে পারেন নি, বলতে বাধ্য হয়েছেন যে কিছু কিছু স্বপ্ন মানুষ কেন দেখে তা বলা যাচ্ছে না। যেমন একটা লোক স্বপ্ন দেখল হঠাৎ মাথার উপর সিলিং ফ্যানটা খুলে পড়ে গেল। স্বপ্ন দেখার দু'দিন পর দেখা গেল সত্যি সত্যি সিলিং ফ্যান খুলে পড়ে গেছে। এই ধরনের স্বপ্নকে বলে প্রিকগনিশন ড্রিম (Precognition dream)-এর একটিই ব্যাখ্যা স্বপ্নে মানুষ ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে। যা সম্ভব নয়। কাজেই এ জাতীয় স্বপ্ন ব্যাখ্যাতীত।'

আমি বললাম, এমনও তো হতে পারে যে কাকতালীয়ভাবে মিলে গেছে।

'হতে পারে। প্রচুর কাকতালীয় ব্যাপার পৃথিবীতে ঘটছে। তবে কাকতালীয় ব্যাপারগুলিকেও একটা স্প্যাটিসটিক্যাল প্রবাবিলিটির ভেতর থাকতে হবে। Precognition dream-এর ক্ষেত্রে তা থাকে না।'

'বুঝতে পারছি না।'

'বোঝানো একটু কঠিন, আমি বরং স্বপ্ন সম্পর্কে একটা গল্প বলি– শুনতে চান?'

'বলুন শুনি– ভৌতিক কিছু?'

'না– ভৌতিক না– তবে রহস্যময় তো বটেই। আরেক দফা চা হয়ে যাক।'

'হোক।'

'কি ঠিক করলেন? থেকে যাবেন? বৃষ্টি কিন্তু বাড়ছে!'

আমি থেকে যাওয়াই ঠিক করলাম। মিসির আলি চা নিয়ে বিছানায় পা তুলে বসলেন। গল্প শুরু হলো।

'ছোটবেলায় আমাদের বাসায় "খাবনামা" নামে একটা স্বপ্ন তথ্যের বই ছিল। কোন স্বপ্ন দেখলে কি হয় সব ঐ বইয়ে লেখা। আমার মা ছিলেন বইটার বিশেষ ভক্ত। ঘুম থেকে উঠেই বলতেন, ও মিসির বইটা একটু দেখ তো। একটা স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নের মানে কি বল।'

'আমি বই নিয়ে বসতাম।'

'দেখ তো বাবা গরু স্বপ্ন দেখলে কি হয়।'

আমি বই উল্টে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি রঙের গরু মা? সাদা না কালো?'

'এই তো মুশকিলে ফেললি, সাদা না কালো খেয়াল নেই।'

'সাদা রঙের গরু হলে– ধনলাভ। কালো রঙের গরু হলে– বিবাদ।'

'কার সঙ্গে বিবাদ? তোর বাবার সাথে?'

'লেখা নাই তো মা।'

মা চিন্তিত হয়ে পড়তেন। স্বপ্ন নিয়ে চিন্তার তাঁর কোনো শেষ ছিল না। আর কত বিচিত্র স্বপ্ন যে দেখতেন– একবার দেখলেন দুটা অন্ধ চড়ুই পাখি। খাবনামায় অন্ধ চড়ুই পাখি দেখলে কি হয় লেখা নেই। কবুতর দেখলে কি হয় লেখা আছে। মা'র কারণেই খাবনামা ঘাঁটতে ঘাঁটতে একসময় পুরো বইটা আমার মুখস্থ হয়ে গেল। স্বপ্ন-বিশারদ হিসেবে আমার নাম রটে গেল। যে যা দেখে আমাকে এসে অর্থ জিজ্ঞেস করে। এই করতে গিয়ে জানলাম কত বিচিত্র স্বপ্নই না মানুষ দেখে। সেই সঙ্গে মজার মজার কিছু জিনিসও লক্ষ করলাম। যেমন অসুস্থ মানুষরা সাধারণত বিকট সব দুঃস্বপ্ন দেখে। বোকা মানুষদের স্বপ্নগুলি হয় সরল ধরনের। বুদ্ধিমান মানুষরা খুব জটিল স্বপ্ন দেখে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা একটা স্বপ্ন প্রায়ই দেখে, সেটা হচ্ছে কোনো একটি অনুষ্ঠানে সে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে উপস্থিত হয়েছে। সবার গায়ে ভালো পোশাক-আশাক, শুধু সেই পুরোপুরি নগ্ন। কেউ তা লক্ষ করছে না।'

মিসির আলি সাহেব কথা বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই জাতীয় স্বপ্ন কি আপনি কখনো দেখেছেন?'

আমি বললাম, 'না। একটা স্বপ্নই আমি বারবার দেখি, পরীক্ষা হলে পরীক্ষা দিতে বসেছি। খুব সহজ প্রশ্ন, সবগুলির উত্তর আমার জানা। লিখতে গিয়ে দেখি কলম দিয়ে কালি বেরুচ্ছে না। কলমটা বদলে অন্য কলম নিলাম, সেটা দিয়েও কালি বেরুচ্ছে না। এদিকে ঘণ্টা পড়ে গেছে।'

'এই স্বপ্নটাও খুব কমন। আমিও দেখি। একবার দেখলাম বাংলা পরীক্ষা– প্রশ্ন দিয়েছে অংকের। কঠিন সব অংক। বাঁদরের তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে ওঠার অংক। একটা বাঁদরের জায়গায় দু'টা বাঁদর। একটা খানিকটা উঠে অন্যটা তার লেজ ধরে টেনে নিচে নামায়– খুবই জটিল ব্যাপার। বাঁশের সবটা আবার তৈলাক্ত না কিছুটা তেল ছাড়া...'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'সত্যিই কি এমন স্বপ্ন দেখেছেন?'

'জি না, ঠাট্টা করে বলছি– জটিল সব অংক ছিল এইটুকু মনে আছে। যাই হোক ছোটবেলা থেকেই এইসব কারণে স্বপ্নের দিকে আমি ঝুঁকলাম। দেশের বাইরে যখন প্যারাসাইকোলজি পড়তে গেলাম তখন স্পেশাল টপিক নিলাম 'ড্রিম'। ড্রিম ল্যাবরেটরিতে কাজও করলাম। আমার প্রফেসর ছিলেন ড. সুইন হার্ন। দুঃস্বপ্নের ব্যাপারে যাঁকে পৃথিবীর সেরা বিশেষজ্ঞ বলা যেতে পারে। দুঃস্বপ্ন এ্যানালিসিসের তিনি একটা টেকনিক বের করেছেন, যার নাম সুইন হার্ন এ্যানালিসিস। সুইন হার্ন এ্যানালিসিসে ব্যাখ্যা করা যায় না এমন সব দুঃস্বপ্নের একটা ফাইল তাঁর কাছে ছিল। সেই ফাইল তিনি তাঁর গ্রাজুয়েট ছাত্রদের দিতেন না। আমাকে তিনি খুবই পছন্দ করতেন

সম্ভবত সে কারণেই সেই ফাইল ঘাঁটার সুযোগ হয়ে গেল। ফাইল পড়ে আমি হতভম্ব। ব্যাখ্যাতীত সব ব্যাপার। একটা উদাহরণ দেই– নিউ ইংল্যান্ডের একটি তেইশ বছর বয়েসি মেয়ে দুঃস্বপ্ন দেখা শুরু করল। তার নাভীমূল থেকে একটা হাত বের হয়ে আসছে। স্বাভাবিক হাতের চেয়ে সরু– লম্বা লম্বা আঙুল। হাতটার রঙ নীলচে– খুব তুলতুলে। দুঃস্বপ্নটা সে প্রায়ই দেখতে লাগল। প্রতিবারই স্বপ্ন ভাঙত বিকট চিৎকারে। তাকে ড্রিম ল্যাবরেটরিতে ভর্তি করা হলো। প্রফেসর সুইন হার্ন রুগিনীর মনোবিশ্লেষণ করলেন। অস্বাভাবিক কিছুই পেলেন না। মেয়েটিকে পাঠিয়ে দেয়া হলো নিউ ইংল্যান্ডে। তার কিছুদিন পর মেয়েটি লক্ষ করল তার নাভীমূল ফুলে উঠেছে– এক ধরনের নন ম্যালিগন্যান্ট গ্রোথ হচ্ছে। এক মাসের মধ্যে সেই টিউমার মানুষের হাতের আকৃতি ধারণ করল। টিউমারটির মাথায় মানুষের হাতের আঙুলের মতো পাঁচটি আঙুল...'

আমি মিসির আলিকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'ভাই এই গল্পটা থাক। শুনতে ভালো লাগছে না। ঘেন্না লাগছে।'

'ঘেন্না লাগার মতোই ব্যাপার। ছবি দেখলে আরো ঘেন্না লাগবে। মেয়েটির ছবি ছাপা হয়েছে নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিনে। ছবি দেখতে চান?'

'জি না।'

'পি.এইচ.ডি. প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম পি.এইচ.ডি. না করেই ফিরতে হলো। প্রফেসরের সঙ্গে ঝামেলা হলো। যে লোক আমাকে এত পছন্দ করত সেই বিষ-নজরে দেখতে লাগল। এম. এস. ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্ট টাইম টিচিং-এর একটা ব্যবস্থা হলো। ছাত্রদের এবনরমাল বিহেভিয়ার পড়াই। স্বপ্ন সম্পর্কেও বলি। স্বপ্নের সঙ্গে মানুষের অস্বাভাবিক আচরণের একটা সম্পর্ক বের করার চেষ্টা করি। ছাত্রদের বলি, তোমরা যদি কখনো কোনো ভয়ংকর স্বপ্ন দেখো তাহলে আমাকে বলবে।

ছাত্ররা প্রায়ই এসে স্বপ্ন বলে যায়। ওদের কোনো স্বপ্নই তেমন ভয়ংকর না। সাপে তাড়া করছে, আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে এই জাতীয় স্বপ্ন। আমার ইচ্ছা ছিল দুঃস্বপ্ন নিয়ে গবেষণার কিছু কাজ করব। সেই ইচ্ছা সফল হলো না। দুঃস্বপ্ন দেখছে এমন লোকজনই পাওয়া গেল না। আমি গবেষণার কথা যখন ভুলে গেলাম তখন এলো লোকমান ফকির।

লোকমান ফকিরের বাড়ি কুমিল্লার নবীনগরে। বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। শিপিং করপোরেশনে মোটামুটি ধরনের চাকরি করে। দু'কামরার একটা বাড়ি ভাড়া করেছে কাঁঠাল বাগানে। বিয়ে করেনি তবে বিয়ের চিন্তা-ভাবনা করছে। তার এক মামাতো বোনের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে। মেয়েটিকে তার পছন্দ নয়। তবে অপছন্দের কথা সে সরাসরি বলতেও পারছে না। কারণ তার এই মামা তাকে পড়াশোনা করিয়েছেন।

ছেলেটি এক সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। আমি তাকে দেখে চমকে উঠলাম। মুখ পাণ্ডুর বর্ণ, মৃত মানুষের চোখের মতো ভাবলেশহীন চোখ। যৌবনের নিজস্ব যে জ্যোতি যুবক-যুবতীর চোখে থাকে তার কিছুই নেই। ছেলেটি হাঁটছে খুঁড়িয়ে

খুঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পরপরই চমকে উঠছে। সে ঘরে ঢুকেই বিনা ভূমিকায় বলল, 'স্যার আপনি আমাকে বাঁচান।'

আমি ছেলেটিকে বসালাম। পরিচয় নিলাম। হাল্কা কিছু কথাবার্তা বলে তাকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলাম। তাতে খুব লাভ হলো বলে মনে হলো না। তার অস্থিরতা কমল না। লক্ষ করলাম সে স্থির হয়ে বসতেও পারছে না। খুব নড়াচড়া করছে। আমি বললাম, 'তোমার সমস্যাটা কি?'

ছেলেটি রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে প্রায় অস্পষ্ট গলায় বলল, 'স্যার আমি দুঃস্বপ্ন দেখি। ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন।'

আমি বললাম, 'দুঃস্বপ্ন দেখে না এমন মানুষ তুমি খুঁজে পাবে না। সাপে তাড়া করছে, বাঘে তাড়া করছে, আকাশ থেকে নিচে পড়ে যাওয়া– এগুলি খুবই কমন স্বপ্ন, সাধারণত হজমের অসুবিধা হলে লোকজন দুঃস্বপ্ন দেখে। ঘুমের অসুবিধা হলেও দেখে। তুমি শুয়ে আছ মাথার নিচ থেকে বালিশ সরে গেল তখনো এরকম স্বপ্ন তুমি দেখতে পারো। শারীরিক অস্বস্তির একটা প্রকাশ ঘটে দুঃস্বপ্নে। আগুনে পুড়ার স্বপ্ন মানুষ কখন দেখে জানো? যখন পেটে গ্যাস হয় সেই গ্যাসে বুক জ্বালাপোড়া করে, তখন সে স্বপ্ন দেখে তাকে জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দেয়া হয়েছে।'

'স্যার আমার স্বপ্ন এ রকম না। অন্যরকম।'

'ঠিক আছে, গুছিয়ে বলো। শুনে দেখি কি রকম।'

ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে কথা শুরু করল। মুখস্থ বলে যাবার মতো বলে যেতে লাগল। মনে হয় আগে থেকে ঠিকঠাক করে এসেছে এবং অনেকবার রিহার্সেল দিয়েছে।

কথা বলার সময় একবারও আমার চোখের দিকে তাকাল না। যখন প্রশ্ন করলাম তখনো না।

'প্রথম স্বপ্নটা দেখি বুধবার রাতে। এগারোটার দিকে ঘুমুতে গেছি। আমার ঘুমের কোনো সমস্যা নেই। শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়তে পারি। সে রাতেও তাই হলো। বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়েছি। সঙ্গে সঙ্গেই স্বপ্নটা দেখেছি।'

'কি করে বুঝলে শোয়ামাত্র স্বপ্ন দেখেছ?'

'জেগে উঠে ঘড়ি দেখেছি, এগারোটা দশ।'

'স্বপ্নটা বলো!'

'আমি দেখলাম খোলামেলা একটা মাঠের মতো জায়গা। খুব বাতাস বইছে। শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে। রীতিমত শীত লাগছে। আমার চারদিকে অনেক মানুষ কিন্তু ওদের কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। এদের কথা শুনতে পাচ্ছি। হাসির শব্দ শুনছি। একটা বাচ্চা ছেলে কাঁদছে তাও শুনছি। বুড়ামত একটা লোকের কাশির শব্দ শোনা যাচ্ছে কিন্তু কাউকে আবছাভাবেও দেখতে পাচ্ছি না। একবার মনে হলো আমি বোধ হয় অন্ধ হয়ে গেছি। চারদিকে খুব তীক্ষ্ণ চোখে তাকালাম– মাঠ দেখতে পাচ্ছি, কুয়াশা দেখতে পাচ্ছি– কিন্তু মানুষজন দেখছি না অথচ তাদের কথা শুনছি। হঠাৎ ওদের কথাবার্তা সব থেমে

গেল। বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দও বন্ধ হয়ে গেল। মনে হলো কেউ যেন এসেছে। তার ভয়ে সবাই চুপ করে গেছে। আমার নিজেরো প্রচণ্ড ভয় লাগল। এক ধরনের অন্ধ ভয়।

তখন শ্লেষ্মা জড়িত মোটা গলায় কে একজন বলল, 'ছেলেটি তো দেখি এসেছে। মেয়েটা কোথায়?'

কেউ জবাব দিল না। খানিকক্ষণের জন্যে বাচ্চা ছেলেটির কান্না শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে থেমেও গেল। মনে হলো কেউ যেন তার মুখে হাত চাপা দিয়ে কান্না বন্ধ করার চেষ্টা করছে। ভারী গলার লোকটা আবার কথা বলল, মেয়েটা দেরি করছে কেন? কেন এত দেরি? ছেলেটিকে তো বেশিক্ষণ রাখা যাবে না। এর ঘুম পাতলা হয়ে এসেছে। ও জেগে যাবে।

হঠাৎ চারদিকে সাড়া পড়ে গেল। একসঙ্গে সবাই বলে উঠল এসেছে, এসেছে, মেয়েটা এসেছে। আমি চমকে উঠে দেখলাম আমার পাশে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খুব রোগা একটা মেয়ে। অসম্ভব ফর্সা, বয়স আঠারো-উনিশ। এলোমেলোভাবে শাড়ি পরা। লম্বা চুল। চুলগুলি ছেড়ে দেয়া, বাতাসে উড়ছে। মেয়েটা ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। আমি অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছি। সে অসংকোচে আমার হাত ধরে কাঁপা গলায় বলল, আমার ভয় করছে। আমার ভয় করছে।

আমি বললাম, 'আপনি কে?'

সে বলল, 'আমার নাম নারগিস। আপনি যা দেখছেন তা স্বপ্ন। ভয়ংকর স্বপ্ন। একটু পরই বুঝবেন। আগে এই স্বপ্নটা শুধু আমি একা দেখতাম। এখন মনে হয় আপনিও দেখবেন।'

মেয়েটা কাঁদতে শুরু করল। আতংকে অস্থির হয়ে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, 'আপনি কিছু মনে করবেন না, আমার ভয় লাগছে বলেই আমি এভাবে দাঁড়িয়ে আছি। এরা প্রতি মাসে একবার করে আমাকে এই স্বপ্নটা দেখায়।'

আমি বললাম, 'এরা কারা?'

'জানি না। কিচ্ছু জানি না। আপনি থাকায় কেন জানি একটু ভরসা পাচ্ছি। যদিও জানি আপনি কিছুই করতে পারবেন না। কিছুই না, কিছুই না, কিছুই না...

মেয়েটি হাঁপাতে শুরু করল আর তখন সেই ভারী এবং শ্লেষ্মা জড়ানো কণ্ঠ চিৎকার করে বলল, 'সময় শেষ। দৌড়াও দৌড়াও, দৌড়াও...।'

সেই চিৎকারের মধ্যে ভয়ংকর পৈশাচিক কিছু ছিল। আমার শরীরের প্রতিটি স্নায়ু থরথর করে কাঁপতে লাগল। চোখের সামনে কুয়াশা কেটে যেতে লাগল– চারদিকে তীব্র আলো। এত তীব্র যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়– যাদের কথা শুনছিলাম অথচ দেখতে পাচ্ছিলাম না এই আলোয় সবাইকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম– এরা এরা এরা...

এরা কি?

এরা মানুষ না, অন্য কিছু– লম্বাটে পশুর মতো মুখ, হাত-পা মানুষের মতো। সবাই নগ্ন। এরা অদ্ভুত এক ধরনের শব্দ করতে লাগল। আমার কানে বাজতে লাগল– দৌড়াও

দৌড়াও.... আমরা দৌড়াতে শুরু করলাম। আমাদের পেছনে সেই জন্তুর মতো মানুষগুলিও দৌড়াচ্ছে।

আমরা ছুটছি মাঠের উপর দিয়ে। সেই মাঠে কোনো ঘাস নেই। সমস্ত মাঠময় অযুত নিযুত লক্ষ কোটি ধারালো ব্লেড সারি সারি সাজানো। সেই ব্লেডে আমার পা কেটে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে– তীব্র-তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা। চিৎকার করে উঠলাম, আর তখনি ঘুম ভেঙে গেল। দেখি ঘামে সমস্ত বিছানা ভিজে গেছে।

'এই তোমার স্বপ্ন?'

'জি।'

'দ্বিতীয় স্বপ্ন কখন দেখলে?'

'ঠিক এক মাস পর।'

'সেই মেয়েটিও কি দ্বিতীয় স্বপ্নে তোমার সঙ্গে ছিল?'

'জি।'

'একই স্বপ্ন? না একটু অন্য রকম?'

'একই স্বপ্ন।'

'দ্বিতীয় বারও কি তুমি মেয়েটির হাত ধরে দৌড়ালে?'

'জি।'

'প্রথম বার যেমন তার সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল? দ্বিতীয় বারও হলো?'

'জি।'

'দ্বিতীয় বারও কি মেয়েটি পরে এসেছে? তুমি আগে এসে অপেক্ষা করছিলে?'

'জি না, দ্বিতীয় বারে মেয়েটি আগে এসেছিল। আমি পরে এসেছি।'

'দ্বিতীয় বারের স্বপ্ন তুমি রাত ক'টায় দেখেছ?'

'ঠিক বলতে পারব না তবে শেষ রাতের দিকে। ঘুম ভাঙার কিছুক্ষণের মধ্যেই ফজরের আজান হলো।'

'দ্বিতীয় বারও স্বপ্নে মোটা গলার লোকটি কথা বলল?'

'জি।'

লোকমান ফকির রুমালে কপালের ঘাম মুছতে লাগল। সে অসম্ভব গামছে। আমি বললাম, 'পানি খাবে? পানি এনে দেব?'

'জি স্যার, দিন।'

আমি পানি এনে দিলাম। সে এক নিশ্বাসে পানি শেষ করে ফেলল। আমি বললাম 'স্বপ্ন ভাঙার পর তুমি দেখলে তোমার দু'টি পা-ই ব্লেডে কেটে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে– তাই না?

লোকমান হতভম্ব হয়ে বলল, 'জি স্যার। আপনি কি করে বুঝলেন?'

'তুমি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘরে ঢুকলে সেখান থেকে অনুমান করেছি। তাছাড়া তোমার পা স্বপ্ন দেখার পর কেটে যাচ্ছে বলেই স্বপ্নটা ভয়ংকর। পা যদি না কাটত তাহলে স্বপ্নটা ভয়ংকর হতো না বরং একটা মধুর স্বপ্ন হতো। কারণ স্বপ্নে একটি মেয়ের সঙ্গে তোমার

দেখা হচ্ছে যে তোমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। আঠারো-উনিশ বছরের রূপবতী একটি মেয়ে, হাত ধরে তোমার সঙ্গে দৌড়াচ্ছে।'

আমার কথার মাঝখানেই লোকমান ফকির পায়ের জুতা খুলে ফেলল, মোজা খুলল। আমি হতভম্ব হয়ে দেখলাম পায়ের তলা ফালা ফালা করে কাটা। এমন কিছু সত্যি সত্যি ঘটতে পারে আমি ভাবি নি।

লোকমান ক্ষীণ গলায় বলল, 'এটা কি করে হয় স্যার?'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে স্বপ্নের ব্যাপারে পড়াশোনা যা করেছি তার থেকে তোমাকে একটা কথা বলতে পারি– Invert reaction বলে একটা ব্যাপার আছে। ধরো তোমার একটা আঙুল পুড়ে গেল– সেই খবর স্নায়ুর মাধ্যমে যখন তোমার মস্তিষ্কে পৌঁছবে তখন তুমি তীব্র ব্যথা পাবে। Invert reaction-এ কি হয় জানো? আগে মস্তিষ্কে আঙুল পোড়ার অনুভূতি পায় তারপর সেই খবর আঙুলে পৌঁছে। তখন আঙুলটি পোড়া পোড়া হয়ে যেতে পারে। স্বপ্নের পুরো ব্যাপারটা হয় মস্তিষ্কে। যেখান থেকে Invert reaction-এ শরীরে তার প্রভাব পড়তে পারে।'

এক লোক স্বপ্নে দেখত তার হাতে কে যেন পিন ফুটাচ্ছে। ঘুম ভাঙার পর তার হাতে সত্যি সত্যি পিন ফোটার দাগ দেখা যেত। তোমার ক্ষেত্রেও হয়তো তাই ঘটেছে। তবে এমন ভয়াবহভাবে পা কাটা Invert reaction-এ সম্ভব বলে আমার মনে হয় না।'

'তাহলে কি?'

'আমি বুঝতে পারছি না।'

লোকমান ক্লান্ত স্বরে বলল, 'এক মাস পর পর আমি স্বপ্নটা দেখি। কারণ পায়ের ঘা শুকাতে এক মাস লাগে!'

আমি লোকমান ফকিরের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললাম, 'তুমি এখন থেকে একটা কাজ করবে– ঘুমুতে যাবে জুতা পায়ে দিয়ে। স্বপ্নে যদি তোমাকে দৌড়াতেও হয়– তোমার পায়ে থাকবে জুতা। ব্লেড তোমাকে কিছু করতে পারবে না।'

'সত্যি বলছেন?'

'আমার তাই ধারণা। আমার মনে হচ্ছে জুতা পরে ঘুমুলে তুমি স্বপ্নটাই আর দেখবে না।'

লোকমান ফকির চলে গেল। খুব ভরসা পেল বলে মনে হলো না। আমি তাকে বলে দিয়েছিলাম এক মাস পর স্বপ্ন দেখা হয়ে গেলে সে যেন আসে। সে এলো দেড় মাস পর।

তার মুখ আগের চেয়েও শুকনো, চোখ ভাবলেশ হীন। অথর্ব মানুষের মতো হাঁটছে। আমি বললাম, 'স্বপ্ন দেখেছ?'

'জি না।'

'জুতা পায়ে ঘুমুচ্ছ?'

'জি স্যার। জুতা পায়ে দেয়ার জন্যই স্বপ্ন দেখছি না।'

আমি হাসিমুখে বললাম। 'তাহলে তো তোমার রোগ সেরে গেল। এত মন খারাপ কেন? মনে হচ্ছে বিরাট সমস্যায় পড়েছ। সমস্যাটা কি?'

লোকমান নিচু গলায় বলল, 'মেয়েটার জন্য মন খারাপ স্যার। বেচারি একা একা স্বপ্ন দেখছে। এত ভালো একটা মেয়ের জন্যে খুব কষ্ট হয়।'

লোকমানের চোখে প্রায় পানি এসে গেল। আমি বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলাম। সে বলে কি?

'স্যার আমি ঠিক করেছি জুতা পরব না। যা হবার হবে। নারগিসকে একা একা যেতে দেব না। আমি থাকব সঙ্গে। মেয়েটার জন্যে আমার খুব কষ্ট হয় স্যার। এত চমৎকার একটা মেয়ে। আমি স্যার থাকব তার সঙ্গে।

'সেটা কি ভালো হবে?'

'জি স্যার হবে। আমি তাকে ছাড়া বাঁচব না।'

'সে কিন্তু স্বপ্নের একটি মেয়ে।'

'সে স্বপ্নের মেয়ে নয়। আমি যেমন, সেও তেমন। আমরা দু'জন এই পৃথিবীতেই বাস করি। সে হয়তো ঢাকাতেই কোনো এক বাসায় থাকে। তার পায়ে ব্লেডের কাটা। আমি যেমন সারাক্ষণ তার কথা ভাবি সেও নিশ্চয়ই ভাবে। শুধু আমাদের দেখা হয় স্বপ্নে।'

মিসির আলি সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'গল্পটি এই পর্যন্তই।'

আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'এই পর্যন্ত মানে? শেষটা কি?'

'শেষটা আমি জানি না। ছেলেটি ক্ষত-বিক্ষত পা নিয়ে একবার এসেছিল। সে বলল, জুতা খুলে ঘুমানো মাত্রই সে আবার স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নে মেয়েটির দেখা পায়। তারা দু'জন খানিকক্ষণ গল্প করে। দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে। এক সময়– মানুষের মতো জন্তুগুলি চেঁচিয়ে বলে– দৌড়াও, দৌড়াও। তারা দৌড়াতে শুরু করে।'

'ছেলেটি আপনার কাছে আর আসে নি?'

'জি না!'

'ছেলেটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আপনি কি কিছু জানেন?'

'না জানি না। তবে অনুমান করতে পারি। ছেলেটি জানে জুতা পায়ে ঘুমুলে এই দুঃস্বপ্ন সে দেখবে না, তারপরেও জুতা পায়ে দেয় না। কারণ মেয়েটিকে একা ছেড়ে দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রেমের ক্ষমতা যে কি প্রচণ্ড হতে পারে প্রেমে না পড়লে তা বুঝা যায় না। ছেলেটির পক্ষে এই জীবনে তার স্বপ্ন সঙ্গিনীর মায়া কাটানো সম্ভব না। সে বাকি জীবনে কখনো জুতা পায়ে ঘুমুবে না। সে আসলে দুঃস্বপ্নের হাত থেকে মুক্তি চায় না। দুঃস্বপ্ন হলেও এটি সেই সঙ্গে তার জীবনের মধুরতম স্বপ্ন।'

'আপনার কি ধারণা নারগিস নামের কোনো মেয়ে এই পৃথিবীতে সত্যি সত্যি আছে?'

মিসির আলি নিচু গলায় বললেন, 'আমি জানি না। রহস্যময় এই পৃথিবীর খুব কম রহস্যের সন্ধানই আমি জানি। তবে মাঝে মাঝে আমারও কেন জানি এই মেয়েটির হাত ধরে একবার দৌড়াতে ইচ্ছা করে। আরেক দফা চা হবে? পানি কি গরম করব?'

ছায়াসঙ্গী

প্রতি বছর শীতের সময় ভাবি কিছুদিন গ্রামে কাটিয়ে আসব। দলবল নিয়ে যাব– হৈচৈ করা যাবে। আমার বাচ্চারা কখনো গ্রাম দেখে নি-তারা ভারি খুশি হবে। পুকুরে ঝাঁপাঝাঁপি করতে পারবে। শাপলা ফুল শুধু যে মতিঝিলের সামনেই ফুটে না, অন্যান্য জায়গাতেও ফুটে, তাও স্বচক্ষে দেখবে।

আমার বেশির ভাগ পরিকল্পনাই শেষ পর্যন্ত কাজে লাগাতে পারি না। এটা কেমন করে জানি লেগে গেল। একদিন সত্যি সত্যি রওনা হলাম।

আমাদের গ্রামটাকে অজপাড়াগাঁ বললেও সম্মান দেখানো হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার এমন সুন্দর সময়েও সেখানে পৌঁছতে হয় গরুর গাড়িতে। বর্ষার সময় নৌকা, তবে মাঝখানে একটা হাওড় পড়ে বল সেই যাত্রা অগস্ত্যযাত্রার মতো।

অনেকদিন পর গ্রামে গিয়ে ভালো লাগল। দেখলাম, আমার বাচ্চাদের আনন্দ বর্ধনের সব ব্যবস্থাই নেয়া হয়েছে। কোত্থেকে যেন একটা হাড়-জিরজিরে বেতো ঘোড়া জোগাড় করা হয়েছে। এ ঘোড়া নড়াচড়া করে না, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। খুব বেশি বিরক্ত হলে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মত একটা শব্দ করে এবং লেজটা নাড়ে। বাচ্চারা এত বড় একটা জীবন্ত খেলনা পেয়ে মহাখুশি, দু'তিনজন একসঙ্গে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে থাকে।

তাদের অসংখ্য বন্ধু-বান্ধবও জুটে গেল। যেখানেই যায় তাদের সঙ্গে গোটা পঞ্চাশেক ছেলেপুলে থাকে। আমার বাচ্চারা যা করে তাতেই তারা চমৎকৃত হয়। আমার বাচ্চারা তাদের বিপুল জনপ্রিয়তায় অভিভূত। তারা যাবতীয় প্রতিভা দেখাতে শুরু করল– কেউ কবিতা বলছে, কেউ গান, কেউ ছড়া।

আমি একগাদা বই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার পরিকল্পনা–পুরোপুরি বিশ্রাম নেয়া। শুয়ে-বসে বই পড়া, খুব বেশি ইচ্ছা করলে খাতা-কলম নিয়ে বসা। একটা উপন্যাস অর্ধেকের মতো লিখেছিলাম, বাকিটা কিছুতেই লিখতে ইচ্ছা করছিল না। পাণ্ডুলিপি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। নতুন পরিবেশে যদি লিখতে ইচ্ছা করে।

প্রথম কিছুদিন বই বা লেখা কোনটাই নিয়ে বসা গেল না। সারাক্ষণই লোকজন আসছে। তারা অত্যন্ত গম্ভীর গলায় নানান জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনায় উৎসাহী। এসেই বলবে– দেশের অবস্থাডা কি কন দেহি ছোড মিয়া। বড়ই চিন্তাযুক্ত আছি। দেশের হইলডা কি? কি দেশ ছিল আর কি হইল!

দিন চার-পাঁচেকের পর সবাই বুঝে গেল দেশ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। গল্পগুজবও তেমন করতে পারি না। তারা আমাকে রেহাই দিল। আমি হাঁফ ছেড়ে

বাঁচলাম। গ্রামের নতুন পরিবেশের কারণেই হোক বা অন্য কারণেই হোক, আমি লেখালেখি কাটাকুটি করি। সন্ধ্যায় স্ত্রীকে সঙ্গে করে বেড়াতে বের হই। চমৎকার লাগে। প্রায় রাতেই একজন দু'জন করে 'গাতক' আসে। এরা জ্যোৎস্নাভেজা উঠোনে বসে চমৎকার গান ধরে–

"ও মনা

এই কথাটা না জানলে প্রাণে বাঁচতাম না।

না না না-আমি প্রাণে বাঁচতাম না।"

সময়টা বড় চমৎকার কাটতে লাগল। লেখার ব্যাপারে আগ্রহ বাড়তেই লাগল। সারাদিনই লিখি।

এক দুপুরের কথা– একমনে লিখছি। জানালার ওপাশে খুট করে শব্দ হলো। তাকিয়ে দেখি, খালি গায়ে রোগামত দশ-এগার বছরের একটা ছেলে গভীর আগ্রহে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওকে আগেও দেখেছি। জানালার ওপাশ থেকে গভীর কৌতূহলে সে আমাকে দেখে। চোখে পড়লেই পালিয়ে যায়। আজ পালাল না।

আমি বললাম– 'কি রে?'

সে মাথাটা চট করে নামিয়ে ফেলল।

আমি বললাম– 'চলে গেলি নাকি?'

ও আড়াল থেকে বলল– 'না।'

'নাম কি রে তোর?'

'মন্তাজ মিয়া।'

'আয়, ভেতরে আয়।'

'না।'

আর কোনো কথাবার্তা হলো না। আমি লেখায় ডুবে গেলাম। ঘুঘু-ডাকা শ্রান্ত দুপুরে লেখালেখির আনন্দই অন্য রকম। মন্তাজ মিয়ার কথা ভুলে গেলাম।

পরদিন আবার এই ব্যাপার। জানালার ওপাশে মন্তাজ মিয়া। বড় বড় কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে। আমি বললাম– কি ব্যাপার মন্তাজ মিয়া? আয় ভেতরে।

সে ভেতরে ঢুকল।

আমি বললাম, 'থাকিস কোথায়?'

উত্তরে পোকা-খাওয়া দাঁত বের করে হাসল।

'স্কুলে যাস না?'

আবার হাসি। আমি খাতা থেকে একটা সাদা কাগজ ছিঁড়ে তার হাতে দিলাম। সে তার এই বিরল সৌভাগ্যে অভিভূত হয়ে গেল। কি করবে বুঝতে পারছে না। কাগজটার গন্ধ শুঁকল। গালের উপর খানিকক্ষণ চেপে ধরে রেখে উল্কার বেগে বেরিয়ে গেল।

রাতে খেতে খেতে আমার ছোট চাচা বললেন– 'মন্তাজ হারামজাদা তোমার কাছে নাকি আসে? আসলে একটা চড় দিয়ে বিদায় করবে।'

'কেন?'

'বিরাট চোর। যাই দেখে তুলে নিয়ে যায়। ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দিবে না। দুই দিন পরপর মার খায়, তাতেও হুঁশ হয় না। তোমার এখানে এসে করে কি?'

'কিছু করে না?'

'চুরির সন্ধানে আছে। কে জানে এর মধ্যে হয়তো তোমার কলম-টলম নিয়েছে।'

'না, কিছু নেয় নি।'

'ভাল করে খুঁজে-টুজে দেখ। কিছুই বলা যায় না। ঐ ছেলের ঘটনা আছে।'

'কি ঘটনা?'

'আছে অনেক ঘটনা। বলব এক সময়।'

পরদিন সকালে যথারীতি লেখালেখি শুরু করেছি। হৈচৈ শুনে বের হয়ে এলাম। অবাক হয়ে দেখি, মন্তাজ মিয়াকে তিন-চার জন চ্যাংদোলা করে নিয়ে এসেছে। ছেলেটা ফুঁপাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে প্রচণ্ড মার খেয়েছে। ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়ছে। একদিকের গাল ফুলে আছে।

আমি বললাম, 'কি ব্যাপার?'

শাস্তিদাতাদের একজন বলল, 'দেখেন তো এই কলমটা আপনার কি-না? মন্তাজ হারামজাদার হাতে ছিল।'

দেখলাম কলমটা আমারই। চার-পাঁচ টাকা দামের বল পয়েন্ট। এমন কোনো মহার্ঘ বস্তু নয়। আমার কাছে চাইলেই দিয়ে দিতাম। চুরি করার প্রয়োজন ছিল না। মনটা একটু খারাপই হলো। বাচ্চা বয়সে ছেলেটা এমন চুরি শিখল কেন? বড় হয়ে এ করবে কি?

'ভাইসাব, কলমটা আপনার?'

'হ্যাঁ। তবে আমি এটা ওকে দিয়ে দিয়েছি। ছেড়ে দিন। বাচ্চা ছেলে, এত মারধর করেন কেন? মারধর করার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করে নেবেন না?'

শাস্তিদাতা নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, 'এই মাইরে ওর কিছু হয় না। এইডা এর কাছে পানিভাত। মাইর না খাইলে এর ভাত হজম হয় না।'

মন্তাজ মিয়া বিস্মিত চোখে আমাকে দেখছে। তাকে দেখেই মনে হলো সে তার ক্ষুদ্র জীবনে এই প্রথম একজনকে দেখছে যে চুরি করার পরও তাকে চোর বলে নি। মন্তাজ মিয়া নিঃশব্দে বাকি দিনটা জানালার ওপাশে বসে রইল। অন্যদিন তার সঙ্গে দু-একটা কথাবার্তা বলি, আজ একটা কথাও বলা হয় না। মেজাজ খারাপ হয়েছিল। এই বয়সে একটা ছেলে চুরি শিখবে কেন?

মন্তাজ মিয়ার যে একটা বিশেষ ঘটনা আছে তা জানলাম আমার ছোট চাচির কাছে। চুরির ঘটনারও দু'দিন পর। গ্রামের মানুষদের এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার। কোন্ ঘটনা যে গুরুত্বপূর্ণ কোন্‌টা তুচ্ছ তা এরা বুঝতে পারে না। মন্তাজ মিয়ার জীবনের এত বড় একটা ব্যাপার কেউ আমাকে এতদিন বলে নি অথচ তুচ্ছ সব বিষয় অনেকবার করে শোনা হয়ে গেছে।

মন্তাজ মিয়ার ঘটনাটা এই–

তিন বছর আগে কার্তিক মাসের মাঝামাঝি মন্তাজ মিয়া দুপুরে প্রবল জ্বর নিয়ে বাড়ি ফেরে। সেই জ্বরের প্রকোপ এতই বেশি যে শেষ পর্যন্ত মন্তাজ মিয়ার হতদরিদ্র বাবা একজন ডাক্তার ও নিয়ে এলেন। ডাক্তার আনার কিছুক্ষণের মধ্যেই মন্তাজ মিয়া মারা গেল। গ্রামে জন্ম এবং মৃত্যু দুটাই বেশ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা হয়। মন্তাজ মিয়ার মা কিছুক্ষণ চিৎকার করে কাঁদল। তার বাবাও খানিকক্ষণ 'আমার পুত কই গেল রে' বলে চেঁচিয়ে স্বাভাবিক হয়ে গেল। বেঁচে থাকার প্রবল সংগ্রামে তাদের লেগে থাকতে হয়, পুত্রশোকে কাতর হলে চলে না।

মরা মানুষ যত তাড়াতাড়ি কবর দিয়ে দেয়া হয় ততই নাকি ছোয়াব এবং কবর দিতে হয় দিনের আলো থাকতে থাকতে। কাজেই জুম্মা ঘরের পাশে বাদ আছর মন্তাজ মিয়ার কবর হয়ে গেল। সব কিছুই ঘটল খুব স্বাভাবিকভাবে।

অস্বাভাবিক ব্যাপারটা শুরু হলো দুপুর রাতের পর, যখন মন্তাজ মিয়ার বড় বোন রহিমা কলমাকান্দা থেকে উপস্থিত হলো। কলমাকান্দা এখান থেকে একুশ মাইল। এই দীর্ঘ পথ একটি গর্ভবতী মহিলা পায়ে হেঁটে চলে এলো এবং বাড়িতে পা দিয়েই চেঁচিয়ে বলল, তোমরা করছ কি? মন্তাজ বাঁইচ্যা আছে। কবর খুঁইড়া তারে বাইর করো। দিরং করবা না।

বলাই বাহুল্য, কেউ তাকে পাত্তা দিল না। শোকে-দুঃখে মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যায়। কবর দেয়ার পর নিকট আত্মীয়-স্বজনরা সব সময় বলে– "ও মরে নাই।" কিন্তু মন্তাজ মিয়ার বোন রহিমা এই ব্যাপারটা নিয়ে এতই হৈচৈ শুরু করল যে সবাই বাধ্য হলো মৌলানা সাহেবকে ডেকে আনতে।

রহিমা মৌলানা সাহেবের পায়ে গিয়ে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'মন্তাজ বাঁইচ্যা আছে– আপনে এরে বাঁচান। আপনে না বললে কবর খুঁড়ত না। আপনে রাজি না হওয়া পর্যন্ত আমি পাও ছাড়তাম না।' মৌলানা সাহেব অনেক চেষ্টা করেও রহিমাকে ঝেড়ে ফেলতে পারলেন না। রহিমা বজ্র আঁটুনিতে পা ধরে বসে রইল।

মৌলানা সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন– 'বাঁইচ্যা আছে বুঝলা ক্যামনে?'

রহিমা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'আমি জানি।'

গ্রামের মৌলানারা অতি কঠিন হৃদয়ের হয় বলে আমাদের একটা ধারণা আছে। এই ধারণা সত্যি নয়। মৌলানা সাহেব বললেন– 'প্রয়োজনে কবর দ্বিতীয়বার খোঁড়া জায়েজ আছে। এই মেয়ের মনের শান্তির জন্য এটা করা যায়। হাদিস শরীফে আছে...'

কবর খোঁড়া হলো।

ভয়াবহ দৃশ্য!

মন্তাজ মিয়া কবরের পাশে হেলান দিয়ে বসে আছে। পিটপিট করে তাকাচ্ছে। হঠাৎ চোখে প্রবল আলো পড়ায় চোখ মেলতে পারছে না। কাফনের কাপড়ের একখণ্ড লুঙ্গির মতো পেঁচিয়ে পরা। অন্য দুটি খণ্ড সুন্দর করে ভাঁজ করা।

অসংখ্য মানুষ জমা হয়ে আছে। এই অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে কারো মুখে কোনো কথা সরল না। মৌলানা সাহেব বললেন– 'কি রে মন্তাজ?'

মন্তাজ মৃদু স্বরে বলল, 'পানির পিয়াস লাগছে।'

মৌলানা সাহেব হাত বাড়িয়ে তাকে কবর থেকে তুললেন।

'এই হচ্ছে মন্তাজ মিয়ার গল্প। আমি আমার এই জীবনে অদ্ভুত গল্প অনেক শুনেছি। এ রকম কখনো শুনি নি।'

ছোট চাচাকে বললাম, 'মন্তাজ তারপর কিছু বলে নি? অন্ধকার কবরে জ্ঞান ফিরবার পর কি দেখল না দেখল এইসব?'

ছোট চাচা বললেন– 'না। কিচ্ছু কয় না। হারামজাদা বিরাট বজ্জাত।'

'জিজ্ঞেস করেন নি কিছু?'

'কত জনে কত জিজ্ঞেস করছে। এক সাংবাদিকও আসছিল। ছবি তুলল। কত কথা জিজ্ঞেস করল– একটা শব্দও করে না। হারামজাদা বদের হাড্ডি।'

আমি বললাম, 'কবর থেকে ফিরে এসেছে– লোকজন তাকে ভয়-টয় পেত না?'

'প্রথম প্রথম পাইত। তারপর আর না। আল্লাহ্‌তায়ালার কুদরত। আল্লাহ্‌তায়ালার কেরামতি আমরা সামান্য মানুষ কি বুঝব কও?'

'তা তো বটেই। আপনারা তার বোন রহিমাকে জিজ্ঞেস করেন নি সে কি করে বুঝতে পারল মন্তাজ বেঁচে আছে?'

'জিজ্ঞেস করার কিছু নাই। এইটাও তোমার আল্লাহ্‌র কুদরত। উনার কেরামতি।'

ধর্ম-কর্ম করুক বা না করুক গ্রামের মানুষদের আল্লাহ্‌তালার 'কুদরত এবং কেরামতির' উপর অসীম ভক্তি। গ্রামের মানুষদের চরিত্রে চমৎকার সব দিক আছে। অতি তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে এরা প্রচুর মাতামাতি করে, আবার অনেক বড় বড় ঘটনা হজম করে। দার্শনিকের মতো গলায় বলে, 'আল্লাহ্‌র কুদরত।'

আমি ছোট চাচাকে বললাম, 'রহিমাকে একটু খবর দিয়ে আনানো যায় না?' ছোট চাচা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কেন?'

'কথা বলতাম।'

'খবর দেওয়ার দরকার নাই। এম্নেই আসবে।'

'এম্নিতেই আসবে কেন?'

ছোট চাচা বললেন– 'তুমি পুলাপান নিয়া আসছ। চাইরদিকে খবর গেছে। এই গেরামের যত মেয়ের বিয়ে হইছে সব অখন নাইওর আসবে। এইটাই নিয়ম।'

আমি অবাকই হলাম। সত্যি সত্যিই এটাই নাকি নিয়ম। গ্রামের কোনো বিশিষ্ট মানুষ আসা উপলক্ষে গ্রামের সব মেয়েরা নাইওর আসবে। বাপের দেশে আসার এটা তাদের একটা সুযোগ। এই সুযোগ তারা নষ্ট করবে না।

আমি আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেউ কি এসেছে?'

'আসব না মানে? গেরামের একটা নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে না?'

আমি ছোট চাচাকে বললাম, 'আমাদের উপলক্ষে যেসব মেয়েরা নাইওর আসবে তাদের প্রত্যেককে যেন একটা করে দামি শাড়ি উপহার হিসেবে দেয়া হয়। একদিন খুব যত্ন করে দাওয়াত খাওয়ানো হয়।'

ছোট চাচা এটা পছন্দ করলেন না, তবে তাঁর রাজি না হয়েও কোনো উপায় ছিল না। আমাদের জমিজমা তিনি দীর্ঘদিন ধরে ভোগদখল করছেন।

গ্রামের নিয়মমত এক সময় রহিমাও এল। সঙ্গে চারটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। হত দরিদ্র অবস্থা। স্বামীর বাড়ি থেকে সে আমার জন্যে দুটা ডালিম নিয়ে এসেছে।

আমার স্ত্রী তাকে খুব যত্ন করে খাওয়াল। খাওয়ার শেষে তাকে শাড়িটি দেয়া হলো। মেয়েটি অভিভূত হয়ে গেল। এরকম একটা উপহার বোধহয় তার কল্পনাতেও ছিল না। তার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। আমি তাকে আমার ঘরে ডেকে নিলাম। কোমল গলায় বললাম, 'কেমন আছ রহিমা?'

রহিমা ফিসফিস করে বলল, 'ভালো আছি ভাইজান।'

'শাড়ি পছন্দ হয়েছে?'

'পছন্দ হইব না! কি কন ভাইজান? অত দামি জিনিস কি আমরা কোনোদিন চউক্ষে দেখিছ।'

'তোমার ভাইয়ের ব্যাপারটা জানতে চাচ্ছিলাম। তুমি কি করে বুঝলে ভাই বেঁচে আছে?'

রহিমা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'কি কইরা বুঝলাম আমি নিজেও জানি না ভাইজান। মৃত্যুর খবর শুইন্যা দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসছি। বাড়ির উঠানে পাও দিতেই মনে হইল মন্তাজ বাঁইচ্যা আছে।'

'কি জন্যে মনে হলো?'

'জানি না ভাইজান। মনে হইল।'

'এই রকম কি তোমার আগেও হয়েছে? মানে কোনো ঘটনা আগে থেকেই কি তুমি বলতে পারো?'

'জি না।'

'মন্তাজ তোমাকে কিছু বলে নি? জ্ঞান ফিরলে সে কি দেখল বা তার কি মনে হলো?

'জি না।'

'জিজ্ঞেস করো নি?'

'করছি। হারামজাদা কথা কয় না।'

রহিমা আরও খানিকক্ষণ বসে পান-টান খেয়ে চলে গেল।

আমার টানা লেখালেখিতে ছেদ পড়ল। কিছুতেই আর লিখতে পারি না। সব সময় মনে হয়, বাচ্চা একটি ছেলে কবরের বিকট অন্ধকারে জেগে উঠে কি ভাবল? কি সে দেখল? তখন তার মনের অনুভূতি কেমন ছিল?

মন্তাজ মিয়াকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে, আবার মনে হয়, জিজ্ঞেস করাটা ঠিক হবে না। সব সময় মনে হয়, বাচ্চা একটি ছেলেকে ভয়স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়াটা অন্যায় কাজ। এই ছেলে নিশ্চয়ই প্রাণপণে এটা ভুলতে চেষ্টা করছে। ভুলতে চেষ্টা করছে বলেই কাউকে কিছু বলতে চায় না। তবু একদিন কৌতূহলের হাতে পরাজিত হলাম।

দুপুর বেলা।

গল্পের বই নিয়ে বসেছি। পাড়াগাঁর ঝিম-ধরা দুপুর। একটু যেন ঘুমঘুম আসছে।

জানালার বাইরে খুট করে শব্দ হলো। তাকিয়ে দেখি মন্তাজ। আমি বললাম– 'কি খবর রে মন্তাজ?'

'ভালো।'

'বোন আছে– না চলে গেছে?'

'গেছে গা।'

'আয় ভেতরে আয়।'

মন্তাজ ভেতরে চলে এলো। আমার সঙ্গে তার ব্যবহার এখন বেশ স্বাভাবিক। প্রায়ই খানিকটা গল্পগুজব হয়। মনে হয়, আমাকে সে খানিকটা পছন্দও করে। এইসব ছেলেরা ভালোবাসার খুব কাঙাল হয়। অল্প কিছু মিষ্টি কথা, সামান্য একটু আদর– এতেই তারা অভিভূত হয়ে যায়। এই ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে বলে আমার ধারণা।

মন্তাজ এসে খাটের এক প্রান্তে বসল। আড়ে আড়ে আমাকে দেখতে লাগল। আমি বললাম– 'তোর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলি, কেমন?'

'আইচ্ছা।'

'ঠিকমত জবাব দিবি তো?'

'হুঁ।'

'আচ্ছা মন্তাজ, কবরে তুই জেগে উঠেছিলি, মনে আছে?'

'আছে।'

'যখন জেগে উঠলি তখন ভয় পেয়েছিলি?'

'না।'

'না কেন?'

মন্তাজ চুপ করে রইল। আমার দিক থেকে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। আমি বললাম, 'কি দেখলি, চারদিকে অন্ধকার?'

'হ।'

'কেমন অন্ধকার?'

মন্তাজ এবার জবাব দিল না। মনে হচ্ছে সে বিরক্ত হচ্ছে।

আমি বললাম, 'কবর তো খুব অন্ধকার তবু ভয় লাগল না?'

মন্তাজ নিচু স্বরে বলল, 'আরেকজন আমার সাথে আছিল, সেই জন্যে ভয় লাগে নাই।'

আমি চমকে উঠে বললাম, 'আরেকজন ছিল মানে? আরেকজন কে ছিল?'

'চিনি না। আন্ধাইরে কিচ্ছু দেখা যায় না।'

'ছেলে না মেয়ে?'

'জানি না।'

'সে কি করল?'

'আমারে আদর করল। আর কইল, কোনো ভয় নাই।'

'কি ভাবে আদর করল?'

'মনে নাই।'

'কি কি কথা সে বলল?'

'মজার কথা– খালি হাসি আসে।'

বলতে বলতে মন্তাজ মিয়া ফিক্ করে হেসে ফেলল।

আমি বললাম, 'কি রকম মজার কথা? দু'একটা বল তো শুনি?'

'মনে নাই।'

'কিছুই মনে নাই? সে কে এটা কি বলেছে?'

'জি না।'

'ভালো করে ভেবে-টেবে বল তো– কোনো কিছু কি মনে পড়ে?'

'উনার গায়ে শ্যাওলার মতো গন্ধ ছিল।'

'আর কিছু?'

মন্তাজ মিয়া চুপ করে রইল।

আমি বললাম, 'ভালো করে ভেবে-টেবে বল তো। কিছুই মনে নেই?'

মন্তাজ মিয়া অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'একটা কথা মনে আসছে।'

'সেটা কি?'

'বলতাম না। কথাডা গোপন।'

'বলবি না কেন?'

মন্তাজ জবাব দিল না।

আমি আবার বললাম– 'বল মন্তাজ, আমার খুব শুনতে ইচ্ছে করছে।'

মন্তাজ উঠে চলে গেল।

এই তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। বাকি যে ক'দিন গ্রামে ছিলাম সে কোনোদিন আমার কাছে আসে নি। লোক পাঠিয়ে খবর দিয়েছি, তবু আসে নি। কয়েকবার নিজেই গেলাম। দূর থেকে দেখতে পেয়ে সে পালিয়ে গেল। আমি আর চেষ্টা করলাম না।

কিছু রহস্য সে তার নিজের কাছে রাখতে চায়। রাখুক। এটা তার অধিকার। এই অধিকার অনেক কষ্টে সে অর্জন করেছে। শ্যাওলা-গন্ধী সেই ছায়াসঙ্গীর কথা আমরা যদি কিছু নাও জানি তাতেও কিছু যাবে না আসবে না।

শবযাত্রা

পুরোপুরি নাস্তিক মানুষের সংখ্যা এই পৃথিবীতে খুবই কম। ঘোর নাস্তিক যে মানুষ তাকেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে খুব দুর্বল দেখা যায়। আমি একজন ঘোর নাস্তিককে চিনতাম, তার ঠোঁটে একবার একটা গ্রোথের মতো হলো। ডাক্তাররা সন্দেহ করলেন– ক্যানসার। সঙ্গে সঙ্গে সেই নাস্তিক পুরোপুরি আস্তিক হয়ে গেলেন। তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ার জন্যে মসজিদে যান। মালিবাগের পীর সাহেবের মুরিদও হলেন।

বায়োপসির পর ধরা পড়ল যে গ্রোথের ধরন খারাপ নয়। লোকালাইজড গ্রোথ। ভয়ের কিছুই নেই। অপারেশন করে ফেলে দিলেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক আবার নাস্তিক হয়ে পড়লেন। ভয়াবহ ধরনের নাস্তিক। অংক করে প্রমাণ করে দিলেন যে, ঈশ্বর = ০২ ও এবং আত্মা = ০১।

যাই হোক, মানুষদের চরিত্রের এই দ্বৈত ভাব আমাকে বিস্মিত করে না। প্রচণ্ড রকম ঈশ্বর-বিশ্বাসী মানুষের মধ্যেও আমি অবিশ্বাসের বীজ দেখেছি। আমার কাছে এটাই স্বাভাবিক মনে হয়। এর বাইরে কিছু দেখা মানে অস্বাভাবিক কিছু দেখা।

আমি এরকম একজন অস্বাভাবিক চরিত্রের কথা এই গল্পে বলব। চরিত্রের নাম মোতালেব (কাল্পনিক নাম)। বয়স পঞ্চাশ থেকে পাঁচপঞ্চাশ। ভীষণ রোগা এবং প্রায় তালগাছের মতো লম্বা একজন মানুষ। চেইন স্মোকার। মাথায় কিছু অসুবিধা আছে বলেও মনে হয়। নিতান্ত অপরিচিত লোককেও এই ভদ্রলোক শীতল গলায় বলে ফেলতে পারেন– ভাই কিছু মনে করবেন না, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি একজন মহামূর্খ।

মোতালেব সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় এক বিয়ে বাড়িতে। সেদিন ঐ বিয়ে-বাড়িতে কি একটা সমস্যা হয়েছে, কাজী পাওয়া যাচ্ছে না কিংবা এই জাতীয় কিছু।

বরপক্ষীয় এবং কনেপক্ষীয় লোকজন বিমর্ষ মুখে ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে গল্প করছে। আমি একটা দলের সঙ্গে জুটে গেলাম। সেখানে জনৈক অধ্যাপক বিগ বেং এবং এক্সপানডিং ইউনিভার্স সম্পর্কে কথা বলছেন। শ্রোতারা চোখ বড় বড় করে শুনছে।

ভদ্রলোক ব্ল্যাকহোল সম্পর্কে কথা বলা শুরু করেছেন, তখন একটা নাটকীয় ব্যাপার ঘটল। রোগা এবং লম্বা একজন শুকনো মানুষ বললেন, 'ভাই কিছু মনে করবেন না, আপনি একজন মহামূর্খ।'

অধ্যাপক ভদ্রলোক নিজেকে সামলাতে কিছু সময় নিলেন। পুরোপুরি সামলাতে পারলেন না– কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'আপনি কি আমাকে মহামূর্খ বললেন?'

'জি।'

'কেন বললেন জানতে পারি?'

'অবশ্যই জানতে পারেন। আপনি আপনার বক্তৃতা শুরুই করেছেন ভুল তথ্য দিয়ে– বলেছেন ব্যাক গ্রাউন্ড রেডিয়েশন ধরা পড়েছে ইনফ্রারেডে। তা পড়ে নি। ধরা পড়েছে মাইক্রোওয়েভে। আনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি'র একটি স্বীকার্যই হচ্ছে স্পেস এবং টাইমের জন্ম বিগ বেং সিংগুলারিটিতে। আপনি বললেন ভিন্ন কথা। কোনো কিছুই না জেনে একটার সঙ্গে একটা মিলিয়ে কি সব উল্টাপাল্টা কথা বলছেন।'

অধ্যাপক ভদ্রলোক রাগে তোতলাতে তোতলাতে বললেন-

'আমি তো ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস নিচ্ছি না....একটু এদিক-ওদিক হতেই পারে।'

'বিজ্ঞান ঠাকুরমার ঝুলি না যে যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে বলবেন।'

ভদ্রলোক সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে অন্যদিকে সরে গেলেন। আমি গেলাম তাঁর পেছনে পেছনে। মজার চরিত্র। কথা বলা দরকার।

যতটুকু মজার চরিত্র ভেবে ভদ্রলোকের কাছে গেলাম, দেখা গেল, চরিত্র তার চেয়েও মজার। ভদ্রলোকের বিষয় পদার্থবিদ্যা নয়– সাইকোলজি। পদার্থবিদ্যা হচ্ছে তাঁর শখ। এই শখ মেটানোর জন্যে রীতিমত শিক্ষক রেখে অংক, পদার্থবিদ্যা শিখেছেন।

এই জাতীয় লোকদের সঙ্গে সহজে বন্ধুত্ব হয় না। আমি লক্ষ করেছি, এরা সচরাচর সন্দেহবাতিকগ্রস্ত হয়ে থাকে। এই লোকও দেখা গেল সেই রকম। একদিন বেশ বিরক্ত হয়েই বলল, 'আপনি দেখি মাঝে মাঝেই আমার কাছে আসেন। বিষয়টি কি বলেন তো?'

'বিষয় কিছু না।'

'বিষয় কিছু না বললে তো হবে না। এ পৃথিবীতে কার্যকারণ ছাড়া কিছুই হয় না।'

আমি হাসিমুখে বললাম,

'ক্লাসিক্যাল ম্যাকানিক্স, তাই বলে কিন্তু ভাই মোতালেব সাহেব, হাইজেনবার্গের আনসারটিনিটি প্রিন্সিপ্যাল আপনি ভুলে যাচ্ছেন। একটি বস্তুকে পুরোপুরি আপনি কিন্তু জানেন না। যখন অবস্থান জানেন তখন সঠিক গতি কি তা জানেন না...।'

'আপনার সঙ্গে কূটতর্কে যেতে যাচ্ছি না– আপনি স্পষ্ট করে বলুন কি জন্যে আমার কাছে আসেন– মদপানের লোভে?'

আমি ঝামেলা এড়াবার জন্যে বললাম, 'হ্যাঁ।'

'ভালো কথা। আমার পেছনে অনেকেই ঘুরে এবং তাদের উদ্দেশ্য একটাই– বিনা পয়সায় মদপান। তৃষ্ণার্ত মধ্যবিত্ত বাঙালি মদপান করতে চায়, তবে তা নিজের বাসায় নয়, অন্যের বাসায়– যাতে স্ত্রী জানতে না পারে। নিজের পয়সায় না অন্যের পয়সায়, যাতে টাকা-পয়সা খরচ না হয়– অদ্ভুত মধ্যবিত্ত।'

আমি বললাম, 'আপনি মনে হচ্ছে মধ্যবিত্তদের উপর খুব বিরক্ত।'

'অফকোর্স বিরক্ত। মধ্যবিত্ত হচ্ছে সমাজের একটা ফাজিল অংশ। আনকনট্রোলড গ্রোথ। এই মধ্যবিত্তের প্রথম প্রেমের অভিজ্ঞতা হয় কাজিনের কাছে, প্রথম যৌনতার অভিজ্ঞতা হয় বাড়ির কাজের মেয়ের সঙ্গে। প্রথম মদপানের অভিজ্ঞতা হয় অন্যের

পয়সায়। এখন বলুন আপনাকে কি দেব? স্কচ ক্লাব আছে, জিন আছে, ভদকা আছে, কয়েক পদের হুইস্কি আছে। আর আপনার যদি মিক্সড ড্রিংক পছন্দ হয় তাহলে তাও বানিয়ে দেব। Your name it, I will make it— হা হা হা।'

'কিছু মনে করবেন না ভাই। আপনাকে মিথ্যা কথা বলেছিলাম– বিনা পয়সায় মদের লোভে না, আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার লোভেই আমি আসি।'

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, 'আমাকে কি ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার বলে মনে হয়?'

'হ্যাঁ।'

'আমি এই নিয়ে তিনবার বিয়ে করেছি– কোনো স্ত্রী আমাকে ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার বলে মনে করে নি। প্রথমজন অনেক কষ্টে দু'বছরের মতো টিকে ছিল, বাকি দু'জন এক বছরও টিকে নি। হা হা হা।'

'না টেকায় আপনি মনে হচ্ছে খুশিই হয়েছেন।'

'হ্যাঁ হয়েছি। স্ত্রীরা স্বামীদের স্বাধীনতায় হাত দিতে পছন্দ করে। শুধু শুধু নানান বায়নাক্কা– মদ খেতে পারবে না, রাত জেগে পড়তে পারবে না, জুয়া খেলতে পারবে না– আরে কি মুশকিল, আমার সব কথায় কথা বলো কেন? আমি কি তোমার কোনো ব্যাপারে মাথা গলাই? আমি কি বলি– নীল শাড়ি পরতে পারবে না, লাল শাড়ি পরতে হবে। হাই হিল পরতে পারবে না, ফ্ল্যাট স্যান্ডেল পরবে। বলি কখনো? না, বলি না। আমি ওদেরকে ওদের মতো থাকতে বলি। আমি নিজে থাকতে চাই আমার মতো। ওরা তা দেবে না।'

'এই যে এখন একা-একা বাস করছেন, আপনি কি মনে করেন আপনি সুখী?'

'হ্যাঁ সুখী, মাঝে মাঝে একটু দুঃখ ভাব চলে আসে, তখন মদপান করি। প্রচুর পরিমাণেই করি। পুরোপুরি মাতাল হতে চেষ্টা করি। পারি না। শরীর যখন আর এলকোহল একসেপ্ট করতে পারে না তখন বমি করে ফেলে দেয় কিন্তু মাতাল হতে দেয় না– কেন দেয় না তারও একটা কারণ আছে।'

'কি কারণ?'

'বলব, আরেক দিন বলব। এখন বলেন কি খাবেন? আজকের আবহাওয়াটা 'ব্লাডি মেরির' জন্যে খুব আইডিয়াল। দেব একটা ব্লাডি মেরি বানিয়ে? জিনিসটা স্বাস্থ্যের জন্যেও ভালো। প্রচুর টমেটোর রস দেয়া হয়।'

ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার ভালোই খাতির হলো। মাসে দু'একবার তাঁর কাছে যাই। বিচিত্র সব বিষয় নিয়ে কথা হয়। যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব, এন্টি-ম্যাটার, লাইফ আফটার ডেথ। ভদ্রলোকের নাস্তিকতা দেখার মতো, যা বলবেন– বলবেন। কোথাও সংশয়ের কিছু রাখবেন না। আমার মতো আরও অনেকেই আসে। তবে তাদের মূল আগ্রহ জলযাত্রায়।

একবার আমাদের আড্ডায় এক ভদ্রলোক একটি ব্যক্তিগত ভৌতিক অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল এ রকম– শ্রাবণ মাসে একবার তিনি গ্রামের বাড়ি যাচ্ছেন। বাড়ি স্টেশন থেকে অনেকখানি দূর। সন্ধ্যাবেলা ট্রেন এসে পৌছার কথা।

পৌঁছতে পৌঁছতে রাত ন'টা বেজে গেল। গ্রামদেশে রাত ন'টা মানে নিশুতি রাত। ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। স্টেশনে একটা লোক নেই। একা-একাই রওনা হলাম। কিছুদূর যাবার পর হঠাৎ দেখি, আমার আগে আগে কে যেন সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ কাউকে দেখি নি। এখন এই সাইকেলে করে কে যাচ্ছে? আমি বললাম– কে কে কে? কেউ জবাব দিল না। লোকটা একবার শুধু মুখ ফিরিয়ে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে চিনলাম। যে সাইকেলে বসে আছে তার নাম পরমেশ। আমরা একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি। বছর তিনেক আগে নিউমোনিয়া হয়ে মারা যায়....

গল্পের এই পর্যায়ে মোতালেব সাহেব বাঁজখাই গলায় বললেন–স্টপ। আপনি বলতে চাচ্ছেন–আপনার এক মৃতবন্ধু সাইকেল চালিয়ে আপনার পাশে পাশে যাচ্ছিল?

'হ্যাঁ।'

'মনে হচ্ছে আপনাকে সাহস দেবার জন্যেই সে আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল।'

'হতে পারে।'

মোতালেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, তর্কের খাতিরে স্বীকার করে নিলাম যে, আপনার বন্ধু মরে ভূত হয়েছেন। আপনাকে সাহস দেবার জন্যে আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছেন। এখন সমস্যা হলো–সাইকেল। একটা সাইকেল মরে 'সাইকেল-ভূত' হবে না, যদি না হয় তাহলে আপনার ভূত-বন্ধু সাইকেল পেল কোথায়?

যিনি গল্প করেছিলেন তিনি থমকে গেলেন। মোতালেব সাহেব বললেন, 'স্বীকার করলাম অবশ্যই তর্কের খাতিরে যে মানুষ মরে ভূত হতে পারে তাই বলে কাপড় মরে তো "কাপড়-ভূত" হবে না। আমরা যদি ভূত দেখি তাদের নেংটা দেখা উচিত। ওরা কাপড় পায় কোথায়? সব সময় দেখা যায় ভূত একটা সাদা কাপড় পরে থাকে। এর মানে কি?'

মজার ব্যাপার হচ্ছে– এই ঘোর নাস্তিক, প্রচণ্ড যুক্তিবাদী মানুষের কাছ থেকে আমি অবিশ্বাস্য একটি গল্প শুনি। যেভাবে গল্পটি শুনেছিলাম অবিকল সেইভাবে বলছি। গল্পের শেষে মোতালেব সাহেব কিছু ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। অপ্রয়োজনীয় বিধায় সেই ব্যাখ্যা আমি দিচ্ছি না। বৈশাখ মাসের এক ঝড়বৃষ্টির সন্ধ্যায় মোতালেব সাহেব গল্প শুরু করলেন।

'এই যে ভাই লেখক, ইন্টারেস্টিং অভিজ্ঞতার একটা ঘটনা শুনবেন? একটা কন্ডিশনে ঘটনাটা বলতে পারি। চুপ করে শুনে যাবেন, কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না। এবং ঘটনাটা বিশ্বাস করতে পারবেন না।'

'বিশ্বাস করলে অসুবিধা কি?'

'অসুবিধা আছে। আমার মাধ্যমে কোনো অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার প্রচার পাবে তা হয় না। তা হতে দেয়া যায় না। আপনি যদি ধরে নেন, এখন যা শুনছেন তা একটা গল্প, মজার গল্প, তাহলেই আপনাকে বলতে পারি।'

'এ গল্পটি আমি কোথাও ব্যবহার করতে পারি?'

'পারেন। কারণ গল্প-উপন্যাসকে কেউ গুরুত্ব দেয় না। সবাই ধরেই নেয় এগুলো বানানো ব্যাপার।'

'তাহলে বলুন, শুনি।'

ভদ্রলোক পরপর চার পেগ মদপান করলেন। তাঁর মদপানের ভঙ্গিও অদ্ভুত। ওষুধের মেজারিং গ্লাস ভর্তি করে হুইস্কি নেন। এক ফোঁটাও পানি মেশান না। ঢক করে পুরোটা মুখে ফেলে দেন কিন্তু গিলে ফেলেন না। কুলকুচা করার মতো শব্দ হয়, তারপর এক সময় ঘোঁৎ করে গিলে ফেলে বলেন– কেন যে মানুষ এই ছাইপাশ খায়, বলেই আবার খানিকটা নেন। যাইহোক, ভদ্রলোকের জবানিতে মূল গল্পে যাচ্ছি–

'তখন আমার বয়স চব্বিশ। এম. এ. পাস করেছি। ধারণা ছিল খুব ভালো রেজাল্ট হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে টিচার হিসেবে এন্ট্রি পেয়ে যাব। তা হয় নি। এম. এম.'র রেজাল্ট খুবই খারাপ হলো। কেন হলো তা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। পরীক্ষা ভালো দিয়েছি। একটা গুজব শুনতে পাচ্ছি– জনৈক অধ্যাপক রাগ করে আমাকে খুবই কম নম্বর দিয়েছেন। এই গুজব অমূলক নাও হতে পারে। অধ্যাপকদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো না। দু-একজন আমাকে বেশ পছন্দ করেন, আবার কেউ কেউ আছেন আমার ছায়াও সহ্য করতে পারেন না।

যা বলছিলাম, রেজাল্টের পর মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাবা খুব রাগারাগি করলেন। হিন্দি ভাষায় বললেন– নিকালো। আভি নিকালো।

আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম, চলে যাচ্ছি। হিন্দি বলার দরকার নেই।

এই বলেই স্যুটকেস গুছিয়ে বের হয়ে পড়লাম। আমি খুবই সচ্ছল পরিবারের ছেলে। কাজেই খালি হাতে ঘর থেকে বের হলাম না। বেশ কিছু টাকা সঙ্গে নিয়ে বের হলাম। কোথায় যাচ্ছি কাউকে বলে গেলাম না। সঙ্গে একগাদা বই, বিশাল একটা খাতা। একডজন বল পয়েন্ট। সেই সময় আমার লেখালেখির বাতিক ছিল। একটা ডিটেকটিভ উপন্যাস শুরু করেছিলাম। যে উপন্যাস মূল ডিটেকটিভ খুন করে। ইন্টারেস্টিং গল্প।

যাই হোক, বাড়ি থেকে বের হয়েও খুব একটা দূরে গেলাম না। একটা হোটেল ঘর ভাড়া করে রইলাম। দেখি সেখানে কাজ করার খুব অসুবিধা– সারাক্ষণ হৈচৈ। কিছু কিছু কামরায় রাত-দুপুরে মদ খেয়ে মাতলামিও করে। মেয়েছেলে নিয়ে আসে।

হোটেল ছেড়ে দিয়ে শহরতলিতে একটা বেশ বড় বাড়ি ভাড়া করে বসলাম। এক জজ সাহেব শখ করে বাড়ি বানিয়েছিলেন। তাঁর শখ হয়তো এখনো আছে, ছেলেমেয়েদের শখ মিশে গেছে। এ বাড়িতে কেউ আর থাকতে আসে না।

একজন কেয়ারটেকার-কাম মালি-কাম দারোয়ান আছে। বাড়ির পুরো দায়িত্ব তার। লোকটিকে দেখেই মনে হয় ভদ্রলোক। আমাকে যে বাড়ি ভাড়া দিয়েছে, মনে হচ্ছে নিজ দায়িত্বে দিয়েছে। ভাড়ার টাকা মালিকের কাছে পৌঁছাবে বলে মনে হলো না। ওটা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। পৌঁছলে পৌঁছবে, না পৌঁছলে নেই। আমার এক মাস থাকার কথা, সেটা থাকতে পারলেই হলো। নিরিবিলি বাড়ি, আমার খুবই পছন্দ হলো।

লেখালেখির জন্যে চমৎকার।

কেয়ারটেকারের নাম ইয়াকুব। বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছে। রিপালসিভ ধরনের চেহারা তবে গলার স্বরটি অতি মধুর। আমি একাই এ বাড়িতে থাকব শুনে সে বিস্মিত গলায় বলল, স্যার কি সত্যি একা থাকবেন?

'হ্যাঁ।'

'বিষয়টা কি?'

'বিষয় কিছু না। পড়াশোনা করব। লেখালেখি করব।'

'আর খাওয়া-দাওয়া? হোটেল এইখানে পাবেন কোথায়? সেই যদি শহরে যান। পাঁচ মাইলের ধাক্কা।'

'রান্না করে দেবে এমন কাউকে পাওয়া যায় না? টাকা-পয়সা দেব।'

'আপনি বললে আমি রাঁধব। খেতে পারবেন কি-না সেটা হলো কথা।'

'পারব। খাওয়া নিয়ে আমার কোনো খুঁতখুঁতানি নেই।'

'আরেকটা জিনিস বলে রাখি স্যার। মুরগি ছাড়া কিন্তু কিছু পাওয়া যায় না। হাটবার মাছ-টাছ পাওয়া যায়। হাটবারের দেরি আছে। আর চালটা স্যার একটু মোটা আছে। আপনার নিশ্চয়ই চিকন চাল খেয়ে অভ্যাস?'

'চিকন চাল খেয়ে অভ্যাস ঠিকই, মোটা চালে অসুবিধা হবে না। তবে ভাত যেন শক্ত না হয়। শক্ত ভাত খেতে পারি না।'

দেখা গেল লোকটি রান্নায় দ্রৌপদী না হলেও তার কাছাকাছি। দুপুরে খুব ভালো খাওয়াল। রাতেও নতুন নতুন পদ করল। আমি বিস্মিত। রাতে খেতে খেতে বললাম, 'এত ভালো রান্না শিখলে কোথায়?' ইয়াকুব গম্ভীর মুখে বলল,

'আমার স্ত্রীর কাছে শিখেছি। খুব ভালো রাঁধতে পারত।'

'পারত বলছ কেন? এখন কি পারে না?"

ইয়াকুব গম্ভীর হয়ে গেল। ভাবলাম, নিশ্চয়ই খুব ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপার। এখন আর প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে না। তবে সহজেই নিজেকে সামলে নিল। সহজ স্বরে বলল, 'এখন পারে কি পারে না জানি না স্যার। আমার সঙ্গে থাকে না।'

'কোথায় থাকে?'

'জানি না কোথায় থাকে। ওর চরিত্র খারাপ ছিল। এর-তার সাথে যোগাযোগ ছিল। বিশ্রী অবস্থা। বলার মতো না। অনেক দেন-দরবার করেছি কিন্তু লাভ হয় নাই। তারপর সাত বছরের দুই মেয়ে ঘরে রেখে পালিয়ে গেছে, বুঝে দেখেন কত বড় হারামি।'

'কতদিন আগের কথা?'

'বছর দুই।'

'কোনো খবর পাওয়া যায় নি?'

'মোড়লগঞ্জ বাজারে না-কি দেখা গিয়েছিল– আমার কোনো আগ্রহ ছিল না। খোঁজ নেই নাই।'

এদের জীবনের এই জাতীয় কিচ্ছা-কাহিনী শুনতে সাধারণত ভালোই লাগে। আমার

লাগল না। আমাদের সবার জীবনেই একান্ত সমস্যা আছে। সেই সব নিয়ে মাথা ঘামালে চলে না। কিন্তু ইয়াকুব মনে হলো কথা বলবেই।

'জীবনে বড় ভুল কি করেছিলাম জানেন স্যার? সুন্দরী বিয়ে করেছিলাম। ডানাকাটা পরী বিয়ে করেছিলাম।'

'বউ খুব সুন্দরী ছিল?'

'আগুনের মতো ছিল। আগুন থাকলেই পোকামাকড় আসে। তাই হলো। আমার জীবন হলো অতিষ্ঠ। একদিন মোড়লগঞ্জের বাজারে গেছি, ফিরে এসে দেখি সদর দরজা বন্ধ। অনেকক্ষণ ধাক্কাধাক্কি করলাম, কেউ দরজা খোলে না। শেষে ধুপ করে জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে কে যেন দৌড় দিল। আমি বউরে বললাম– এ কে? বউ বলল, আমি কি জানি কে?'

ইয়াকুব একের পর এক বউয়ের কীর্তিকাহিনী বলতে লাগল, আমি এক সময় বিরক্ত হয়ে বললাম,

'ঠিক আছে, বাদ দাও এসব কথা।'

'বাদ দিতে চাইলেও বাদ দেয়া যায় না। তিনবার সালিশী বসল। সালিশীতে ঠিক হলো বউরে তালাক দিতে হবে। তালাক দিলাম না। মন মানল না। তার উপর যমজ মেয়ে আছে। এর ফল হলো এই ...'

'স্ত্রী কোথায় আছে তুমি জানো না?'

'জি না।'

'মেয়েরা তোমার সঙ্গে থাকে?'

'জি।'

'কি নাম মেয়েদের?'

'যমজ মেয়ে হয়েছিল জনাব। তুহিন একজনের নাম, তুষার আরেকজনের নাম। নাম রেখেছিল মেয়ের মা।'

'ভালো, খুব ভালো।'

'কোনো কিছু দরকার লাগলে এদের বলবেন। মেয়েরা এখানেই থাকে, ডাক দিলেই আসবে।'

'না, আমার কিছু লাগবে না।'

'বিরক্ত করলেও বলবেন। থাবড়া দিয়ে গাল ফাটায়ে দিব। মেয়েগুলি বেশি সুবিধার হয় নাই। মায়ের খাসিলত পেয়েছে। সারাদিন সাজগোজ। এই পায়ে আলতা, এই ঠোঁটে লিপস্টিক।

'স্কুলে পড়ে না?'

'আরে দূর– পড়াশোনা? এরা যায় আর আসে।'

মেয়ে দু'টিকে আমার অবশ্যি খুবই পছন্দ হলো। দু'জনই হাস্যমুখ। সারাক্ষণ হাসছে। সব সময় সেজেগুজে আছে। কাজেরও খুব উৎসাহ। যদি বলি, এই, এক গ্লাস পানি দাও তো। ওম্নি ছুটে যাবে। দু'জনই দু'হাতে দুটা পানি ভর্তি গ্লাস নিয়ে এসে

বলবে, চাচা, আমারটা নেন। চাচা, আমারটা নেন। আধগ্লাস পানি খেলেই যেখানে চলত সেখানে বাধ্য হয়ে দু'গ্লাস খাই। যাতে মেয়ে দুটোর কোনোটাই কষ্ট না পায়।

স্নেহ নিম্নগামী। যত দিন যেতে লাগল বাচ্চা দুটিকে আমার ততই পছন্দ হতে লাগল। ছোটখাটো কিছু উপহার কিনে দিলাম। দু'জনের জন্যে দুটা রঙ-পেনসিলের সেট; ছোট ছোট আয়না। যাই পায় আনন্দে লাফায়। বড় ভালো লাগে দেখতে। ঐ বাড়িতে দেখতে দেখতে এগারো দিন কেটে গেল। বারো দিনের দিন একটা ঘটনা ঘটল। ঘটনাটা বলার আগে পারিপার্শ্বিক অবস্থার একটা বর্ণনা দিয়ে নেই।

আমার বাড়িটা পশ্চিমমুখী। বাড়ির সামনে এবং পেছনে আমন ধানের মাঠ। বাড়ির ওপরে জঙ্গলা ধরনের জায়গা। এক সময় নিবিড় বাঁশবন ছিল, এখন পাতলা হয়ে গেছে। দক্ষিণে উকিল বাড়ির বিশাল বাগান। সেই বাগানে আম, জাম লিচু থেকে শুরু করে আতাফলের গাছ পর্যন্ত আছে। একজন বেঁটেখাটো দাড়িওয়ালা মালি সেই বাগান পাহারা দেয়। আমার সঙ্গে দেখা হলেই গভীর বিনয়ের সঙ্গে জানতে চায়– 'স্যারের শইলডা কি ভালো? ঘুমের কোনো ডিসটার্ব হয় না তো?'

আমি প্রতিবারই বিস্মিত হয়ে বলি, 'ঘুমের ডিসটার্ব হবে কেন?'

'শহরের মানুষ হঠাৎ গেরামে আইস্যা পড়লেন। এই জন্যে জিগাই।'

'আমার ঘুম, খাওয়া-দাওয়া কোনো কিছুতেই কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।'

'অসুবিধা হইলে কইবেন। ভয়-ডর পাইলে ডাক দিবেন, আমার নাম বদরুল, আমি রাতে ঘুমাই না, জাগান থাকি।'

'ঠিক আছে বদরুল। যদি কখনো প্রয়োজন বোধ করি তোমাকে ডাকব।'

এগারো দিনের দিন প্রয়োজন বোধ করলাম। দিনটা সোমবার। সকাল থেকেই মেঘলা ছিল। দুপুর থেকে তুমুল বর্ষণ শুরু হলো। এর মধ্যে ইয়াকুব এসে বলল, 'স্যার, একটা বিরাট সমস্যা। তুহীনের গলা ফুলে কি যেন হয়েছে, নিশ্বাস নিতে পারছে না। ওকে তো স্যার ডাক্তারের কাছে নেয়া দরকার।'

আমি তৎক্ষণাৎ মেয়েটাকে দেখতে গেলাম। খুবই খারাপ অবস্থা। শুধু গলা না– সমস্ত মুখ ফুলে গেছে। কি কষ্টে যে নিশ্বাস নিচ্ছে সে-ই জানে। মেয়েটার শরীর এত খারাপ অথচ এরা আমাকে কিছুই বলে নি। আমার মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

আমি বললাম, 'এক মুহূর্ত দেরি করা ঠিক হবে না। তুমি এক্ষুনি মেয়েকে হাসপাতালে নিয়ে যাও।'

'স্যার, আপনার খাওয়া-দাওয়া?'

'আমার খাওয়া-দাওয়া নিয়ে তোমাকে কিছু চিন্তা করতে হবে না। চাল ফুটিয়ে নিতে পারব। একটা ডিমও ভেজে নেব। তুমি দেরি করবে না।'

আমি ইয়াকুবকে কিছু টাকাও দিলাম। সে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দুই মেয়েকে একটা গরুর গাড়িতে তুলে রওনা হয়ে গেল। আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। কেন যে মনে হলো মেয়েটা বাঁচবে না।

আমি থাকি দোতলার দক্ষিণমুখী একটা ঘরে। ঘরটা বিশাল। দু'দিকে জানালা

আছে। আসবাবপত্র বলতে পুরানো একটা খাট, খাটের পাশে লেখার টেবিল। লেখার টেবিলে হারিকেন ছাড়াও মোমদানে মোমবাতি। লেখালেখির জন্যে শুধু হারিকেনের আলো যথেষ্ট নয় বলেই মোমবাতির ব্যবস্থা।

কেন জানি সন্ধ্যার পর থেকে ভয় ভয় করতে লাগল। বিছানায় বসে লিখছি, হঠাৎ মনে হলো, কেউ-একজন দক্ষিণের বারান্দায় নরম পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। আমি 'কে কে' বলতেই হাঁটার শব্দ থেমে গেল।

আমি দুর্বল চিত্তের মানুষ নই। তবে যে কোনো সাহসী মানুষও কোনো কারণে বিশাল একটা বাড়িতে একা পড়ে গেলে একটু অন্য রকম বোধ করে। আমার কেমন অন্য রকম লাগতে লাগল। সেই অন্য রকমটাও আমি ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারছিলাম না। একবার মনে হচ্ছে পানির পিপাসা হচ্ছে, আবার পর মুহূর্তেই মনে হচ্ছে– না, পানির পিপাসা না– অন্য কিছু। অনেক চেষ্টা করেও লিখতে পারলাম না। লেখার জন্যে মাথা নিচু করতেই মনে হয় দরজার ফাঁক দিয়ে কেউ আমাকে দেখছে। তাকালেই সরে যাচ্ছে। দু'বার আমি বললাম– কে কে? বলেই লজ্জা পেলাম। কে কে বলে চেঁচানোর কোনো মানে হয় না।

এই সময় লক্ষ করলাম, হারিকেনের আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। তেল কমে এসেছে। এক্ষুনি হয়তো দপ করে নিভে যাবে। সবুজ রঙের বড় একটা বোতলে কেরোসিন তেল থাকে। সেই বোতলটি একতলার রান্নাঘরে। তাছাড়া মোমবাতি তো আছেই।

আমি নিবুনিবু হারিকেন নিয়ে একতলায় নেমে গেলাম। চা বানিয়ে খাব। হারিক্যেন তেল ভরব। রাতে খাবার কিছু করা যায় কি-না তাও দেখব।

দেখলাম, রাতে খাবার জন্যে চিন্তিত হবার কোনো কারণ নেই। ইয়াকুব ভাত রেঁধে রেখে গেছে। কড়াইয়ে ডাল আছে। ডিম আছে। ইচ্ছা করলেই ডিম ভেজে নেয়া যায়। চা বানিয়ে খেলাম। ফ্লাস্ক ভর্তি করে চা নিয়ে দোতলায় উঠে এলাম। বারান্দায় পা দিতেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। মনে হলো, সবুজ রঙের ডোরে শাড়ি পরা একটি মেয়ে যেন হঠাৎ দ্রুত সরে গেল। মেয়েটার চোখ দুটি মায়া মায়া। কিন্তু এই অন্ধকারে মেয়েটার চোখ দেখার কথা না। তাহলে এসব কি দেখছি?

বৃষ্টির বেগ খুব বাড়ছে। রীতিমত ঝড়ো হাওয়া বইছে। আমি আমার ঘরে আগের জায়গায় ফিরে এলাম। জানালা বন্ধ করে দিলাম। শোঁ-শোঁ শব্দ তবু কমল না। ঠিক তখন ব্রজপাত হলো। প্রচণ্ড বজ্রপাত। সাউন্ড ওয়েভের নিজস্ব একটা ধাক্কা আছে। এই ধাক্কায় মোমবাতির কিংবা হারিকেনের শিখা নিভে যায়। টেবিলের উপর হারিকেনের আলো নিভে গেল। হঠাৎ চারদিক গাঢ় অন্ধকার।

আমি তখন পরিষ্কার শুনলাম, মেয়েলী গলায় কেউ একজন বলছে– 'আপনে বাইরে আসেন।' আমি চেঁচিয়ে বললাম– 'কে?' সেই আগের কণ্ঠ আবার শোনা গেল– 'ভয় পাইয়েন না। একটু বাইরে আইসা দাঁড়ান।'

অল্পবয়স্ক মেয়ে মানুষের গলা। পরিষ্কার গলা।

আমি আবার বললাম– 'কে, তুমি কে?'

কোনো জবাব পাওয়া গেল না। মনে হলো যেন ছোট্ট করে নিশ্বাস ফেলল।

ঘরের দরজা একটু ফাঁক করল।

আমি উঠে বারান্দায় চলে এলাম। বারান্দায় কেউ নেই। তবু মনে হলো কেউ একজন বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। সে চাচ্ছে কিছুটা সময় আমি বারান্দায় থাকি।

ধুপধুপ শব্দ আসছে। শব্দ কোত্থেকে আসছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে কোদাল দিয়ে কেউ মাটি কোপাচ্ছে। এই ঝড়-বৃষ্টির রাতে কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে কে? আমি বারান্দার রেলিং-এর দিকে এগিয়ে গেলাম, তখন বিদ্যুৎ চমকাল।

বিদ্যুতের আলোয় স্পষ্ট দেখলাম, দক্ষিণ দিকের বাঁশবনের কাছে কোদাল নিয়ে একজন মাটি কোপাচ্ছে। যে মাটি কোপাচ্ছে সে হলো আমাদের ইয়াকুব।

কিন্তু ইয়াকুব এখানে আসবে কেন? ও তো মেয়ে নিয়ে শহরে গেছে। বিদ্যুচ্চমক দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না। একেকবার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর আমি তাকে দেখছি। সে খুব ব্যস্ত হয়ে মাটি কোপাচ্ছে। গভীর গর্ত করছে। সে কি কবর খুঁদছে? পাশে কাপড় দিয়ে মোড়া লম্বা এটা কি?

পরিষ্কার কিছু দেখছি না। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে তখনই শুধু দেখছি। বুঝতে পারছি এটা বাস্তব কোনো দৃশ্য নয়। এই দৃশ্যের জন্ম আমার চেনা-জানা জগতে নয়। অন্য জগতে, অন্য সময়ে।

আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছি। মুষলধারে বর্ষণ হচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আমি ইয়াকুবকে দেখছি। সে অতি ব্যস্ত। অতি দ্রুত কবর খুঁদছে। কার কবর? সবুজ কাপড়ে মোড়া একটি মৃতদেহ পাশেই রাখা। বৃষ্টির পানিতে তা ভিজছে। এটা কি তার স্ত্রীর মৃতদেহ? কি আশ্চর্য, হাত পাঁচেক দূরে বাচ্চা দুটা বসে আছে। এরা এক দৃষ্টিতে মৃতদেহটির দিকে তাকিয়ে আছে।

যে রূপবতী স্ত্রী পালিয়ে যাবার কথা ইয়াকুব বলে, এই কি সেই মেয়ে? এই মেয়েটিকে সে-ই কি হত্যা করেছিল? হত্যাকাণ্ডটি কোনো-এক বর্ষার রাতে ঘটেছিল? কোনো-এক অস্বাভাবিক উপায়ে সেই মুহূর্তটি কি আবার ফিরে এসেছে– আমি দেখছি? ইন্দ্রিয়ের অতীত কোনো একটি দৃশ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে ধরা পড়ছে আমার কাছে।

আমি আমার এই জীবনে কোনো অতিপ্রাকৃতিক বিষয়কে স্থান দেই নি। আজ আমি এটা কি দেখছি?'

ভদ্রলোক এইখানে গল্প শেষ করলেন।

আমি বললাম– 'তারপর? তারপর কি হলো?'

তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আপনাকে একটা ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাচ্ছিলাম, বলা হলো। এর আর তারপর বলে কিছু নেই।'

'আপনি এই দৃশ্যটি দেখলেন, তারপর কি করলেন?'

'আপনি হলে কি করতেন?'

'আমি হলে কি করতাম সেটা বাদ দিন। আপনি কি করেছেন সেটা বলুন।'

'দাঁড়ান, আরও খানিকটা এলকোহল গলায় ঢেলে নেই। তা না হলে বলতে পারব না।'

ভদ্রলোক ঢকঢক করে অনেকখানি কাঁচা হুইস্কি গলায় ঢেলে দিলেন। দেখতে

দেখতে তাঁর চোখ রক্তবর্ণ হয়ে গেল। তিনি স্থির গলায় বললেন– 'আমি সেদিন যা করেছিলাম একজন বুদ্ধিমান যুক্তিবাদী মানুষ তাই করবে– আমি ছুটে গিয়েছিলাম সেখানে। প্রচণ্ড ভয়াবহ কোনো ঘটনার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালে মানুষের ভয় থাকে না। এক জাতীয় এনজাইম শরীরে চলে আসে। তখন প্রচুর গ্লোকুজ ভাঙতে শুরু করে। মানুষ শারীরীয় শক্তি পায়। ভয় কেটে যায়।

আমার কোনো ভয় ছিল না। আমি দ্রুত গেলাম ঐ জায়গায়। কাদায়-পানিতে মাখামাখি হয়ে গেলাম।'

'তারপর কি দেখলেন?'

'কি আর দেখব? কিছুই দেখলাম না। আপনি কি ভেবেছেন গিয়ে দেখব ইয়াকুব তার স্ত্রীর ডেডবডি নিয়ে বসে আছে?'

'না তা ভাবি নি।'

'নেচার বলুন বা ঈশ্বর বলুন বা প্রকৃতি বলুন– এরা কোনোরকম অস্বাভাবিকতা সহ্য করে না। এই জিনিসটি খেয়াল রাখবেন। কাজেই আমি কিছুই দেখলাম না। বৃষ্টিতে ভিজলাম, কাদায় মাখামাখি হলাম, আমার জেদ চেপে গেল। পাশের বাগানের মালিকে ডেকে এনে সেই রাতেই জায়গাটা খুঁড়লাম। কিছুই পাওয়া গেল না।

পরদিন থানায় খবর দিলাম। পুলিশের সাহায্যে আবারও খোঁড়াখুঁড়ি করা হলো। কিছুই পাওয়া গেল না। সবার ধারণা হলো আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমার বাবা খবর পেয়ে এসে আমাকে নিয়ে গেলেন। দীর্ঘদিন ডাক্তারের চিকিৎসায় থেকে সুস্থ হলাম। শুনে অবাক হবেন, এই ঘটনার পর মাসখানিক আমি ঘুমুতে পারতাম না।'

'গল্পটা কি এখানেই শেষ, না আরও কিছু বলবেন?'

'না, আর কিছু বলব না। ভাই আগেই তো বলেছি এটা কোনো ভৌতিক গল্প না। ভৌতিক গল্প হলে দেখা যেত, ইয়াকুব বৌটাকে মেরে ঐখানে কবর দিয়ে রেখেছিল। ভৌতিক গল্প না বলেই ঐটা সত্যি হয় নি। তবে ঐ বাড়ি আমি কিনে নিয়েছি। বর্ষার সময় প্রায়ই ঐখানে একা-একা রাত্রি যাপন করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঐ রাতে ঘটনার অংশবিশেষ আমি দেখেছিলাম। নিজের উপর কনট্রোল হারিয়ে ফেলেছিলাম বলে বাকিটা দেখতে পারি নি। কোনো একদিন বাকিটা হয়তো দেখব। ইচ্ছা করলে আপনিও আমার সঙ্গে যেতে পারেন। আপনি কি যাবেন?

'না– আমার ভূত দেখার কোনো ইচ্ছা নেই– আপনার ঐ মালি, ইয়াকুব নাকি যেন নাম বললেন, ও কি এখনো ঐ বাড়িতে আছে?'

'হ্যাঁ আছে।'

'সে আপনার ঘটনা শুনে কি বলে?'

'এটাও একটা মজার ব্যাপার। সে কিছুই বলে না। হ্যাঁ-ও বলে না, না-ও বলে না। চুপ করে থাকে। ভালো কথা, এতক্ষণ যে আমাদের ড্রিংকস দিয়ে গেল, কাজু বাদাম দিয়ে গেল তার নামই ইয়াকুব। তাকে আমি সব সময় কাছাকাছি রাখি। আপনি কি তার সঙ্গে কথা বলবেন? ইয়াকুব, এই ইয়াকুব ।

ওইজা বোর্ড

প্রায় আট বছর পর নাসরিনের বড় ভাই আলাউদ্দিন দেশে ফিরল। সঙ্গে বিদেশী বউ। বউয়ের নাম ক্লারা। বউয়ের চুল সোনালি, চোখ ঘন নীল, মুখটাও মায়া মায়া। তবু মেয়েটাকে কারোরই পছন্দ হলো না।

যে পরিমাণ আগ্রহ নিয়ে নাসরিন বড় ভাইয়ের জন্যে অপেক্ষা করছিল, ভাইকে দেখে সে ঠিক ততখানি নিরাশ হলো। আট বছর আগে নাসরিনের বয়স ছিল নয়, এখন সতেরো। ন'বছর বয়েসি চোখ এবং সতেরো বছর বয়েসি চোখ এক রকম নয়। ন'বছর বয়েসী চোখ সব কিছুই কৌতূহল এবং মমতা দিয়ে দেখে। সতেরো বছরের চোখ বিচার করতে চেষ্টা করে। তার বিচারে ভাইকে এবং ভাইয়ের বৌকে– দু'জনকেই খারাপ লাগছে।

নাসরিন দেখল, তার ভাই আগের মতো চুপচাপ শান্ত ধরনের ছেলে নয়– খুব হৈচৈ করা শিখেছে। স্ত্রীকে নিয়ে সবার সামনে বেশ আহ্লাদ করছে। ঠোঁট গোল করে 'হানি' ডাকছে। অথচ 'হানি' শব্দটা বলার সময় ঠোঁট গোল হয় না।

আলাউদ্দিন এতদিন পর দেশে এসেছে, আত্মীয়স্বজনদের জন্যে উপহার-টুপহার আনা উচিত ছিল, তেমন কিছুই আনে নি। ভুষভুষা অ্যাশ কালারের একটা স্যুয়েটার এনেছে মা'র জন্যে। সেই স্যুয়েটার নিয়ে কত রকম আদিখ্যেতা– পিওর ওল মা। পিওর ওল আজকাল আমেরিকাতেও এক্সপেনসিভ। মা, তোমার কি কালার পছন্দ হয়েছে?

নাসরিনের একবার বলার ইচ্ছা হলো– অ্যাশ কালারে পছন্দের কি আছে ভাইয়া? অবশ্যি কিছু বলল না। তার মনটাই খারাপ হয়ে গেল। এতদিন পর এসেছ, ভাইয়ার কি উচিত ছিল না মা'র জন্য একটা ভালো কিছু আনা?

বাবার জন্যে এনেছে ক্যালকুলেটর। যে বাবা রিটায়ার করেছে, চোখে দেখতে পায় না, সে ক্যালকুলেটর দিয়ে কি করবে?

নাসরিনের বড় বোন শারমিন তার দুই যমজ মেয়েকে নিয়ে স্যুটকেস খোলার সময় বসে ছিল। এই দু'মেয়েকে আলাউদ্দিন দেখে নি। চিঠি লিখে জানিয়েছে, এই দু'মেয়ের জন্যে একই রকম দুটা জিনিস নিয়ে আসবে যা দেখে দু'জনই মুগ্ধ হবে। দু'জনের জন্যে দুটা গায়ে মাখা সাবান বেরুল। এই সাবান ঢাকার নিউ মার্কেট ভর্তি– আমেরিকা থেকে বয়ে আনতে হয় না।

আলাউদ্দিন বলল, 'বেশি কিছু আনতে পারি নি, বুঝলি? লাস্ট মোমেন্টে ক্লারা ডিসাইড করল আমার সঙ্গে আসবে। অনেকগুলি টাকা বেরিয়ে গেলো। কিছু টাকা সঙ্গেও রাখতে হয়েছে। ঢাকায় হোটেলের বিল কেমন কে জানে?'

নাসরিন বলল, 'হোটেলের বিল মানে? তুমি কি হোটেলে উঠবে?'

'বাধ্য হয়ে উঠতে হবে। এই গাদাগাদি ভিড়ে ক্লারার দম বন্ধ হয়ে আসছে। চট করে তো সব অভ্যাস হয় না। আস্তে আস্তে হয়। তোরা আবার এটাকে কোনো ইস্যু বানিয়ে বসবি না। তোদের কাজই তো হচ্ছে সামান্য ব্যাপারকে কোনো মতে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে ইস্যুতে নিয়ে যাওয়া।'

নাসরিনের চোখে পানি এসে গেল। তার আপন বড় ভাই তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করবে সে স্বপ্নেও ভাবে নি। নাসরিনের চোখের পানি অবশ্যি কেউ দেখতে পেল না। একটু আসছি ভাইয়া বলেই সে চট করে উঠে গেল। বাথরুমে কিছুক্ষণ কাটিয়ে চোখ মুছে উপস্থিত হলো। আলাউদ্দিন তখন স্যুটকেস খুলে আরও কি সব উপহার বেরে করছে। অতি তুচ্ছ সব জিনিস– গাড়ির পেছনে লাগানোর স্টিকার, যেখানে লেকা "Hug your kids." তাদের গাড়ি কোথায় যে তারা গাড়ির পেছনে স্টিকার লাগাবে? কেউ অবশ্যি কিছু বলল না। সবাই এমন ভাব করতে লাগল যে গাড়ির স্টিকারটার খুব প্রয়োজন ছিল।

আলাউদ্দিন বলল, 'নাসরিন, তোর জন্যে তো কিছু আনা হয় নি।'

নাসরিন বলল, 'ভাইয়া, আমার কিছু লাগবে না।'

'তোকে বরং এখান থেকেই শাড়ি-টাড়ি কিছু কিনে দেব।'

'আচ্ছা।'

আলাউদ্দিন স্যুটকেস ঘাঁটতে লাগল। তার ঘাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হয় সে আশা করছে কিছু একটা পেয়ে যাবে, যা নাসরিনকে দিতে পারলে শাড়ির ঝামেলায় যেতে হবে না। নাসরিনের লজ্জার সীমা রইল না।

'এই যে জিনিস পাওয়া গেছে।'

হাসিতে আলাউদ্দিনের মুখ ভরে গেল। সবাই ঝুঁকে পড়ল স্যুটকেসের উপর। লিপস্টিকের মতো একটা বস্তু বেরুল। আলাউদ্দিন বলল– 'নাসরিন নে। এর নাম লিপ গ্লাস। ঠোঁটে দিলে ঠোঁট চকচক করে, ঠোঁট ফাটে না।'

নাসরিন শুকনো গলায় বলল, 'থ্যাংকস ভাইয়া।'

আলাউদ্দিন বিরক্ত গলায় বলল, 'গিফট হচ্ছে গিফট। গিফটের মধ্যে সস্তা-দামি কোনো ব্যাপার না। বাঙালিদের স্বভাব হচ্ছে কোনো উপহার পেলেই হিসাব-নিকাশে বসে যাবে। দাম কত কি!'

নাসরিন বলল, 'আমি কোনো হিসাব করছি না ভাইয়া। লিপ গ্লাসটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে।'

'দ্যাটস গুড। মাই গড– নাসরিন, তোর ভাগ্য ভালো, আরেকটা জিনিস পাওয়া গেছে– ওইজা বোর্ড। এতক্ষণ চোখেই পড়ে নি।'

‘ওইজা বোর্ড আবার কি?’

আলাউদ্দিন লুডু বোর্ডের মতো একটা বোর্ড মেলে ধরল। চারদিকে এ থেকে জেড পর্যন্ত লেখা। মাঝখানে দু'টা ঘর– একটায় লেখা ‘ইয়েস’, একটায় ‘নো।’

‘এটা কি কোনো খেলা ভাইয়া?

‘খেলাই বলতে পারিস। ভূত নামানোর খেলা। প্ল্যানচেটের নাম শুনিস নি? এটা দিয়ে প্ল্যানচেটের মতো করা যায়।’

‘লাল বোতামটা দেখছিস না? দু'জন বা তিনজন মিলে খুব হলকাভাবে তর্জনি দিয়ে এটাকে টাচ করে রাখবি, কোন রকম প্রেসার দেয়া যাবে না। বোতামটাকে রাখবি বোর্ডের ঠিক মাঝখানে। ঘরের আলো কমিয়ে দিবি আর মনে মনে বলবি—If any gocd soul passes by—please come.' তখন আত্মাটা বোতামে চলে আসবে। বোতাম নড়তে থাকবে। তখন কোনো প্রশ্ন করলে আত্মা জবাব দেবে।’

‘কি ভাবে জবাব দিবে?’

‘বোতামটা অক্ষরগুলির উপর যাবে। কোন কোন অক্ষরের উপর যাবে সেটা খেয়াল রাখতে হবে। ভূতটার নাম যদি হয় রহিম, তাহলে প্রথমে যাবে ‘আর’-এর উপর, তারপর ‘এ’-এর উপর, তারপর ‘এইচ’ বুঝতে পারছিস?’

‘বোতামটা আপনাআপনি যাবে?’

‘না, আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে রাখতে হবে।’

‘ভাইয়া, ভূত কি সত্যি সত্যি আসে?’

‘আরে দূর দূর। ভূত আছে নাকি যে আসবে? আমেরিকানদের এটা হচ্ছে পয়সা বানানোর একটা ফন্দি। এত সহজে আত্মা চলে এলে তো কাজই হতো।’

আলাউদ্দিন আমেরিকানদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে মজার মজার গল্প বলতে লাগল। আলাউদ্দিনের মা রাহেলার মনে ক্ষীণ আশা, গল্প যেভাবে জমেছে তাতে মনে হয় না- ছেলে বৌকে নিয়ে হোটেলে যাবে। যদি সত্যি সত্যি যায় তাহলে তিনি মানুষের কাছে মুখ দেখাতে পারবেন না। এম্নিতেই বিদেশি বউয়ের কথায় অনেকেই হাসাহাসি করছে। জামশেদ সাহেবের স্ত্রী গত সপ্তাহে এসে সরু গলায় বললেন– ‘বাঙালি ছেলেরা যে বিদেশে গিয়েই বিদেশিনী বিয়ে করে ফেলে ঐ সব বিদেশিনীগুলি নিচু জাতের। ঝি-জমাদারণি এই সব। ভদ্রলোকের মেয়েরা বাঙালি বিয়ে করতে যাবে কেন? ওদের গরজটা কি?’

রাহেলা ক্ষীণ গলায় বললেন, ‘আপনাকে কে বলেছে?’

‘বলবে আবার কে? এ তো সবাই জানে। বাঙালি ছেলেগুলির সাদা চামড়া দেখে আর হুঁশ থাকে না। ওরা তো প্রথম জানে না যে ঐ দেশের ঝিয়ের চামড়াও সাদা, আবার মেথরনীর চামড়াও সাদা।’

রাহেলা এসব কথার কোনো জবাব দিতে পারেন নি। শুধু শুনে গেছেন। এখন যদি ছেলে বউ নিয়ে হোটেলে চলে যায় তাহলে কি হবে? সবাই তো গায়ে থুথু দিবে।

অবশ্যি তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন ছেলে এবং ছেলের বউয়ের জন্যে একটা ঘর

ভালোমত সাজাতে। নাসরিনের ঘরটাই সাজাতে হয়েছে। দেয়ালে চুনকাম করা হয়েছে। টিউব লাইট লাগানো হয়েছে। একটা ফ্যান ঘরে আছে। সেই ফ্যানে ঘটাং ঘটাং শব্দ হয় বলে নতুন একটা সিলিং ফ্যান কেনা হয়েছে। তারপরেও যদি ছেলে বৌ নিয়ে হোটেলে ওঠে, তিনি কি আর করবেন? তাঁর আর কি করার আছে?

রাতের খাওয়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আলাউদ্দিন বলল, 'আমরা তাহলে উঠি মা।'

রাহেলা ক্ষীণ গলায় বললেন, 'কোথায় যাবি?'

আলাউদ্দিন বিরক্ত গলায় বলল, 'কোথায় যাবি বলো কেন মা? আগেভাগে তো বলেই রেখেছি– একটা ভালো হোটেলে উঠতে হবে। ক্লারা গতরাতে এক ফোঁটা ঘুমায় নি। বেচারি গরমে সিদ্ধ হয়ে গেছে। বাতাস নেই এক ফোঁটা।'

'ফ্যান তো আছে।'

'বাতাস গরম হয়ে গেলে ফ্যানে লাভ কি? তোমরা গরম দেশের মানুষ, ওর কষ্টটা কি বুঝবে? আমি নিজেই সহ্য করতে পারছিলাম না, আরও '

'বউকে নিয়ে হোটেলে গিয়ে উঠলে লোকে নানা কথা বলবে।'

আলাউদ্দিন এই কথায় রাগে জ্বলতে লাগল। হড়বড় করে এমন সব কথা বলতে লাগল যার তেমন কোনো অর্থ নেই।

তার বাবা মনসুর সাহেব, যিনি কখনোই কিছু বলেন না, তিনি পর্যন্ত বলে ফেললেন– 'তুই খামোকা চিৎকার করছিস কেন?'

'আমি খামোকা চিৎকার করছি? আমি খামোকা চিৎকার করছি? আমি শুধু বলছি লোকজনের কথা নিয়ে তোমরা নাচানাচি করো কেন? তোমরা যদি না খেয়ে মরো, লোকজন এসে তোমাদের খাওয়াবে? প্রতি মাসে দেড়শ' ডলারের যে মানি অর্ডারটা পাও সেটা কি লোকজন দেয়? বলো, দেয় লোকজন?'

মনসুর সাহেব দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'যা– যেখানে যেতে চাস।' আলাউদ্দিন তিক্ত গলায় বলল,

'তোমরা যে ভাবছ ছেলে ঘর ছেড়ে হোটেলে চলে যাচ্ছে, কাজেই ছেলে পর হয়ে গেল, এটা ঠিক না।'

'আমরা কিছু ভাবছি না। তুই আর ভ্যাজভ্যাজ করিস না। মাথা ধরিয়ে দিয়েছিস।'

'মাথা ধরিয়ে দিয়েছি? আমি মাথা ধরিয়ে দিয়েছি?'

আট বছর পর ফিরে আসা পুত্রের সঙ্গে দ্বিতীয় রাতেই বাড়ির সদস্যদের খণ্ড প্রলয়ের মতো হয়ে গেল। নাসরিন মনে মনে বলল, বেশ হয়েছে। খুব মজা হয়েছে। আমি খুব খুশি হয়েছি।

ক্লারা ঝগড়ার ব্যাপারটা কিছুই বুঝল না। একবার শুধু ভুরু কুঁচকে বলল, 'তোমরা এত চেঁচিয়ে কথা বলো কেন?' বলেই জবাবের অপেক্ষা না করে বসার ঘরে টিকটিকি দেখতে গেল। বাংলাদেশের এই ছোট্ট প্রাণী তার হৃদয় হরণ করেছে। সে টিকটিকির একুশটা ছবি এ পর্যন্ত তুলেছে। ম্যাকরো লেন্স আনা হয় নি বলে খুব আফসোস ও করছে। ম্যাকরো লেন্সটা থাকলে ক্লোজআপ নেয়া যেত।

খুব সঙ্গত কারণেই গভীর রাত পর্যন্ত এ পরিবারের কোনো সদস্য ঘুমুতে পারল না। বারান্দায় বসে রাহেলা ক্রমাগত অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলেন। এক সময় মনসুর সাহেব বললেন, 'আর কেঁদো না, চোখে ঘা হয়ে যাবে। তোমার ছেলের আশা ছেড়ে দাও। বিদেশী পেত্নী বিয়ে করে ধরাকে সরা দেখছে। হারামজাদা!

নাসরিন আজ ওর ঘরে ঘুমুতে পারছে।

ঘরে ঢুকে তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। কত আগ্রহ করে তারা সবাই মিলে ঘর সাজিয়ে দিয়েছে, তবু ভাইয়ার পছন্দ হলো না। এই ঘরটা কি হোটেলের চেয়ে কম সুন্দর হয়েছে? মাথার পাশে টেবিল ল্যাম্প। পায়ের দিকের দেয়ালে সূর্যাস্তের ছবি। খাটের পাশে মেরুন রঙের বেড সাইড কার্পেট। জানালা খুলে ফুল স্পিডে ফ্যান ছেড়ে দিলে খুব একটা গরম কি লাগে? কই, তার তো লাগছে না। তার তো উল্টো কেমন শীত শীত লাগছে।

সে টেবিল ল্যাম্প জ্বালাল। এত বড় খাটে একা ঘুমুতে কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। ভাইয়া থাকবে না জানলে বড় আপাকে জোর করে রেখে দিত। নাসরিন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। আজ রাতটা তাদের জন্যে খুব খারাপ রাত। আজ রাতে তাদের কারোই ঘুম হবে না। একা-একা জেগে থাকা খুব কষ্টকর।

ভূত নামালে কেমন হয়? ওইজা বোর্ড খুলে সে যদি বোতামটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে বসে থাকে তাহলে কি কিছু হবে? যদি কোন আত্মা চলে আসে ভালোই হয়। আত্মার সঙ্গে গল্প করা যাবে। মুশকিল হচ্ছে, এই আত্মাগুলি আবার কথা বলে না। বোতাম ঠেলে ঠেলে মনের ভাব প্রকাশ করে।

নাসরিন দরজা বন্ধ করে ওইজা বোর্ড নিয়ে বসল। তর্জনি দিয়ে বোতামটা ছুঁয়ে নরম গলায় বলল– আমার আশেপাশে যদি কোনো বিদেহী আত্মা থাকেন তাহলে তাঁদের মধ্যে একজন কি দয়া করে আসবেন? যদি আসেন তাহলে আমার মনটা একটু ভালো হবে। কারণ আজ আমার মনটা খুব খারাপ। কেন খারাপ তা তো আপনারা খুব ভালো করেই জানেন। পুরো ঘটনার সময় নিশ্চয়ই আপনারা আশেপাশে ছিলেন। ছিলেন না? এই পর্যন্ত বলেই নাসরিন চমকে উঠল। ডান হাতটা একটু যেন কাঁপছে।

বোতামটা কি নড়তে শুরু করেছে? অসম্ভব, হতেই পারে না। এ কি! বোতামটা এগিয়ে গেল কিভাবে? নাসরিন নিজেই হয়তো নিজের অজান্তে বোতাম ঠেলে ঠেলে নিয়ে গেছে। খানিকটা ভয় এবং খানিকটা অস্বস্তি নিয়ে নাসরিন অপেক্ষা করছে। হচ্ছেটা কি?

বোতাম 'ইয়েস' লেখা ঘরে কিছুক্ষণ থেমে আবার আগের জায়গায় ফিরে এলো। নাসরিন শব্দ করেই বলল, বাহ্, বেশ মজা তো! পরবর্তী কিছুক্ষণ 'ইয়েস' এবং 'নো' তে বোতাম ঘুরতে লাগল। নাসরিনের শুরুর ভয় খানিকটা কমে গেল। যদিও তখনো বুক ধকধক করছে।

ওইজা বোর্ডে 'ইয়েস' এবং 'নো' ছাড়া আরও দু'টি ঘর আছে। সেগুলি হচ্ছে– 'আমি উত্তর দেব না', 'আমি জানি না'। বোতামটা এই সব ঘরেও মাঝে মাঝে এলো।

প্রশ্ন এবং উত্তর এইভাবে সাজানো যায়।

'আপনি কি এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি এই বাড়িতেই থাকেন?'

'না।'

'আপনি কোথায় থাকেন?'

'আমি উত্তর দেব না।'

'আজ আমাদের সবার খুব মন খারাপ সেটা কি আপনি জানেন?'

'না।'

'কি জন্যে আমাদের মন খারাপ সেটা কি বলব?'

'না।'

'শুধু না-না করছেন কেন। একটু শুনলে কি হয়? বলি?'

বোতামটা ঘুরতে ঘুরতে এক্স ঘরে গিয়ে থামল। নাসরিন বলল, 'এক্স দিয়ে বুঝি কারোর নাম হয়? ঠিক করে নাম বলুন।'

'আমি জানি না।'

'আপনি জানেন না মানে? আপনার কি নাম নেই?'

'না?'

'ভূতদের নাম থাকে না?'

'আমি জানি না।'

'সে কি! আমার তো ধারণা প্রেতাত্মারা সব জানে। আর আমি আপনাকে যা-ই জিজ্ঞেস করছি– আপনি বলছেন, আমি জানি না। আচ্ছা বলুন তো, উনিশকে তের দিয়ে গুণ দিলে কত হয়?'

'আমি জানি না।'

'আমিও জানি না। তবে আপনি যদি বলতেন তাহলে গুণ করে বের করতাম। আপনি কি গুণ অংক জানেন?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, আত্মাদের কি অংক করতে হয়?'

বোতাম এক জায়গায় স্থির হয়ে রইল। উত্তর দিল না। নাসরিন বলল, 'আপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'প্লিজ, আমার উপর রাগ করবেন না। কেউ আমার সাথে রাগ করলে আমার খুব মন খারাপ থাকে। এমনিতেই আজ আমার খুব মন খারাপ। আপনি কি জানেন আমার যে মন খারাপ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন মন খারাপ সেই ঘটনাটা বলি? বলব?'

'হ্যাঁ।'

নাসরিন আজ সারাদিনের ঘটনা বলতে শুরু করল। বলতে বলতে দু'বার কেঁদে ফেলল। তার কাছে একবারও মনে হলো না সে হাস্যকর একটা কাণ্ড করছে। এই সব গল্প বোতামটাকে বলার কোনো মানে আছে?

নাসরিন ঘুমুতে গেল রাত তিনটায়। খুব চৎকার ঘুম হলো। ঘুমিয়ে এত তৃপ্তি অনেকদিন সে পায় নি। তবে ঘুমের মধ্যে সারাক্ষণই মনে হলো একজন বুড় মানুষ তার গায়ে হাত রেখে শুয়ে আছেন। বুড়ো মানুষটার শরীরে চুরুটের কড়া গন্ধ।

২.

ভোর সাতটায় আলাউদ্দিন এসে উপস্থিত।

সে ভোর হতেই বাসায় চলে আসবে, রাহেলা তা ভাবেন নি। আগের রাতের সব দুঃখ তিনি ভুলে গেলেন। হাসিমুখে বললেন, 'বৌমাকে আনলি না?'

'ও ঘুমুচ্ছে। ঘুম ভাঙলে চলে আসবে। নোট লিখে এসেছি।'

'আসতে পারবে একা-একা?

'আসতে পারবে না মানে? কি যে তুমি বলো মা! ও কি আমাদের দেশের মেয়ে যে স্বামী ছাড়া এক পা ফেলতে পারে না?'

'তা তো ঠিকই।'

রাহেলা নাস্তার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আলাউদ্দিনকে এখন অনেক সহজ ও স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। রান্নাঘরে মা'র পাশে বসে অনেক গল্প করতে লাগল। নাসরিন এবং মনসুর সাহেবও গল্পে যোগ দিলেন।'

'তুই তো ঐ দেশেই থেকে যাবি?'

'হ্যাঁ। এই দেশে আছে কি বলো? এই দেশে থাকলে তো মরতে হবে না খেয়ে।'

'অনেকেই তো আছে।'

'কি রকম আছে তা তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'তাও ঠিক।'

'নাসরিন ও সহজভাবে ভাইয়ার সঙ্গে অনেক গল্প করল। এখন ভাইয়াকে খুব আপন লাগছে। কথা বলতে ভালো লাগছে।

'ভাইয়া, কাল ওইজা বোর্ড দিয়ে ভূত এনেছিলাম।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আপনাআপনি বোতাম এক ঘরে থেকে অন্য ঘরে যায়।'

'তুই নিশ্চয়ই ঠেলেছিস।'

'অনেস্ট ভাইয়া। মোটেই ঠেলি নি।'

'তুই না ঠেললেও তোর সাব-কনসাস মাইন্ড ঠেলেছে। আমি নিউজ উইক পত্রিকায় দেখেছিলাম– পুরো ব্যাপারটাই আসলে সাব-কনসাস মাইন্ডের।'

এমন সহজ-স্বাভাবিকভাবে যে মানুষটা গল্প করল, সে-ই আবার ঠিক সন্ধ্যাবেলা একটা ঝগড়া বাঁধিয়ে বসল। সাধারণ ঝগড়া না– কুৎসিত ঝগড়া। ব্যাপারটা এ রকম–

ক্লারা খাবার পানি চেয়েছে।

নাসরিন গ্লাসে করে পানি দিয়েছে। এক চুমুকে সেই পানি খেয়ে ক্লারা বলল–

'থ্যাংকস। খুব ভালো পানি।'

ক্লারা এখন কিছু কিছু বাংলা বলার চেষ্টা করে।

আলাউদ্দিন বলল, 'ফোটানো পানি দিয়েছিস তো? বয়েলড ওয়াটার?'

'না ভাইয়া। টেপের পানি।'

'কেন? তোদেরকে কি আগে বলি নি সব সময় বয়েলড পানি দিবি? পানি ফুটিয়ে পরে বোতলে ভরে রাখবি। সামান্য কথাটা মনে থাকে না? বয়স যত বাড়ছে তোর বুদ্ধি দেখি তত কমছে।'

নাসরিনের মুখ কালো হয়ে গেল।

মনসুর সাহেব মেয়েকে রক্ষা করার জন্যে বললেন, 'একবার মাত্র খেয়েছে, কিচ্ছু হবে না। আমরা তো সব সময় খাচ্ছি।'

'তোমাদের খাওয়া আর ক্লারার খাওয়া এক হলো? মাইক্রো অরগানিজম খেয়ে খেয়ে তোমরা ইমমিউন হয়ে আছ। ও-তো হয় নি।'

'যা হবার হয়ে গেছে। এখন চিৎকার করে আর কি হবে?'

'চিৎকার করছি নাকি? তোমাদের সঙ্গে দেখি সামান্য আর্গুমেন্টও করা যায় না!'

নাসরিন অনেক চেষ্টা করেও কান্না আটকাতে পারল না। মুখে শাড়ির আঁচল গুঁজে দ্রুত বের হয়ে গেল। রাহেলা মৃদু স্বরে বললেন, 'দিলি তো মেয়েটাকে কাঁদিয়ে! ভারী অভিমানী মেয়ে। রাতে তো খাবেই না।'

আলাউদ্দিন বিরক্ত গলায় বলল, 'এত অল্পতেই যদি চোখে পানি এসে যায় তাহলে তো মুশকিল। একটা ভুল করলে আর ভুল ধরিয়ে দেয়া যাবে না।'

'ও ছেলে মানুষ।'

'ছেলে মানুষ কি বলছ? সতেরো-আঠারো বছরে কেউ ছেলে মানুষ থাকে? তোমাদের জন্যে বড় হতে পারে না। তোমরা ছেলে মানুষ বানিয়ে রেখে দাও।'

আলাউদ্দিন রাতে খেল না। বউকে নিয়ে না-কি নিরিবিল কোথাও ডিনার করবে।

নাসরিন সেই রাতে ঘুমুতে গেল না-খেয়ে। অনেকক্ষণ জেগে রইল। ঘুম এলো না। তার খুব কষ্ট হচ্ছে। মরে যেতে ইচ্ছা করছে। অনেক রাতে সে ওইজা বোর্ড নিয়ে বসল। আজ আর দেরি হলো না। বোতামে হাত রাখামাত্র বোতাম নড়তে লাগল। আজ সে উত্তরগুলোও শুধু 'হ্যাঁ' বা 'না' দিয়ে দিচ্ছে না। অক্ষরের উপর ঘুরে ঘুরে– ছোট ছোট শব্দ তৈরি করছে। মজার মজার শব্দ। নাসরিন এই শব্দগুলোতে গুরুত্ব দিচ্ছে না, আবার গুরুত্ব দিচ্ছেও। একবার ভাবছে– এগুলো অবচেতন মনের ইচ্ছা, আরেকবার ভাবছে– হতেও তো পারে। হয়তো সত্যিই কেউ এসেছে। পৃথিবীতে রহস্যময় ব্যাপারটা তো হয়। ক'টা রহস্যের সমাধান আমরা জানি? কি যেন বলেছেন শেক্সপিয়র– There are many things

'আপনি কি এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কাল যিনি এসেছিলেন আজও কি তিনিই এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার নাম?'

'X' 'কি অদ্ভুত নাম! আচ্ছা, আপনি কি জানেন আজ আমার মন কালকের চেয়েও খারাপ?'

'জানি।'

'কি করা যায় বলুন তো?'

'আমি জানি না।'

'আপনি কি জানেন আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার খুব ভালো লাগে?'

'জানি।'

'ভাইয়া বলছিল, এই যে আপনি নানান কথা বলছেন এগুলো আসলে আমার মনের অবচেতন ইচ্ছার প্রতিফলন।'

'হতে পারে।'

'ভাইয়াকে আমার দারুণ পছন্দ।'

'আমি জানি।'

'ঐ পচা মেয়েটা সব নষ্ট করে দিয়েছে। আমার মনে হয় মেয়েটা ডাইনি। ও আশেপাশে থাকলেই ভাইয়া অন্য রকম হয়ে যায়। তখন সবার সঙ্গে ঝগড়া করে।'

'জানি।'

'কি করা যায় বলুন তো?'

'মেয়েটাকে মেরে ফেলো।'

'ছিঃ, কি যে বলেন! মানুষকে মেরে ফেলা যায় না-কি?'

'হ্যাঁ, যায়।'

'কিভাবে?'

'অনেক ভাবে।'

'আপনার কথাবার্তার কোনো ঠিক নেই। আপনি কি করে ভাবলেন আমি একটা মানুষ মারতে পারি?'

'সবাই পারে।'

'আপনি পারেন?'

'না।'

'আপনি পারে না কেন?'

'আমি জানি না।'

'মানুষ মারা যে মহাপাপ এটা কি আপনি জানেন?'

'আমি জানি না।'

'আপনি আসলে কিছুই জানেন না।'

'হতে পারে।'

'তাছাড়া আপনি আরেকটা জিনিস ভুলে যাচ্ছেন– ধরুন, আমি ঐ পচা মেয়েটাকে মেরে ফেললাম, তখন পুলিশ কি আমাকে ছেড়ে দেবে? আমাকে ধরে নিয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে না?'

'তা দিতে পারে।'

'আর ভাইয়ার অবস্থাটা তখন চিন্তা করে দেখুন। কি রকম রাগ সে করবে। টাকা পয়সা দেয়া বন্ধ করে দেবে। আমরা তখন না খেয়ে মারা যাব। বাবার এক পয়সা রোজগার নেই, আমাদের ব্যাংকে টাকা পয়সা নেই। ভাইয়া প্রতি মাসে যে টাকা পাঠায় ঐটা দিয়ে আমরা চলি। ভাইয়া প্রতি মাসে কত পাঠায় বলুন তো?'

'আমি জানি না।'

'একশ' ডলার। একশ' ডলারে বাংলাদেশি টাকায় কত হয় তা জানেন?'

'না।'

'বেশি না, সাড়ে তিন হাজার। মা এবার কি ঠিক করে রেখেছে জানেন? মা ঠিক করে রেখেছে– ভাইয়াকে বলবে আরও কিছু বেশি টাকা পাঠাতে। একশ' ডলারে হচ্ছে না। জিনিসপত্রের যা দাম! আপনাদের তো আর কোনো কিছু কিনতে হয় না। আপনারা আছেন সুখে, তাই না?

'আমি জানি না।'

'আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় ভাইয়া টাকার পরিমাণ বাড়াবে?'

'আমি জানি না।'

'না বাড়ালে আমাদের খুব কষ্টের মধ্যে পড়তে হবে। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, বাড়াবে না। বিয়ে করেছে, খরচ বেড়েছে। তাই না?'

'হতে পারে।'

'টাকা না বাড়ালে কি হবে বলুন তো? আমার আরেক ভাই আছেন– জসিম ভাইয়া। চিটাগাং-এ থাকেন। তার টাকা-পয়সা ভালোই আছে। কিন্তু সে আমাদের একটা পয়সা দেয় না। আমরা যদি না খেয়ে মরেও যাই, সে ফিরেও তাকায় না। কি করা যায় বলুন তো?'

'ক্লারাকে মেরে ফেলা যাক।'

'বারবার আপনি এক কথা বলেন কেন? আপনার কাছে বুদ্ধি চাচ্ছি।'

'ওকে মেরে ফেলাই একমাত্র বুদ্ধি।'

'যান। আপনার সাথে আর কথাই বলব না।'

নাসরিন ওইজা বোর্ড বন্ধ করে ঘুমুতে গেল। আজ আর গতরাতের মতো চট করে ঘুম এলো না। একটু যেন ভয় ভয় করতে লাগল। ওইজা বোর্ড টেবিলের উপর রাখা হয়েছে। তার কাছেই চেয়ার। নাসরিনের কেন জানি মনে হচ্ছে চেয়ারে ঐ মি. এক্স বসে আছেন। বুড়ো ধরনের একজন মানুষ, যার গায়ে চুরুটের গন্ধ। ঐ বুড়ো মানুষটার একটা চোখ ছানিপড়া। গায়ে চামড়ার কোট। সেই কোটেও এক ধরনের ভ্যাপসা গন্ধ।

নাসরিন কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু তার স্পষ্ট মনে হচ্ছে, কেউ একজন আছে। নাসরিন ভয়ে ভয়ে বলল, 'আপনি কি আছেন?' চেয়ার নড়ে উঠল। সত্যি নড়ল? না মনের ভুল? নাসরিন ক্ষীণ স্বরে বলল,

'আপনি দয়া করে বসে থাকবেন না। চলে যান। যখন আপনাকে দরকার হবে আমি ডাকব।'

আবার চেয়ার নড়ল। নিশ্চয়ই মনের ভুল।

নাসরিনের বড় ভয় লাগছে। জুন মাসের এই প্রচণ্ড গরমের রাতেও একটা চাদরে সারা শরীর ঢেকে সে শুয়ে রইল। ঘুম এলো একেবারে শেষ রাতে। তাও গাঢ় ঘুম না আজেবাজে সব স্বপ্ন। একটা স্বপ্ন তো খুবই ভয়ঙ্কর। তার শাড়িতে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। সে অনেক চেষ্টা করছে আগুন নেভাবে। পারছে না। যতই চেষ্টা করছে আগুন আরও ছড়িয়ে পড়ছে। একজন বুড়োমত লোক চুরুট হাতে পুরো ব্যাপারটা দেখছে কিন্তু কিছুই করছে না।

টাকার পরিমাণ বাড়ানোর দাবি রাহেলা অনেক ভণিতার পর করলেন। বলতে তাঁর খুবই লজ্জা লাগল কিন্তু কোনো উপায় নেই।

আলাউদ্দিন তখন চা খাচ্ছিল। চায়ের কাপ নামিয়ে বিস্মিত গলায় বলল, 'টাকা বাড়াতে বলছ?'

'হ্যাঁ।'

'একশ' ডলারে তোমাদের হচ্ছে না?'

'না।'

'তোমরা কি পাগল-টাগল হয়ে গেলে? আমেরিকায় কি আমি টাকার চাষ করেছি? ট্রাক্টার দিয়ে জমি চষে টাকার চারাগাছ বুনে দিচ্ছি?'

রাহেলা ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'সংসার অচল।'

'সংসার তো আমারটা আরও বেশি অচল। বিয়ে করেছি– নতুন সংসার। অ্যাপার্টমেন্ট নিয়েছি। একটা জিনিস নেই অ্যাপার্টমেন্টে। ক্লারা অফিস করে, তার একটা আলাদা গাড়ি দরকার। তোমাদের টাকা তো বাড়াতে পারবই না বরং কিছু কমিয়ে দেব বলে ভাবছি।'

'আমাদের চলবে কিভাবে?'

'জসিম ভাইকে বলো। তারও তো কিছু দায়িত্ব আছে। সে তো গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরছে।'

রাহেলা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। আলাউদ্দিন বিরক্ত স্বরে বলল, 'এরকম ঘনঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলবে না মা। নিশ্বাস ফেলে সমস্যার সমাধান হয় না।'

৩.

নাসরিন ওইজা বোর্ড নিয়ে বসেছে। রাত প্রায় দুটো। আজ অন্য দিনের মতো গরম নয়। সন্ধ্যাবেলায় তুমুল বর্ষণ হয়েছে। আকাশ মেঘলা। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আবারও হয়তা বৃষ্টি হবে। বৃষ্টির ছাট আসছে বলে জানালা বন্ধ।

'আপনি কি আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমাদের কি বিপদ হয়েছে শুনেছেন?'

'না।'

'ভাইয়া টাকা-পয়সা বেশি তো পাঠাবেন না, বরং আরও কমিয়ে দিয়েছে।'

'ও আচ্ছা।'

'কি করব আমরা বলুন তো?'

'মেয়েটাকে মেরে ফেলো।'

'এইটা ছাড়া বুঝি আপনার মাথায় আর বুদ্ধি নেই।'

'না। এটা সবচে' ভালো বুদ্ধি।'

'আপনার সঙ্গে আমার কথা বলতেই ইচ্ছা করছে না।'

'শুনে দুঃখিত হলাম।'

'আচ্ছা, ঐদিন আপনি আমাকে ভয় দেখালেন কেন? আপনি কি ঐ চেয়ারটায় বসে ছিলেন? আমার মনে হয় আপনি এখনো চেয়ারটায় বসে আছেন।'

'ক্লারাকে আগুনে পুড়ে মারলে কেমন হয়?'

'আপনি আজেবাজে কথা বলবেন না তো। আচ্ছা বলুন তো, ঐদিন কি আপনি চেয়ারে বসে ছিলেন?'

'তুমি একটু সাহায্য করলেই হয়।'

'কি সাহায্য?'

'যখন আগুন জ্বলে উঠবে তখন এই ঘরের দরজা তুমি বাইরে থেকে বন্ধ করে দেবে।'

'আপনার কথাবার্তার আগামাথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আগুন লাগার পর মেয়েটা যাতে বেরুতে না পারে।'

'কি বলছেন আপনি?'

'আগুন লাগার পর সে ছুটে বের হতে চাইবে। তখন তাকে শুধু আটকানো। অল্প কিছুক্ষণ আটকে রাখা।'

'চুপ করুন তো।'

'ভালো বুদ্ধি দিচ্ছি।'

'আপনার বুদ্ধি চাই না।'

'তুমি আমার বন্ধু।'

'না, আমি আপনার বন্ধু নই।'

আজ রাতে নাসরিন এক পলকের জন্যেও চোখ এক করতে পারল না। মনে মনে ঠিক করে ফেলল ওইজা বোর্ডটা ভোর হতেই আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলবে। কি সর্বনাশের কথা! বোতামটা এমন অদ্ভুত কথা বলছে কেন?

৪.

আগামীকাল রাত দু'টার ফ্লাইটে আলাউদ্দিন চলে যাবে। শেষ রাতটা এ বাড়িতে থাকবার জন্যে এসেছে, দীর্ঘদিন হোটেলে থাকায় তাকে বেশ লজ্জিতও মনে হচ্ছে। আজ রাতটা থাকতে তেমন কষ্ট হবে না। বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে। আবহাওয়া অসহনীয় নয়। ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে।

আলাউদ্দিন বসার ঘরে সবার সঙ্গে গল্প করছে। গল্প বেশ জমে উঠেছে। প্রথমদিকে আমেরিকায় সে কি সব বিপদে পড়েছিল তার গল্প। প্রতিটি গল্পই আগে অনেকবার করে শোনা, তুব সবাই খুব আগ্রহ করে শুনছে।

ঘরে ইলেকট্রিসিটি নেই। বিকেলে ঝড়বৃষ্টির সময় ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়েছে, এখনো আসে নি। আজ রাতে আর আসবে বলে মনে হয় না। ঝড়বৃষ্টি এখনো হচ্ছে। বাতাসের শোঁ-শোঁ, বৃষ্টির ঝমঝমানি, দমকা হাওয়ার ঝাপ্টা-চমৎকার পরিবেশ।

একটি মাত্র হারিকেন, সেটা বসার ঘরে। হারিকেন ঘিরে সবাই বসে আছে।

ক্লারা ওদের গল্পে কোনো মজা পাচ্ছিল না, ঘনঘন হাই তুলছিল। মাঝরাতে সে ঘুমুতে গেল। নাসরিন তার ঘরে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেল।

দুর্ঘটনা ঘটল তারও মিনিট দশেক পর, গল্প তখন খুব জমে উঠেছে। শুরু হয়েছে ভূতের গল্প। রাহেলা ছোটবেলায় নিশির ডাক শুনে ঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়েছিলেন, সেই গল্প হচ্ছে। গা ছমছমানো পরিবেশ। ঠিক তখন তীক্ষ্ণ গলায় নাসরিন বলল,

ঘর এত আলো হয়ে গেছে কেন ভাইয়া? তার কথা শেষ হবার আগেই শোনা গেল গোঙানি ও চিৎকার। দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে এবং ক্লারা চেঁচাচ্ছে– Oh god! Oh God!

সবাই ছুটে গেল শোবার ঘরের দিকে। দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে।

দুর্ঘটনা তো বটেই। দুর্ঘটনা ছাড়া কিছুই নয়। বাতাসে মোমবাতি কাত হয়ে পড়ে গিয়েছিল নেটের মশারিতে। সেখান থেকে ক্লারার নাইট গাউনে। সিনথেটিক কাপড়– মুহূর্তের মধ্যে জ্বলে উঠল। খুবই সহজ ব্যাখ্যা। শুধু একটি ব্যাপার ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। ক্লারার ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ ছিল। কেউ একজন বাইরে থেকে শিকল তুলে দিয়েছিল। আগুন লেগে যাবার পর ক্লারা প্রাণপণ চেষ্টা করেছে ঘর থেকে বেরুতে। বেরুতে পারে নি। চিৎকার করে দরজা খুলতে বলেছে– ঝড়বৃষ্টি এবং বজ্রপাতের সঙ্গে তার চিৎকারও কেউও শুনে নি। ব্যাকুল হয়ে শেষ মুহূর্তে সে ঈশ্বরকে ডাকছিল। ঈশ্বর মানুষের কাতর আহ্বানে সাধারণত বিচলিত হন না।

সে

আমার ছোট মেয়ের গলায় মাছের কাঁটা ফুটেছিল।

মাছের কাঁটা যে এমন যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার তা জানা ছিল না। বেচারি ক্রমাগত কাঁদছে। কিছুক্ষণ পরপর বমি করছে, হেঁচকি উঠছে। চোখ-মুখ ফুলে একাকার। আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম।

অনেক ধরনের লৌকিক চিকিৎসা করানো হলো। শুকনো ভাতের দলা গেলানো, মধু খাওয়ানো, গলায় সেঁক। এক পর্যায়ে আমাদের কাজের মেয়েটি বলল, একটা বিড়াল এনে তার পায়ে ধরলে কাঁটা চলে যাবে। গ্রামদেশে না-কি এইভাবে গলার কাঁটা দূর করা হয়।

বিপদে মানুষের মাথার ঠিক থাকে না। হাতের কাছে বেড়াল থাকলে হয়তো-বা বেড়াল চিকিৎসাও করাতাম। ডাক্তারের কথা একবারও মনে হয় নি। কারণ, মনে হলেও লাভ হতো না। আটচল্লিশ ঘণ্টার হরতাল চলছে। ঢাকা শহর অচল। পুলিশের সঙ্গে জনতার কিছু কিছু খণ্ড সংঘর্ষ হচ্ছে বলেও খবর আসছে। দুটি পেট্রোল পাম্পে না-কি আগুন লাগানো হয়েছে। কয়েকজন মারাও গেছে। শহরভর্তি গুজব। শোনা যাচ্ছে, এরশাদ সরকারের পতন হয়েছে। তিনি তাঁর প্রিয় গলফ্ সেট বিক্রি করে দিয়েছেন। একটা হেলিকপ্টার নাকি বঙ্গভবনে রেডি অবস্থায় আছে।

এই অবস্থায় মেয়ে কোলে নিয়ে রাস্তায় নামলাম। মেয়ে একটু পরপর কান্না থামিয়ে জিজ্ঞেস করছে– বাবা আমি কি মরে যাচ্ছি?

সাত বছরের মেয়ে এই জাতীয় প্রশ্ন করলে বুক ভেঙে যায়। আমার নিজেরো চোখে পানি এসে গেল।

যখন প্রয়োজন থাকে না তখন মোড়ে মোড়ে ফার্মেসি দেখা যায়। সেই সব ফার্মেসিতে গম্ভীর মুখে ডাক্তার বসে থাকেন। আজ কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কোনো ফার্মেসি খোলা নেই। দু'জন ডাক্তারের বাসায় গেলাম– একজন বাসায় ছিলেন না, অন্যজন মেয়েকে না দেখেই বললেন, 'মেডিক্যালে নিয়ে যান।'

মেডিক্যালেই নিয়ে যেতাম, তবু কেন জানি সাইনবোর্ড দেখে দেখে তৃতীয় একজন ডাক্তার খুঁজে বের করলাম। ইনি তিনতলায় থাকেন। সাইবোর্ডে লেখা– 'স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ'। গলায় কাঁটা ফোটা নিশ্চয়ই স্ত্রীরোগ নয়, তবু গেলাম যদি কিছু করতে পারেন।

ডাক্তারের নাম হাসনা বানু। ছোটখাটো মানুষ। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। ভদ্রমহিলার মধ্যে মাতৃভাব অত্যন্ত প্রবল। একদল মানুষ আছে যাদের দেখলেই আপনজন মনে হয়। প্রথম দর্শনেই তাঁকে এরকম মনে হলো। তিনি আমার মেয়েকে চেয়ারে বসিয়ে হাঁ করালেন। গলায় টর্চের আলো ফেলে চিমটা দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে এক ইঞ্চি লম্বা একটা কাঁটা বের করে ফেললেন। অতি কোমল গলায় বললেন, 'মা-মণি, ব্যথা কমেছে?'

আমার মেয়ে চুপ করে রইল। সে বোধ হয় তখনো ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছে না। ডাক্তার হাসনা বানু বললেন, 'কি মেয়ে, আমার সঙ্গে কথা বলবে না?'

আমার মেয়ে হেসে ফেলল।

'এখন বলো তুমি কি খাবে। আইসক্রিম খাবে? দেব একটু আইসক্রিম?'

'ভ্যানিলা আইসক্রিম থাকলে খাব।'

আমার কেন জানি মনে হচ্ছে ভ্যানিলা আইসক্রিম আছে।

ভদ্রমহিলার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে গেল। আমি তাঁকে চিকিৎসার জন্যে কিছু টাকা দিতে গেলাম। তিনি শান্ত গলায় বললেন, 'ডাক্তারি যখন করি তখন চিকিৎসার টাকা তো নেবোই কিন্তু তাই বলে বাচ্চা একটা মেয়ের গলার কাঁটা বের করারও ফি দাবি করব এটা কি করে ভাবলেন? কাঁটাটা বের করার পর আপনার মেয়ের হাসি আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন। এ হাসির দাম লক্ষ টাকা। তাই না?'

মিসেস হাসনা বেগমের সঙ্গে এই হচ্ছে আমার পরিচয়ের সূত্র। পরিচয় দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। তিনি নিউক্লিয়ার মেডিসিনে গবেষণায় একটি বৃত্তি নিয়ে আমেরিকায় জন হফকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাবার পর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এখন যে গল্পটি বলব সেটি তাঁর কাছে শোনা। যেভাবে শুনেছি অবিকল সেভাবে গল্পটি বলার চেষ্টা করছি।

মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করে বেরুবার পরপর আমি একটি ক্লিনিকে চাকরি নেই। এখন যেমন চারদিকে ক্লিনিকের ছড়াছড়ি তখন তেমন ছিল না। অল্প কয়েকটি ক্লিনিক ছিল– সবই মাতৃসদন। আমি যে ক্লিনিকে চাকরি নেই সেটা সেই সময়ের খুব নামী ক্লিনিক। ধনী পরিবারের মারাই শুধু আসতেন। সুযোগ-সুবিধা ভালো ছিল। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিমছাম ক্লিনিক। সর্বসাকুল্যে পনেরোটি বেড ছিল। দশটি 'এ' ক্যাটাগরির, পাঁচটি 'বি' ক্যাটাগরির। 'এ' ক্যাটাগরির ঘরগুলোতে এয়ারকুলার বসানো ছিল। আমরা ডাক্তার ছিলাম তিনজন। প্রধান ডাক্তার মেডিক্যাল কলেজের একজন অধ্যাপক। আমি এবং নাসিমা– আমরা দু'জন সদ্য পাস-করা ডাক্তার। অবশ্যি সব কাজ আমরা দু'জনই দেখতাম। যেহেতু ছোট ক্লিনিক, আমাদের কোনো অসুবিধা হতো না। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে আমাদের ক্লিনিকে আঠারো-উনিশ বছরের একটি মেয়ে ভর্তি হলো। প্রথম মা হতে যাচ্ছে। ভয়ে অস্থির। আমি প্রাথমিক পরীক্ষা করে দেখলাম এখনো অনেক দেরি। একেকটা কনট্রেকশানের ভেতর গ্যাপ অনেক বেশি। আমি তাঁকে আশ্বস্ত করলাম। বললাম, 'ভয়ের কিছু নেই।'

মেয়েটি করুণ গলায় বলল, 'তুমি তো বাচ্চা মেয়ে! তুমি পারবে? তুমি জানো সব কিছু?'

আমি হেসে ফেললাম। হাসতে হাসতেই বললাম, 'আমি বাচ্চা নই। তাছাড়া আমি একজন খুব ভালো ডাক্তার। আপনার কোনো ভয় নেই। আমি ছাড়াও এখানে ডাক্তার আছেন। একজন প্রফেসর আছেন। তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাকে দেখবেন।'

রোগিনী বললেন, 'ভাই, তোমাকে তুমি করে বলেছি বলে রাগ করো নি তো?'

'না।'

'আমার এমন বদঅভ্যাস যাকে পছন্দ হয় তাকেই তুমি বলে ফেলি।'

আমি কাগজপত্র ঠিকঠাক করবার জন্য ভদ্রমহিলার স্বামীকে নিয়ে অফিসে চলে এলাম। দেখা গেল, খুবই ক্ষমতাবান পরিবারের বউ। সাত-আটটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। হোমড়া-চোমড়া ধরনের কিছু মানুষ বিরক্ত মুখে হাঁটাহাঁটি করছে। একজন অতি বিরক্ত গলায় বলছে, 'আপনাদের ব্যবস্থা তো মোটেই ভাল না। ইমার্জেন্সি হলে পেশেন্টটাকে আপনারা কি করবেন? এখানে কি অপারেট করার ব্যবস্থা আছে?'

'জি আছে।'

'আপনাদের নিজস্ব জেনারেটর আছে? ধরুন, হঠাৎ, যদি ইলেকট্রিসিটি চলে যায়, তখন? তখন কি করবেন? মোমবাতি জ্বালিয়ে তো নিশ্চয়ই অপারেশন হবে না?'

লোকগুলি আমাদের বিরক্ত করে মারল। দাড়িওয়ালা এক ভদ্রলোক বললেন, 'আপনাদের এখান থেকে আমরা বেশকিছু টেলিফোন করব। দয়া করে বিরক্ত হবেন না। সব পেমেন্ট করা। 'মানি উইল নট বি এ প্রবলেম।'

রোগিনী ভর্তি হয়েছেন বিকেলে। রাত ন'টা বাজার আগেই স্রোতের মতো মানুষ আসতে লাগল। অনেকের হাতে ফুলের গুচ্ছ। অনেকর হাতে উপহারের প্যাকেট– বিশ্রী অবস্থা।

আমি সহজে ধৈর্য হারাই না। আমারও শেষ পর্যন্ত মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। আমি বললাম, 'আপনারা কি শুরু করেছেন? এটাকে একটা বাজার বানিয়ে ফেলেছেন। দয়া করে ভিড় পাতলা করুন। একজন শুধু থাকুন। ডেলিভারি হোক, তখন আসবেন।'

আমার কথায় একজন ভদ্রমহিলা, সম্ভবত মেয়ের শাশুড়ি হবেন, চোখ-মুখ লাল করে বললেন, 'আপনি কি জানেন এই মেয়ে কোন বাড়ির বউ?'

আমি বললাম, 'আমি জানি না। আমি জানতেও চাই না। সে আমার পেশেন্ট– এটুকু শুধু জানি। আর দশটা পেশেন্টকে আমি যেভাবে দেখব তাকেও একইভাবে দেখা হবে।'

'আর দশটা বউ এবং আমার ঘরের বউ এক?'

'আমার কাছে এক?'

'জানো আমি এই মুহূর্তে তোমার চাকরি খেতে পারি?'

আমি শীতল গলায় বললাম, 'আপনি আমার চাকরি খেতে পারেন না। চিকিৎসক হিসেবে আমার কোনো ব্যর্থতা পাওয়া গেলে তবেই চাকরি যেতে পারে। তার আগে নয়। আপনি শুধু শুধুই চেঁচামেচি করছেন।'

ভদ্রমহিলা রেগে গিয়ে– স্কাউনড্রেল, লোফার এইসব বলতে লাগলেন। একজন ভদ্রমহিলা এমন কুৎসিত ভাষায় কথা বলতে পারেন আমার জানা ছিল না। বিরাট হৈচৈ বেধে গেল। আমাদের প্রফেসর এলেন। ভেবেছিলাম তিনি আমার পক্ষে কথা বলবেন। তা বললেন না। আমার উপর অসম্ভব রেগে গেলেন। আমাকে অবাক করে দিয়ে সবার সামনে উঁচু গলায় বললেন, 'হাসনা, তোমাকে এখানে চাকরি করতে হবে না। ইউ ক্যান লিভ।'

আমি আমার নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। আমার প্রফেসর জানেন কত আগ্রহ, কত যত্ন নিয়ে আমি এখানে কাজ করি। অথচ তিনি....

আমি রিকশা নিয়ে বাসায় চলে এলাম। সহজে চোখে পানি আসে না। কিন্তু রিকশায় ফিরবার পথে খুব কাঁদলাম। তখন বয়স অল্প। মন ছিল খুব স্পর্শকাতর।

রাত এগারোটায় প্রফেসর আমাকে নিতে এলেন। করুণ গলায় বললেন, 'হাসনা, খুব কেলেংকারী হয়ে গেছে। তুমি চলে আসার পর ক্লিনিকের কেউ কোনো কাজ করছে না। অসহযোগ আন্দোলন। এ রকম যে দাঁড়াবে কল্পনা করি নি। এখন তুমি চলো।'

আমি বললাম, 'স্যার, আমার যাবার প্রশ্নই ওঠে না। আপনি রোগীর আত্মীয়দের বলুন তাকে অন্য কোনো ক্লিনিকে নিয়ে যেতে।'

'বলেছিলাম। পেশেন্ট যাবে না। সে এখানেই থাকবে।'

'এখানেই থাকবে?'

'হ্যাঁ, এখানেই থাকবে। এবং সে বলে দিয়েছে, ডেলিভারির সময় তুমি ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকতে পারবে না। এখন তুমি যদি না যাও আমার খুব মুশকিল হবে। আমি খুব বিপদে পড়ব। তুমি তো বাইরের জগতের কোনো খোঁজখবর রাখো না। যদি রাখতে তাহলে বুঝতে এই মেয়ে কোন পরিবারের মেয়ে। বাংলাদেশের মতো দেশে এরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। তুমি চলো।

'স্যার, আমি যাব না। ওরা যা ইচ্ছে করুক।'

'হাসনা, অন্য সবকিছু বাদ দাও। তুমি পেশেন্টের দিকে তাকাও। সে তোমার উপর নির্ভর করে আছে। আমার উপর তোমার রাগটা বড়, না পেশেন্টের প্রতি তোমার দায়িত্ব বড়?'

আমি শাল গায়ে বের হয়ে এলাম। ক্লিনিকে তখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। ওয়েটিং রুমে তিনজন শুধু বসে আছেন। রোগিনীর কাছে দু'জন। দু'জনের একজন রোগিনীর শাশুড়ি। তিনি আমাকে দেখেই শীতল গলায় বললেন, 'রাগের মাথায় কি সব বলেছি কিছু মনে রেখো না মা। রাগ উঠলে আমার মাথা ঠিক থাকে না।'

আমি বললাম, 'আমি কিছু মনে রাখি নি।'

'বৌমা তখন থেকে বলছিল সে তোমাকে যেন কি বলতে চায়। তুমি ওর কথাটা শোনো। ও-খুব ভয় পেয়েছে।'

আমি মেয়েটির পাশে এসে দাঁড়ালাম।

মেয়েটি ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আপনারা ঘর থেকে যান মা। আমি ওর সঙ্গে একা কথা বলব। আর কেউ যেন না থাকে।'

ভদ্রমহিলা দু'জন অনিচ্ছার সঙ্গে ঘর ছেড়ে গেলেন। মেয়েটা বলল, 'ভাই, তুমি দরজটা বন্ধ করে দাও।'

'তার কি দরকার আছে?'

'আছে, তুমি লক করো। তোমার সঙ্গে আমার খুব জরুরি কথা আছে। দরজা বন্ধ করে তুমি আমার পাশে এসে বসো।'

আমি তাই করলাম। কনট্রেকশানের সময় কমে এসেছে। ব্যথার ধকল সামলাতে মেয়েটির খুবই কষ্ট হচ্ছে। তার গলার স্বর পাল্টে গেছে। মনে হচ্ছে সে অনেক দূর থেকে কথা বলছে। সে আমার হাত ধরে বলল, 'ভাই, তোমার কি রাগ কমেছে?'

'হ্যাঁ কমেছে।'

'তুমি আমার গায়ে হাত দিয়ে বলো যে তোমার রাগ কমেছে।'

আমি তার কপালে হাত রেখে বললাম, 'আমার রাগ কমেছে।'

'আমি তোমাকে তুমি তুমি করে বলছি বলে রাগ করছ না তো? তুমি নিশ্চয়ই বয়সে আমার বড়।'

'আমি মোটেই রাগ করি নি।'

'আমি সবাইকে তুমি তুমি বলি না। যাদের আমার খুব প্রিয় মনে হয় খুব আপন মনে হয় তাদেরকে আমি তুমি বলি। তোমাকে প্রথম দেখেই আমার ভালো লেগেছে। তুমিও কিন্তু আমাকে তুমি বলবে।'

'কথা বলতে তোমার কষ্ট হচ্ছে। তুমি বরং চুপ করে থাকো। বড় বড় করে নিশ্বাস নাও। আমার মনে হয় তোমার প্লাসেন্টা ভাঙতে শুরু করেছে।'

'আর কত দেরি?'

'এখনো দেরি আছে। রাত তিনটার আগে কিছু হবে না। রাত তিনটা পর্যন্ত তোমাকে কষ্ট করতে হবে।'

'এখন ক'টা বাজে?'

'বারোটা একুশ।'

'মনে হচ্ছে ঘড়ি চলছেই না।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। কিছু রুটিন কাজ আছে। এগুলো সারতে হবে। নরম্যাল ডেলিভারি হবে, বাচ্চার পজিশন ঠিক আছে। তবু ইমার্জেন্সির জন্যে তৈরি থাকা ভালো।

মেয়েটি বলল, 'যে জন্যে তোমাকে বসিয়েছিলাম তা এখনো বলি নি। তুমি বসো। উঠে দাঁড়ালে কেন? আসল কথা তো বলি নি।'

আমি বসলাম।

মেয়েটি ফিসফিস করে বলল, 'ওরা আমার বাচ্চাটিকে মেরে ফেলবে।'

আমি চমকে উঠলাম। এই মেয়ে এসব কি বলছে! প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আবোল-তাবোল বকছে না তো?

'আমি জানি ওরা আমার বাচ্চাটিকে মেরে ফেলবে।'

'কারা?'

'আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। ডাক্তার, নার্স সবাইকে টাকা দিয়ে কিনে ফেলেছে। তোমাকেও কিনবে। তারপর বাচ্চাটাকে মারবে।'

'তুমি এসব কি বলছ? ওরা বাচ্চাটাকে মারবে কেন?'

মেয়েটি জবাব দিল না। ব্যথার প্রবল ঝাপ্টা সামলাবার চেষ্টা করল। আমি তাকে সময় দিলাম। আমার মনে হলো মেয়েটা সম্ভবত পুরোপুরি সুস্থ নয়। হয়তো কিছু অস্বাভাবিকতা তার মধ্যে আছে।

'তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না, তাই না?'

'না।'

'যা সত্যি তাই আমি বললাম।'

'তুমি জানলে কি করে– ওরা বাচ্চাটিকে মেরে ফেলতে চায়?'

'আমাকে বলেছে।'

'কে বলেছে?'

'আমার বাচ্চাটা আমাকে বলেছে।'

আমি পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হলাম মেয়েটার মাথা খারাপ। সম্ভবত সে পারিবারিক জীবনে খুব অসুখী। শ্বশুরবাড়ির কাউকে তার পছন্দ না। সবাইকে সে শত্রুপক্ষ ধরে নিয়েছে। মেয়েটি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'তুমি আমার কথা এক বর্ণও বিশ্বাস করো নি, তাই না?'

'তুমি ঠিকই ধরেছ। বিশ্বাস করার কথা না। তোমার বাচ্চা তোমাকে কি করে বলবে?'

'ও আমাকে স্বপ্নে বলেছে। একবার না, অসংখ্যবার বলেছে।'

'স্বপ্নে বলেছে!'

'হ্যাঁ, স্বপ্নে। গতকাল শেষ রাতেও স্বপ্নে দেখেছি।'

'কি দেখেছ?'

'দেখলাম আমার বাচ্চাটা আমাকে বলছে– মা, সবাই মিলে আমাকে মেরে ফেলবে। সবাই যুক্তি করে আমাকে মারবে। মা, আমি কি করি?'

বলতে বলতে মেয়েটি থরথর করে কাঁপতে লাগল।

আমি তাকে বললাম, 'প্রথমবার যেসব মেয়ে কনসিভ করে তাদের প্রায় সবাই ভয়ঙ্কর সব স্বপ্ন দেখে। যেমন– তারা মারা যাচ্ছে, মৃত বাচ্চা হচ্ছে– এইসব। এর কোনো মানে নেই। মেয়েরা সেই সময় খুব আতঙ্কগ্রস্ত থাকে বলেই এ রকম স্বপ্ন দেখে।'

'আমি জানি, আমি যা স্বপ্নে দেখেছি তাই হবে। আমার স্বপ্ন অন্য মেয়েদের স্বপ্নের মতো নয়। সবাই যুক্তি করে আমার ছেলেটাকে মারবে।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'তোমার কোলে যখন ফুটফুটে একটা বাচ্চা দিয়ে দেব তখন তুমি বুঝবে যে কত মিথ্যা সন্দেহ তোমার মধ্যে ছিল।'

মেয়েটার চোখ চিকচিক করতে লাগল। সে গাঢ় স্বরে বলল, 'সত্যি তুমি তাই করবে?'

'অবশ্যই।'

'তাহলে তুমি প্রতিজ্ঞা করো। কোরান শরীফ ছুঁয়ে বলো, তুমি বাচ্চাটাকে মারবে না। ওরা যখন মারতে চাইবে তুমি মারতে দেবে না। তুমি ফেরাবে।'

'একটা শিশুকে আমি খুন করব এটা তুমি কি বলছ?'

'তুমি কোরান ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করো।'

'কোরান শরীফ এখানে পাব কোথায়?'

'আমার সঙ্গে আছে। আমার ঐ কালো ব্যাগটার ভেতর। আমি নিয়ে এসেছি।'

রোগীকে শান্ত করবার জন্যেই প্রতিজ্ঞা করতে হলো। রোগী শান্ত হলো না। তার অস্থিরতা আরও বেড়ে গেল। সে চাপা গলায় বলল, 'আমি জানি তুমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারবে না। যদি না রাখো তাহলে আমার অভিশাপ লাগবে। আমি তোমাকে একটা কঠিন অভিশাপ দিচ্ছি।'

মেয়েটি সত্যি সত্যি একটা কঠিন অভিশাপ দিয়ে বসল। মেয়েটার মাথার যে ঠিক নেই, সে যে অসুস্থ একটি মেয়ে তার আরেকটি প্রমাণ পেলাম। তবে তার এই অসুস্থতা, এই মানসিক যন্ত্রণা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। একটি হাসি-খুশি শিশু তার সমস্ত কষ্ট ভুলিয়ে দেবে।

সব কিছুই ঠিকঠাক মতো চলছিল।

রাত দুটায় বাইরের দু'জন পুরুষ, ডাক্তার এলেন। ডেলিভারির সময় এরা থাকবেন। এঁদের মধ্যে একজন আমার পরিচিত। ডাক্তার সেন। বড় ডাক্তার এবং ভালো ডাক্তার।

আমাদের রোগিনী নতুন ডাক্তার দুজন দেখেই আতঙ্কে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আমার হাত ধরে ফিসফিস করে বলল, 'এরা কারা? এরা আমার বাচ্চাকে খুন করবে।'

আমি বললাম, 'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো– আমি সারাক্ষণ এখানে থাকব। এক সেকেন্ডের জন্যে নড়ব না। তাছাড়া ডাক্তার সেনকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। তাঁর মতো ডাক্তার কম আছে।'

'মনে থাকে যেন তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ।'

'আমার মনে আছে।'

'প্রতিজ্ঞা ভাঙলে আমার অভিশাপ লাগবে।'

'আমার মনে আছে।'

তার কিছুক্ষণ পরই ভদ্রমহিলার স্বামী আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। খুবই অল্পবয়স্ক একজন যুবক। তাকে বেশ ভদ্র ও বিনয়ী মনে হলো। তবে যে কোনো কারণেই হোক তাকে বেশ ভীত বলে মনে হচ্ছিল। ভদ্রলোক নরম স্বরে বললেন, 'আপা, আমার স্ত্রী সম্ভবত আপনাকে কিছু বলেছে। আপনি ওর কথায় কিছু মনে করবেন না। ও এসব কেন যে বলছে কিছু বুঝতে পারছি না। আমাদের বাচ্চাটা সংসারের প্রথম সন্তান। আমি আমাদের পরিবারের বড় ছেলে অথচ ওর ধারণা

আমি ভদ্রলোককে আশ্বস্ত করবার জন্যে বললাম, 'আপনি এসব নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাবেন না।'

'সব ঠিকঠাক আছে তো আপা?'

'সব ঠিক আছে।'

'সিজারিয়ান লাগবে না?'

'না- নরম্যাল ডেলিভারি হবে। তাছাড়া ডাক্তার সেন এসেছেন। উনি খুবই বড় ডাক্তার এবং হাইলি স্কিলড।'

'তাহলে আপনি বলছেন সব ঠিকঠাক হবে?'

'হ্যাঁ।'

রাত তিনটার পর থেকে দেখা গেল সব কেমন বেঠিক চলছে। বাচ্চা নেমে এসেছে বার্থ চ্যানেলের মুখে। এই সময় ডাক্তার সেন বললেন, 'বাচ্চার পজিশন তো ঠিক নেই। মাথা উপরের দিকে। এতক্ষণ তোমরা কি মনিটর করছ?'

আমিও দেখলাম- তাই। এরকম হওয়ার কথা নয়। কিছুক্ষণ আগেই সব পরীক্ষা করা হয়েছে। আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে লাগল। এই সময় এত রক্তপাতের কোনোই কারণ নেই। টকটকে লাল রঙের রক্ত- যা ধমনি থেকে আসছে। সমস্যাটা কোথায়?

ব্লাড ক্রস ম্যাচিং করা ছিল- রক্ত দেয়া শুরু হলো, কিন্তু এটা সমস্যার কোনো সমাধান নয়। মনে হলো রোগিনী বাইরের রক্ত ঠিক গ্রহণ করতে পারছে না।

ডাক্তার সেন গম্ভীর গলায় বললেন, 'সামথিং ইজ ভেরি রং।' আমাদের সবার গা দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। ডাক্তার এসব কি বলছেন?

কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বিতীয় সমস্যা দেখা দিল- হঠাৎ করে কনট্রেকশান বন্ধ হয়ে গেল। অথচ এই সময়ই কনট্রেকশান সবচে' বেশি প্রয়োজন। শিশুটি কি বার্থ চ্যানেলে মারা গেছে?

রোগিনী ফিসফিস করে বলল, 'আমার ঘুম পাচ্ছে। ঘুমে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে।'

ডাক্তার সেন ফোরসেপ ডেলিভারির প্রস্তুতি নিলেন। আর তখন ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। আজকাল বাতি চলে গেলেই ইমার্জেন্সি বাতি জ্বলে ওঠে- তখনকার অবস্থা তা ছিল না। তবে আমাদের কাছে টর্চ, হ্যাজাক, মোমবাতি সব সময় থাকে। সমস্যার সময় ইলেকট্রিসিটি চলে যাওয়া কোনো নতুন ঘটনা নয়- কাজেই প্রস্তুতি থাকবেই। দ্রুত হ্যাজাক জ্বালানো হলো।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরিশ্রম করে ডাক্তার সেন ডেলিভারি করালেন- যে জিনিসটি বেরিয়ে এলো আমরা চোখ বড় বড় করে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

কুৎসিত কদাকার একটা কিছু, যার দিকে তাকানো যায় না। এ আর যাই হোক মানবশিশু নয়। চেনা-জানা পৃথিবীর সাথে তার কোনো যোগ নেই। ঘন কৃষ্ণবর্ণের একতাল মাংসপিণ্ড। এর থেকে হাতির শুঁড়ের মতো আট-দশটি শুঁড় বেরিয়ে এসেছে।

শুঁড়গুলো বড় হচ্ছে এবং ছোট হচ্ছে। তালে তালে মাংসপিণ্ডটিও বড়-ছোট হচ্ছে। মানবশিশুর সঙ্গে এর একটিমাত্র মিল— এই জিনিসটিরও দুটি বড় বড় চোখ আছে। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে দেখছে চারদিকের পৃথিবীকে। চোখ দুটি সুন্দর কাজল-টানা। ডাক্তার সেন হতভম্ব গলায় বললেন, 'হোয়াট ইজ দিস?' ফোরসেপ দিয়ে ধরা জন্তুটাকে তিনি মাটিতে ফেলে দিলেন। মেঝেতে সে কিলবিল করতে লাগল। মনে হচ্ছে শুঁড়গুলিকে পায়ের মতো ব্যবহার করে সে এগুতে চাচ্ছে। আমার সঙ্গের সহকর্মী হঠাৎ পেটে হাত দিয়ে বমি করতে শুরু করল।

আমাদের পরম ভৌভাগ্য যে রোগিনীর জ্ঞান নেই। জ্ঞান থাকলে এই ভয়াবহ দৃশ্য তাকে দেখতে হতো।

ডাক্তার সেন বললেন, 'কিল ইট। এক্ষুনি এটাকে মেরে ফেলা দরকার।'

জন্তুটি কি মানুষের কথা বুঝতে পারে? ডাক্তার সেনের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র ও তীক্ষ্ণ শব্দ বের হয়ে এলো। অত্যন্ত হাই ফ্রিকোয়েন্সি সাউন্ড যা মানুষের স্নায়ুকে প্রচণ্ড ঝাঁকি দেয়।

ডাক্তার সেন বললেন, 'অপেক্ষা করছেন কেন? কিল ইট।'

জন্তুটি এগুতে শুরু করেছে। শুঁড়গুলো বড় হচ্ছে। আর সে এগুচ্ছে তার মা'র দিকে। আমরা দেখছি, সে মেঝে বেয়ে বেয়ে তার মার খাটের দিকে যাচ্ছে— খাট বেয়ে উপরে উঠছে। আশ্রয় খুঁজছে মা'র কাছে। যেন সে জেনে গেছে এই অকরুণ পৃথিবীতে একজনই শুধু তাকে পরিত্যাগ করবে না।

ডাক্তার সেন বললেন, 'আপনারা অপেক্ষা করছেন কেন? কিল ইট।'

আবার আগের মতো শব্দ হলো। জন্তুটি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ডাক্তার সেনের দিকে। তার চোখ দুটি মানুষের চোখ। সেই চোখের ভাষা আমরা জানি। সেই চোখ করুণা এবং দয়া ভিক্ষা করছে। কিন্তু করুণা সে আমাদের কাছ থেকে পাবে না। আমরা মানুষ। আমরা আমাদের মাঝে তাকে গ্রহণ করব না। এই ভয়ঙ্কর অসুন্দর ও কুৎসিতকে আমরা আশ্রয় দেব না। সে পশু হয়ে এলে ভিন্ন কথা ছিল। সে পশু হয়ে আসে নি। মানুষের সিঁড়ি বেয়ে এসেছে।

ডাক্তার সেন বললেন, 'এই জন্তুটিকে যে মেরে ফেলতে হবে এ বিষয়ে কি আপনাদের কারো মনে কোনো দ্বিধা আছে?'

আমরা সবাই বললাম— 'না, আমাদের মধ্যে কোনো দ্বিধা নেই।'

আত্মীয়-স্বজনদের মত নেয়া উচিত?

আমরা বললাম— 'না, আমরা তাও মনে করি না।'

যে লোহার দণ্ডটি থেকে স্যালাইন ওয়াটারের ব্যাগ ঝুলছিল আমি তা খুলে হাতে নিলাম। জন্তুটি এখন তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কি সুন্দর বড় বড় শান্ত চোখ! কি আছে ঐ চোখে? ঘৃণা, দুঃখ, হতাশা? জন্তুটি খাটের পা বেয়ে অর্ধেক উঠে গিয়েছিল। সেখানেই সে থেমে গেল। বোধ হয় বুঝতে পেরেছে আর উঠে লাভ নেই।

প্রথম আঘাতটি করলাম আমি।

সে অবিকল মানুষের মতো গলায় ডাকল– মা! মা!

তার মা সাড়া দিল না।

আমরা দেখছি একটি দানবকে। সেও তার করুণ চোখে একদল দানবকেই দেখছে।

আমার হাত থেকে লোহার রডটি পড়ে গিয়েছিল। ডাক্তার সেন তা কুড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। হত্যাকাণ্ডে বেশি সময় লাগল না।'

ডাক্তার হাসনা বেগমকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এই ঘটনার কি কোনো ব্যাখ্যা আপনি দাঁড় করাতে পারেন?

ডাক্তার হাসনা ক্লান্ত গলায় বলেছিলেন– আমার কাছে কোনো ব্যাখ্যা নেই। তবে এই ঘটনার প্রায় সাত বছর পর আমেরিকান জার্নাল অব মেডিক্যাল সোসাইটিতে এরকম একটি শিশুর জন্ম-বৃত্তান্তের কথা পাই। শিশুটির জন্ম হয়েছিল বলিভিয়ার এক গ্রামে। শিশুটির বর্ণনার সঙ্গে আমাদের জন্তুটির বর্ণনা হুবহু মিলে যায়। ঐ শিশুটিকেও জন্মের কুড়ি মিনিটের মাথায় হত্যা করা হয়। এবং রিপোর্ট অনুসারে সেও মৃত্যুর আগে ব্যাকুল হয়ে বলিভিয়ান ভাষায় মাকে কয়েকবার ডাকে।

'আপনার কাছে কোনো ব্যাখ্যা নেই?'

'না। তবে আমার একটা হাইপোথিসিস আছে। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, প্রকৃতি ইবোলিউশন প্রক্রিয়ায় হয়তো নতুন কোনো প্রাণ সৃষ্টির কথা ভাবছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। আমরা প্রাণপণে সেই প্রক্রিয়াকে বাঁধা দিচ্ছি।'

'আপনার ধারণা এ রকম ঘটনা আরও ঘটবে?'

'হ্যাঁ। প্রকৃতি সহজে হাল ছাড়ে না। সে চেষ্টা চালিয়ে যাবে এবং সে লক্ষ রাখবে যাতে ভবিষ্যতে আমরা বাধা দিতে না পারি। ঐ যে মা আগে স্বপ্ন দেখলেন, তার একটিই ব্যাখ্যা– প্রকৃতি শিশুটি রক্ষার চেষ্টা করছে। এক ধরনের প্রোটেকশান দেবার চেষ্টা করছে। এখন সে পারছে না, তবে ভবিষ্যতে সে নিশ্চয়ই আরও কোনো ভালো প্রোটেকশানের ব্যবস্থা করবে।'

'আপনি কি আপনার হাইপোথিসিস বিশ্বাস করেন?'

ডাক্তার হাসনা বানু জবাব দিলেন না। তাঁর কাছে এই প্রশ্নের জবাব নেই। জবাব থাকার কথাও নয়। কিছু কিছু সময় আসে যখন আমরা বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের সীমারেখায় বাস করি। তখন একইসঙ্গে আমরা দেখতে পাই ও দেখতে পাই না। বুঝতে পারি ও বুঝতে পারি না। অনুভব করি এবং অনুভব করি না। সে বড় রহস্যময় সময়!

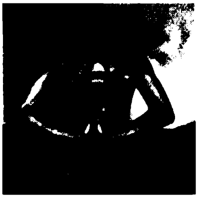

দ্বিতীয় জন

প্রিয়াংকার খুব খারাপ ধরনের একটা অসুখ হয়েছে।

অসুখটা এমন যে কাউকে বলা যাচ্ছে না। বললে কেউ বিশ্বাস করবে না, কিংবা বিশ্বাস করার ভান করে আড়ালে হাসাহাসি করবে। একজনকে অবিশ্য বলা যায়– জাভেদ কে। জাভেদ তার স্বামী। স্বামীর কাছে কিছুই গোপন থাকা উচিত নয়। অসুখ-বিসুখের খবর সবার আগে স্বামীকেই বলা দরকার।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে জাভেদের সঙ্গে প্রিয়াংকার পরিচয় এখনো তেমন গাঢ় হয় নি। হবার কথাও নয় তাদের বিয়ে হয়েছে একুশ দিন আগে। এখনো প্রিয়াংকার তুমি বলা রপ্ত হয় নি। মুখ ফসকে আপনি বলে ফেলে। এরকম গম্ভীর, বয়স্ক একজন মানুষকে তুমি বলাও অবিশ্য খুব সহজ নয়। মুখে কেমন বাধো বাধো ঠেকে। প্রিয়াংকা চেষ্টা করে আপনি তুমি কোনোটাই না বলে চালাতে, যেমন– তুমি চা খাবে? না বলে সে বলে চা দেব? এইভাবে দীর্ঘ আলাপ চালানো যায় না, তার চেয়েও বড় কথা, মানুষটা খুব বুদ্ধিমান। ভাববাচ্যে কিছুক্ষণ কথা বলার পরই সে হাসিমুখে বলে, 'তুমি বলতে কষ্ট হচ্ছে, তাই না?'

তুমি বলতে কষ্ট হওয়াটা দোষের কিছু না। প্রিয়াংকার বয়স মাত্র সতেরো, তাও পুরোপুরি সতেরো হয় নি। জুন মাসে হবে। এখনো দু'মাস বাকি। আর ঐ মানুষটার বয়স খুব কম ধরলেও ত্রিশ। তার বয়সের প্রায় দ্বিগুণ। সারাক্ষণ গম্ভীর থাকে বলে বয়স আরও বেশি দেখায়। বরের বয়স বেশি বলে প্রিয়াংকার মনে কোন ক্ষোভ নেই। বরদের চেংড়া চেংড়া দেখালে ভালো লাগে না। তাছাড়া মানুষটা অত্যন্ত ভালো। ভালো এবং বুদ্ধিমান। কম বয়েসি বোকা বরের চেয়ে বুদ্ধিমান বয়স্ক বর ভালো।

বিয়ের রাতে নানান কিছু ভেবে প্রিয়াংকা আতংকে অস্থির হয়েছি। ধক ধক করে বুক কাঁপছিল। কপাল রীতিমত ঘামছিল। মানুষটা সঙ্গে সঙ্গে তা বুঝে ফেলেছিল। কাছে এসে ভারী গলায় বলল, 'ভয় করছে? ভয়ের কি আছে বলো তো?

প্রিয়াংকার বুকের ধকধকানি আরও বেড়ে গেল। সে হাঁ-না কিছুই বলল না। একবার মনে হলো সে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। মানুষটা তখন নরম গলায় বলল, 'ভয়ের কিছু নেই। ঘুমিয়ে পড়।' বলেই প্রিয়াংকার গায়ে চাদর টেনে দিল। তার গলার স্বরে কিছু একটা ছিল। প্রিয়াংকার ভয় পুরোপুরি কেটে গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। অনেক রাতে একবার ঘুম ভেঙে দেখে লোকটি অন্যপাশ ফিরে ঘুমুচ্ছে।

খানিকক্ষণ জেগে থেকে প্রিয়াংকা আবার ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। লোকটি তখন পাশে নেই।

একটা মানুষকে চেনার জন্যে একুশ দিন খুব দীর্ঘ সময় নয়। তবু প্রিয়াংকার ধারণা মানুষটা ভালো। বেশ ভালো। এ রকম একজন মানুষকে তার অসুখের কথাটা অবশ্যই বলা যায়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, অসুখটার সঙ্গে এই মানুষটার সম্পর্ক আছে। এ কারণেই তাকে বলা যাবে না। কিন্তু কাউকে বলা দরকার। খুব তাড়াতাড়ি বলা দরকার নয়তো সে পাগল হয়ে যাবে। কিছুটা পাগল সে বোধহয় হয়েই গেছে। সারাক্ষণ অস্থির লাগে। সন্ধ্যা মেলাবার পর শরীর কাঁপতে থাকে। তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকে। গ্লাসের পর গ্লাস পানি খেলেও তৃষ্ণা মেটে না। সামান্য শব্দে ভয়ঙ্কর চমকে ওঠে। সেদিন বাতাসে জানালার কবাট নড়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে অস্থির হয়ে গোঙানির মতো শব্দ করল প্রিয়াংকা। হাতের চায়ের কাপ থেকে সবটা চা ছলকে পড়ল শাড়িতে। ভাগ্যিস আশেপাশে কেউ ছিল না। কেউ থাকলে নিশ্চয়ই খুব অবাক হতো প্রিয়াংকার ছোট মামা যেমন অবাক হলেন।

তিনি প্রিয়ংকাকে দেখতে এসেছিলেন। তার দিকে তাকিয়েই বিস্মিত গলায় বললেন, 'তোর কি হয়েছে রে?' প্রিয়াংকা হালকা গলায় বলল, 'কিছু হয় নি তো। তুমি কেমন আছ মামা?'

'আমার কথা বাদ দে, তোকে এমন লাগছে কেন?'

'কেমন লাগছে?'

'চোখের নিচে কালি পড়েছে। মুখ শুকনো। কি ব্যাপার?

'কোনো ব্যাপার না মামা।'

'গালটাল ভেঙে কি অবস্থা! তুই কথাও তো কেমন অন্য রকমভাবে বলছিস।'

'কি রকমভাবে বলছি?'

'মনে হচ্ছে তোর গলাটা ভাঙা।'

'ঠাণ্ডা লেগেছে মামা।'

প্রিয়াংকা কয়েকবার কাশল। মামাকে বুঝাতে চাইল যে তার সত্যি সত্যি কাশি হয়েছে, অন্য কিছু না। মামা আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন। শীতল গলায় বললেন,

'আর কিছু না তো?'

'না।'

'ঠিক করে বল্?'

'ঠিক করেই বলছি।'

প্রিয়াংকার কথায় তার মামা খুব আশ্বস্ত হলেন বলে মনে হলো না। সারাক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন। চায়ের কাপে দুটা চুমুক দিয়েই রেখে দিলেন। 'যাই রোমা।' বলেই কোনোদিকে না তাকিয়ে হনহন করে চলে গেলেন। মামা চলে যাবার এক ঘণ্টার ভেতরই মামি এসে হাজির। বোঝাই যাচ্ছে মামা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

মামী প্রিয়াংকাকে দেখে আঁৎকে উঠলেন। প্রায় চেঁচিয়েই বললেন, 'এক সপ্তা আগে তোকে কি দেখেছি আর এখন কি দেখছি? কি ব্যাপার তুই খোলাখুলি বল তো?'

'কি সমস্যা?' প্রিয়াংকা শুকনো হাসি হেসে বলল,

'কোনো সমস্যা না।'

মামি কঠিন গলায় বললেন,

'তুই বলতে না চাইলে আমি কিন্তু জামাইকে জিজ্ঞেস করব। জামাই আসবে কখন?'

'ও আসবে রাত আটটার দিকে। ওকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না মামি। আমিই বলছি।'

'বল। কিছু লুকুবি না।'

'প্রিয়াংকা প্রায় ফিসফিস করে বলল,

'আমি ভয় পাই মামি।'

'কিসের ভয়?'

'কি যেন দেখি।'

'কি দেখিস?'

'নিজেও ঠিক জানি না কি দেখি।'

'ভাসা ভাসা কথা বলবি না। পরিষ্কার করে বল কি দেখিস?'

'প্রিয়াংকা এক পর্যায়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে বলল, 'মামি, আমি বোধহয় পাগল হয়ে গেছি। আমি কি সব যেন দেখি।'

সে কি দেখে তা তিনি অনেক প্রশ্ন করেও বের করতে পারলেন না। প্রিয়াংকা অন্য সব প্রশ্নের জবাব দেয় কিন্তু কি দেখে তা বলে না। এড়িয়ে যায় বা কাঁদতে শুরু করে।

'তোর কি বর পছন্দ হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'সে কি তোকে ভয়-টয় দেখায়?'

'কি যে তুমি বলো মামি! আমাকে ভয় দেখাবে কেন?'

'রাতে কি, তোরা একসঙ্গে ঘুমাস?'

প্রিয়াংকা লজ্জায় বেগুনী হয়ে গিয়ে বলল, 'হ্যাঁ!'

'সে কি তোকে অনেক রাত পর্যন্ত জাগিয়ে রাখে?'

'কি সব প্রশ্ন তুমি করো মামি!'

'আমি যা বলছি তার জবাব দে।'

'না, জাগিয়ে রাখে না।'

মামি অনেকক্ষণ থাকলেন। প্রিয়াংকাদের ফ্ল্যাট ঘুরে ঘুরে দেখলেন। কাজের মেয়ে এবং কাজের ছেলেটির সঙ্গে কথা বললেন। কাজের মেয়েটির নাম মরিয়ম। দেশ খুলনা। ঘরের যাবতীয় কাজ সে-ই করে। কাজের ছেলেটির নাম জীতু মিয়া। তার বয়স নয়-দশ। এদের দু'জনের কাছ থেকেও খবর বার করার চেষ্টা করা হলো।

'আচ্ছা মরিয়ম, তুমি কি ভয়-টয় পাও?'

'না। ভয় পামু ক্যা?'

'রাতে কিছু দেখো-টেখো না?'

'কি দেখমু?'

'আচ্ছা ঠিক আছে– যাও।'

প্রিয়াংকার মামি কোনো রহস্য ভেদ করতে পারলেন না। তাঁর খুব ইচ্ছা ছিল জাভেদের সঙ্গে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করবেন, পরামর্শ করবেন। প্রিয়াংকার জন্যে পারা গেল না। সে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'মামি, তুমি যদি তাকে কিছু বলো তাহলে আমি কিন্তু বিষ খাব। আল্লাহর কসম! বিষ খাব। নয়তো ছাদ থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ব।

তিনি কিছু জিজ্ঞেস করলেন না, কারণ প্রিয়াংকা সত্যি বিষ-টিষ খেয়ে ফেলতে পারে। "আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়"– এই কথা লিখে একবার সে এক বোতল ডেটল খেয়ে ফেলেছিল। অনেক ডাক্তার-হাসপাতাল করতে হয়েছে। এই কাণ্ড সে করেছিল অতি তুচ্ছ কারণে। তার এক বান্ধবীর সঙ্গে ঝগড়া করে। এই মেয়ের পক্ষে সবই সম্ভব। তাকে কিছুতেই ঘাটানো উচিত নয়।

জাভেদ এলো রাত সাড়ে আটটার দিকে। জাভেদের সঙ্গে খানিকক্ষণ টুকটাক গল্প করে প্রিয়াংকার মামি ফিরে গেলেন। তাঁর মেঘ কাটল না। হলো কি প্রিয়াংকার? সে কি দেখে?

প্রিয়াংকা নিজেও জানে না তার কি হয়েছে। মামি চলে যাবার পর তার বুক ধক ধক করা শুরু হয়েছে। অল্প অল্প ঘাম হচ্ছে। অসম্ভব গরম লাগছে। কিছুক্ষণ পর পর মনে হচ্ছে বোধহয় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

তারা খাওয়া-দাওয়া করে রাত সাড়ে দশটার দিকে ঘুমুতে গেল। জাভেদ বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ে। আজও তাই হলো। জাভেদ ঘুমুচ্ছে। তালে তালে নিঃশ্বাস পড়ছে। জেগে আছে প্রিয়াংকা। কিছুক্ষণের মধ্যে তার পানির পিপাসা পেল। প্রচণ্ড পানির পিপাসা। পানি খাবার জন্যে বিছানা ছেড়ে নামতে হবে। যেতে হবে পাশের ঘরে কিন্তু তা সে করবে না। অসম্ভব। কিছুতেই না। পানির তৃষ্ণায় মরে গেলেও না। এই পানি খেতে গিয়েই প্রথম বার তার অসুখ ধরা পড়েছিল। ভয়ে ঐদিনই সে মরে যেত। কেন মরল না? মরে গেলেই ভালো হতো। তার মতো ভীতু মেয়ের মরে যাওয়াই উচিত।

ঐ রাতে সে বেশ আরাম করে ঘুমুচ্ছিল। হঠাৎ বৃষ্টি হবার জন্যে চারদিক বেশ ঠাণ্ডা। জানালা দিয়ে ফুরফুরে বাতাস আসছে। ঘুমুবার জন্যে চমৎকার রাত। এক ঘুমে সে কখনো রাত পার করতে পারে না। মাঝখানে একবার তাকে উঠে পানি খেতে হয় কিংবা বাথরুমে যেতে হয়। সেই রাতেও পানি খাবার জন্যে উঠল। জাভেদ কাত হয়ে ঘুমুচ্ছে। গায়ে পাতলা চাদর দিয়ে রেখেছে। অদ্ভুত অভ্যাস মানুষটার। যত গরমই পড়ুক গায়ে চাদর দিয়ে রাখবে। প্রিয়াংকা খুব সাবধানে গায়ের চাদর সরিয়ে দিল। আহা, আরাম করে ঘুমুক। কেমন ঘেমে গেছে।

স্বামীকে ডিঙিয়ে বিছানা থেকে নামল। স্বামী ডিঙিয়ে ওঠা-নামা করা ঠিক হচ্ছে না– হয়তো পাপ হচ্ছে। কিন্তু উপায় কি! প্রিয়াংকা ঘুমোয় দেয়ালের দিকে। খাট থেকে নামতে হলে স্বামীকে ডিঙাতেই হবে।

তাদের শোবার ঘর অন্ধকার, তবে পাশের ঘরে বাতি জ্বলছে। এই একটা বাতি সারারাতই জ্বলে, ঘরটা জাভেদের লাইব্রেরি ঘর। এই ঘরেই জাভেদ পরীক্ষার খাতা দেখে পড়াশোনা করে। ঘরে আসবাবপত্র তেমনি কিছু নেই। একটা বুক শেলফে কিছু বই, পুরানো ম্যাগাজিন। একটা বড় টেবিল। টেবিলের উপর রাজ্যের পরীক্ষার খাতা। একটা ইজিচেয়ার। ইজিচেয়ারের পাশে সাইড টেবিলে টেবিল ল্যাম্প।

দরজার ফাঁক দিয়ে স্টাডি রুমের আলোর কিছুটা প্রিয়াংকাদের শোবার ঘরেও আসছে, তবুও ঘরটা অন্ধকার– স্যান্ডেল খুঁজে বের করতে অনেকক্ষণ মেঝে হাত বাড়াতে হলো। স্যান্ডেল পায়ে পরামাত্র পাশের ঘরে কিসের যেন একটা শব্দ হলো।

ভারী অথবা মৃদু গলায় কেউ একজন কাশল, ইজিচেয়ার টেনে সরাল। নিশ্চয়ই মনের ভুল, তবু প্রিয়াংকা আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। না– আর কোনো শব্দ নেই। শুধু সদর রাস্তা দিয়ে দ্রুতবেগে ট্রাক যাওয়া-আসা করছে। তাহলে একটু আগে পাশের ঘরে কে শব্দ করছিল? অবিকল নিশ্বাস নেবার শব্দ। প্রিয়াংকা দরজা ঠেলে পাশের ঘরে ঢুকেই জমে পাথর হয়ে গেল। ইজিচেয়ারে জাভেদ বসে আছে। হাতে বই। জাভেদ বই থেকে মুখ তুলে তাকাল। নরম গলায় বলল, কিছু বলবে? কতটা সময় পার হয়েছে? এক সেকেন্ডের একশ' ভাগের এক ভাগ– না অনন্তকাল? প্রিয়াংকা জানে না। সে শুধু জানে সে ছুটে চলে এসেছে শোবার ঘরে– ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিছানায়। তার সমস্ত শরীর কাঁপছে– সে কি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে? নিশ্চয়ই অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। ঘর দুলছে, চারদিকের বাতাস অসম্ভব ভারী ও উষ্ণ। জাভেদ জেগে উঠেছে। সে বিছানায় পাশ ফিরতে ফিরতে বলল, 'কি?'

প্রিয়াংকা বলল, 'কিছু না।' জাভেদ ঘুম জড়ানো স্বরে বলল, 'ঘুমাও। জেগে আছ কেন? বলতে বলতেই ঘুমে জাভেদ এলিয়ে পড়ল। জাভেদকে জড়িয়ে ধরে সারারাত জেগে রইল প্রিয়াংকা। একটি দীর্ঘ ও ভয়াবহ রাত। স্বামীকে জড়িয়ে ধরে প্রিয়াংকা শুয়ে আছে। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় পাশের ঘরে। সে স্পষ্টই শুনছে ছোটখাটো শব্দ আসছে পাশের ঘর থেকে। নিশ্বাস ফেলার শব্দ, বইয়ের পাতা উল্টাবার শব্দ, ইজিচেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালে যেমন ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হয়ে সে রকম শব্দ, গলার শ্লেষ্মা পরিষ্কার করার শব্দ। শেষ রাতের দিকে শোনা গেল বারান্দায় পায়চারির শব্দ। কেউ একজন বারান্দায় এ-মাথা থেকে ও-মাথায় যাচ্ছে আবার ফিরে আসছে। এই সবকিছু কল্পনা? নিশ্চয় কল্পনা। রাস্তা দিয়ে ট্রাক যাওয়া-আসার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ আসছে না।

ফজরের আজানের পর প্রিয়াংকার চোখ ঘুমে জড়িয়ে এলো। ঘুম ভাঙল বেলা সাড়ে ন'টায়। ঘরের ভেতর রোদ ঝলমল করছে। জাভেদ চলে গেছে কলেজে। মরিয়ম জীতু মিয়ার সঙ্গে তারস্বরে ঝগড়া করছে। প্রিয়াংকার সব ভয় কর্পূরের মতো উবে গেল। রাতে সে যে অসম্ভব ভয় পেয়েছিল এটা ভেবে এখন নিজেরই কেমন হাসি পাচ্ছে। সে স্বপ্ন দেখেছিল। স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই না। মানুষ কত রকম দুঃস্বপ্ন দেখে। এও একটা দুঃস্বপ্ন। এর বেশি কিছু না। মানুষ তো এর চেয়েও ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখে। সে নিজেই কতবার দেখেছে। একবার স্বপ্নে দেখেছিল সম্পূর্ণ নগ্ন গায়ে বাসে করে কোথায় যেন যাচ্ছে। ছিঃ ছিঃ, কি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন!

প্রিয়াংকা বিছানা থেকে নামতে নামতে ডাকল, 'মরিয়ম!'

'জে আম্মা।'

'ঝগড়া করছ কেন মরিয়ম?

'জীতু কাচের জগটা ভাইঙ্গা ফেলছে আম্মা।'

'চিৎকার করলে তো জগ ঠিক হবে না। চিৎকার করবে না।'

'জিনিসের উপর কোনো মায়া নাই....মহব্বত নাই...'

'ঠিক আছে তুমি চুপ করো। তোমার স্যার কি চলে গেছেন?

'জে।'

'বাজার করে দিয়ে গেছেন?

'জে।'

'কখন আসবেন কিছু বলে গেছেন?'

'দুপুরে খাইতে আসবেন।'

'আচ্ছা যাও, তুমি আমার জন্যে খুব ভালো করে এক কাপ চা বানিয়ে আনো।'

'নাস্তা খাইবেন না আম্মা?'

'না। তোমার স্যার নাস্তা করছে?'

'জে।'

মরিয়ম চা আনতে গেল। প্রিয়াংকা মুখ ধুয়ে চায়ের কাপ নিয়ে বসল। এখন তার করার কিছুই নেই। দু'জন মানুষের সংসার। কাজ তেমন কিছু থাকে না। এ সংসার কাজকর্ম যা আছে সবই মরিয়ম দেখে এবং খুব ভালোমতই দেখে। চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া প্রিয়াংকার কোন কাজ নেই। এই ফ্ল্যাটে অনেক গল্পের বই আছে– গল্পের বই পড়তে প্রিয়াংকার ভালো লাগে না। ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষার জন্যে পড়াশোনা করা দরকার। পড়তে ভালো লাগে না। কারণ প্রিয়াংকা জানে, পড়ে লাভ হবে না, সে পাস করতে পারবে না। কোনো একটা কলেজেই তাকে বি.এ. পড়তে হবে। কে জানে হয়তো জাভেদের কলেজেই। যদি তাই হয়, তাহলে জাভেদ কি তাকে পড়াবে? ক্লাসে তাকে কি ডাকবে– স্যার?

চায়ের কাপ নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই মরিয়ম তাকে একটা চিঠি দিল।

'কিসের চিঠি মরিয়ম?'

'স্যার দিয়ে গেছে।'

চিঠি না– চিরকুট। জাভেদ লিখেছে– প্রিয়াংকা, তোমার গা-টা গরম মনে হলো। তৈরি হয়ে থেকো, আমি দুপুরে তোমাকে একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।

প্রিয়াংকার মনটা হঠাৎ ভালো হয়ে গেল। মানুষটা ভালো। হৃদয়বান এবং বুদ্ধিমান। স্বামীদের কত রকম অন্যায় দাবি থাকে– তাঁর তেমন কিছু নেই। অন্যদের দিকেও খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। প্রিয়াংকা কেন, আজ যদি জীতু মিয়ার জ্বর হয় তাকেও সে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। জাভেদ এমন একজন স্বামী, যার উপর ভরসা করা যায়।

যে যাই বলুক, এই মানুষটাকে স্বামী হিসেবে পেয়ে তার খুব ভালো হয়েছে। জাভেদের আগে একবার বিয়ে হয়েছে সেটা নিশ্চয়ই অপরাধ নয়। বেচারার স্ত্রী মারা গেছে বিয়ের আট মাসের মাথায়। স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে বিয়ে করার জন্যেও অস্থির হয়ে পড়ে নি। দু'বছর অপেক্ষা করেছে। মামা-মামি যে তাকে দোজবর একটি ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন এই নিয়েও প্রিয়াংকার মনে কোনো ক্ষোভ নেই। মামা দরিদ্র মানুষ, তিনি আর কত করবেন। যথেষ্টই তো করেছেন। মামি নিজের গয়না ভেঙে তাকে গয়না করে দিয়েছেন। ক'জন মানুষ এ রকম করে? আট-ন'টা নতুন শাড়ি কিনে দিয়েছেন। এর মধ্যে একটা শাড়ি আছে বারশ' টাকা দামের।

জাভেদের আগের স্ত্রীর অনেক শাড়ি এই ঘরে রয়ে গেছে। ঐ মেয়েটির শাড়ির দিকে তাকালেই মনে হয় খুব শৌখিন মেয়ে ছিল। ড্রেসিং টেবিল ভর্তি সাজগোজের জিনিস। কিছুই ফেলে দেয়া হয় নি। বসার ঘরে মেয়েটির বড় একটি বাঁধানো ছবি আছে। খুব সুন্দর মুখ। তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।

এই ডাক্তার জাভেদের বন্ধু।

কাজেই ডাক্তার অনেক আজেবাজে রসিকতা করল– যেমন হাসিমুখে বলল, ভাবীকে এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন? সংসারে নতুন কেউ আসছে নাকি? হা-হা-হা। বুদ্ধিমান হয়ে ঠিক কাজটি করে ফেলেন নি তো?

দু'সপ্তাহও হয় নি যার বিয়ে হয়েছে তার সঙ্গে কি এ রকম রসিকতা করা যায়? রাগে প্রিয়াংকার গা জ্বলতে লাগল।

ডাক্তার তাকে একগাদা ভিটামিন দিলেন এবং বললেন, ভাবীকে মনে হচ্ছে রাতে ঘুমুতে-টুমুতে দেয় না। দুপুরে ঘুমিয়ে পুষিয়ে নেবেন। নয়তো শরীর খারাপ করবে-হা-হা- হা।

প্রিয়াংকা বাড়ি ফিরল রাগ করে। সন্ধ্যা মেলাবার পর সেই রাগ ভয়ে রূপান্তরিত হলো। সীমাহীন ভয় তাকে গ্রাস করে ফেলল। এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যেতে ভয়। বারান্দায় যেতে ভয়। হাত-মুখ ধুতে বাথরুমে গিয়েছে– বাথরুমের দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, আর সে দরজা খুলতে পারবে না। দরজা আপনাআপনি আটকে গেছে। সে দরজা খোলার চেষ্টা না করেই কাঁপা গলায় ডাকতে লাগল– মরিয়ম, ও মরিয়ম! মরিয়ম!

রাতে আবার ঐদিনের মতো হলো। জাভেদ পাশেই প্রায় নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে আর প্রিয়াংকা স্পষ্টই শুনছে স্যান্ডেল পরে বারান্দায় কে যেন পায়চারি করছে। প্রিয়াংকা নিজেকে বুঝাল– ও কেউ না, ও হচ্ছে মরিয়ম। মরিয়ম হাঁটছে। ছোট ছোট পা ফেলছে। মরিয়ম ছাড়া আর কে হবে? নিশ্চয়ই মরিয়ম। স্যান্ডেলে কেমন ফটফট শব্দ হচ্ছে। জাভেদ যখন স্যান্ডেল পরে হাঁটে তখন এরকম শব্দ হয় না। একবার কি বারান্দায় উঁকি দিয়ে দেখবে? কি হবে উঁকি দিলে? কিছুই হবে না। ভয়টা কেটে যাবে। রাত একটা বাজে এমন কিছু রাত হয় নি। রাত একটায় ঢাকা শহরের অনেক দোকানপাট খোলা থাকে। এই তো পাশের ফ্ল্যাটের বাচ্চাটা কাঁদছে। এখন নিশ্চয়ই বারান্দায় যাওয়া যায়।

খুব সাবধানে জাভেদকে ডিঙিয়ে প্রিয়াংকা বিছানা থেকে নামল। তার হাত-পা কাঁপছে, তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে, কানের কাছে কেমন ঝাঁ ঝাঁ শব্দ হচ্ছে। সব অগ্রাহ্য করে বারান্দায় চলে এলো। আর তার সঙ্গে সঙ্গে বারান্দায় দাঁড়ানো মানুষটা বলল, প্রিয়াংকা, এক গ্লাস পানি দাও তো।

বিছানায় যে মানুষটা শুয়ে আছে এই মানুষটাই সেই জাভেদ। তার পরনে জাভেদের মতোই লুঙ্গি, হাত-কাটা গেঞ্জি। মুখ গম্ভীর ও বিষণ্ন।

প্রিয়াংকা ছুটে শোবার ঘরে চলে এলো। কোনোমতে বিছানায় উঠল– ঐ তো জাভেদ ঘুমুচ্ছে। গায়ে চাদর টানা– এতক্ষণ যা দেখেছি ভুল দেখেছি। যা শুনেছি তাও ভুল। কিছু একটা আমার হয়েছে। ভয়ঙ্কর কোনো অসুখ। সকাল হলে আমার এই অসুখ থাকবে না। আল্লাহ্, তুমি সকাল করে দাও। খুব তাড়াতাড়ি সকাল করে দাও। মানুষ জেগে উঠুক। সূর্যের আলোয় চারদিক ভরে যাক। সে জাভেদকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। জাভেদ ঘুমঘুম গলায় বলল, কি হয়েছে?

সকালবেলা সত্যি সত্যি সব স্বাভাবিক হয়ে গেল। রাতে এ রকম ভয় পাওয়ার জন্যে লজ্জা লাগতে লাগল। জাভেদ কলেজে চলে যাবার পর সে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে মরিয়মকে তরকারি কাটায় সাহায্য করতে গেল। মরিয়ম বলল,

'আফার শইল কি খারাপ?'

'না।'

'আফনের কিছু করণ লাগত না আফা। আফনে গিয়া হুইয়া থাকেন।'

'এই মাত্র তো ঘুম থেকে উঠলাম, এখন আবার কি শুয়ে থাকব?'

'চা বানায়া দেই?'

'দাও। আচ্ছা মরিয়ম, তোমার আগের আপাও কি আমার মতো চা খেত?'

'হ। তয় আফনের মতো চুপচাপ থাকত না। সারাদিন হৈচৈ করত। গান-বাজনা করত।

'মারা গেলেন কিভাবে?'

'হঠাৎ মাথাডা খারাপ হইয়া গেল। উল্টাপাল্টা কথা কওয়া শুরু করল– কি জানি দেখে?'

প্রিয়াংকা শংকিত গলায় বলল,

'কি দেখে?'

'দুইটা মানুষ না-কি দেখে। একটা আসল, একটা নকল। কোনটা আসল কোন্‌টা নকল বুঝতে পারে না।'

'তুমি কি বলছ তাও তো আমি বুঝতে পারছি না।'

'পাগল মাইনষের কথার কি ঠিক আছে আফা? নেন চা নেন।'

প্রিয়াংকা মাথা নিচু করে চায়ের কাপে ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছে। একবারও মরিয়মের দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে না। তার ধারণা, তাকালেই মরিয়ম অনেক কিছু বুঝে

ফেলবে। বুঝে ফেলবে যে প্রিয়াংকারও একই অসুখ হয়েছে। সে চায় না মরিয়ম কিছু বুঝুক। কারণ তার কিছুই হয় নি। অসুখ করেছে। অসুখ কি মানুষের করে না? করে। আবার সেরেও যায়। তারটাও সারবে।

রাত গভীর হচ্ছে। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে টুপটুপ করে। খোলা জানালায় হাওয়া আসছে। প্রিয়াংকা জাভেদকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে। তার চোখে ঘুম নেই।

পাশের ঘরে বইয়ের পাতা উল্টানোর শব্দ হচ্ছে। এই যে সিগারেট ধরাল। সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ ভেসে আসছে। ইজিচেয়ার থেকে উঠল- ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে ইজিচেয়ারে।

প্রিয়াংকা স্বামীকে সজোরে জড়িয়ে ধরে কাঁপা গলায় ডাকল- এই- এই!

ঘুম ভেঙে জাভেদ বলল, কি?

প্রিয়াংকা ফিসফিস করে বলল, না কিছু না। তুমি ঘুমাও।

বেয়ারিং চিঠি

জমীর সাহেব অফিস থেকে ফেরা মাত্রই তাঁর বড় মেয়ে মিতু বলল, বাবা, আজ তোমার একটি চিঠি এসেছে। বলেই সে মুখের হাসি গোপন করার জন্যে অন্যদিকে তাকাল।

মিতুর বয়স একুশ। এই বয়সের মেয়েদের মুখে অকারণে হাসি আসে। হাসি-তামাশা জমীর সাহেবের একেবারেই পছন্দ নয়। বিশেষ করে মা-বাবাকে নিয়ে হাসাহাসি। আজকাল অনেক পরিবারেই তিনি এ ব্যাপার দেখেন। মেয়ে বাবার সঙ্গে বসে আড্ডা দিচ্ছে– খিলখিল করে হাসছে। এসব কি? তিনি একবার তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেই বন্ধুর মেয়ে বাবাকে নিয়ে খুব হাসি-তামাশা করতে লাগল। এক পর্যায়ে বলে ফেলল, বাবা, দিন দিন তোমার চেহারা সুন্দর হচ্ছে। রাস্তায় বের হলে নিশ্চয়ই মেয়েরা তোমার দিকে তাকায়? জমীর সাহেব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁর নিজের মেয়ে হলে চড় দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিতেন। অন্যের মেয়ে বলে কিছু বলা গেল না, তবে ঐ বন্ধুর বাড়িতে যাওয়া তিনি ছেড়ে দিলেন।

মিতু চিঠি বাবার দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে বলল, বিয়ারিং চিঠি বাবা। দু'টাকা দিয়ে চিঠি রাখতে হয়েছে। বলে আবার ফিক করে হেসে ফেলল।

জমীর সাহেব কঠিন গলায় বললেন, হাসছিস কেন? বিয়ারিং চিঠি এসেছে, এর মধ্যে হাসির কি হলো? এ রকম ফাজলামি শিখেছিস কোথায়?

মিতু মুখ কালো করে চলে গেল। বাবাকে সে সঙ্গত কারণেই অসম্ভব ভয় পায়। জমীর সাহেব লক্ষ করলেন, খামের মুখ খোলা। এরা চিঠি পড়েছে। এই বেয়াদবিও সহ্য করা মুশকিল। একজনের চিঠি অন্যজন পড়বে কেন? খামে তাঁর নাম লেখা দেখার পরেও এরা কোন সাহসে চিঠি খুলে? রাগে জমীর সাহেবের গা কাঁপতে লাগল। এই অবস্থায় তিনি চিঠি পড়লেন। একবার, দু'বার, তিনবার। তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল। সুস্মিতা নামের এক মেয়ের চিঠি। তাঁর কাছে লেখা। সম্বোধন হচ্ছে– প্রিয়তমেষু। এর মানে কি? সুস্মিতা কে? সুস্মিতা নামের কাউকে তিনি চেনেন বলে মনে করতে পারলেন না। কলেজে পড়ার সময় কমলা নামের এক মেয়ের প্রতি খুব দুর্বলতা অনুভব করেছিলেন। মেয়েটির বিয়ে হয়ে যাবার পর দুর্বলতা কেটে যায়। এ ছাড়া অন্য কোনো মেয়েকে তিনি চেনেন না। জমীর সাহেব কপালের ঘাম মুছে চতুর্থবারের মতো চিঠি পড়লেন।

প্রিয়তমেষু,

তুমি কেমন আছ? তোমার কথা খুব মনে হয়। তোমার শরীর এত খারাপ হয়েছে কেন? শরীরের আরও যত্ন নেবে। আমি দেখেছি তুমি বাসে যাওয়া-আসা করো। তোমাকে অনুরোধ করছি সপ্তাহখানেক বাসে উঠবে না। কাল তোমাকে নিয়ে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। দুঃস্বপ্নটা হচ্ছে– তুমি বাসে উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে পা ভেঙে ফেলেছ। স্বপ্নকে গুরুত্ব দেয়ার কোনো মানে হয় না। তবু অনুরোধ করছি এক সপ্তাহ বাসে উঠবে না।

বিনীতা

তোমার সুস্মিতা

জমীর সাহেব পঞ্চম বারের মতো চিঠি পড়তে শুরু করলেন। মোটা নিবের কলমে গোটা গোটা অক্ষরের চিঠি। চিঠিতে তারিখ বা ঠিকানা নেই। হলুদ রঙের কাগজ। কাগজ থেকে হালকা ন্যাপথলিনের গন্ধ আসছে।

'বাবা, তোমার চা।'

মিতু চায়ের কাপ এনে বাবার সামনে রাখল। তার মুখ থমথম করছে। বাবার ধমকের কথা সে এখনো ভুলতে পারে নি। জমীর সাহেব মেয়ের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, 'কে লিখল কিছুই বুঝতে পারছি না। সুস্মিতা নামের কাউকে চিনি না।'

মিতু বলল, 'চিনি হয়েছে কি-না দেখো।'

জমীর সাহেব চায়ে চিনির ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখালেন না। শুকনো গলায় বললেন, 'তোর মা এই চিঠি পড়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'বলেছে কিছু?'

'না।'

'বুঝলি মিতু– সুস্মিতা নামের কাউকেই চিনি না। আর ধর, যদি চিনতামও তাহলেও কি এই রকম একটা চিঠি কেউ লিখতে পারে? ছিঃ ছিঃ! লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।'

মিতু ইতস্তত করে বলল, 'আমার কি মনে হয় জানো বাবা, আমার মনে হয়, এই বাড়িতে জমীর সাহেব বলে আগে কেউ ছিলেন। চিঠিটা তাঁকে লেখা।'

জমীর সাহেবের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এই সহজ সমাধান তাঁর মাথায় কেন আসে নি বুঝতে পারলেন না। মিতু মেয়েটার মাথা তো বেশ ভালো। সায়েন্সে দেয়া উচিত ছিল। গাধার মতো তিনি মেয়েটাকে আর্টস পড়িয়েছেন।

তিনি চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, 'খুব ভালো চা হয়েছে মা। খুব ভালো। তোর মা কোথায়?'

'নানুর বাড়ি গেছে।'

'মা নানুর বাড়ি গেছে' এই বাক্যটি জমীর সাহেবের খুব অপছন্দের বাক্য। শাহানার মার বাড়ি মিরপুর ছ'নম্বরে। ঐ বাড়িতে গেলেই শাহানা রাতটা থেকে যায়। আজও

থেকে যাবে। তবে আজ জমীর সাহেব অন্যদিনের মতো খারাপ বোধ করলেন না। শাহানা থাকলে নিশ্চয়ই চিঠিটা নিয়ে গম্ভীর গলায় কথা বলত। শাহানার কথা শুনতেই ইদানীং তাঁর অসহ্য লাগে। রাগী রাগী কথা তো আরও অসহ্য লাগবে।

'মিতু'!

'জি বাবা।'

'তোর মা বোধ হয় থেকে যাবে ও-বাড়িতে।'

'হ্যাঁ।'

'তোর মা কিছু বলে নি চিঠি পড়ে?'

'না।'

'তোর কি মনে হয় রাগ করেছে?'

'রাগ করেছিল, আমি বুঝিয়ে বলেছি।'

মেয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতায় জমীর সাহেবের মন ভরে গেল। মেয়েটাকে সায়েন্স পড়ানো উচিত ছিল। সায়েন্স না পড়িয়ে ভুল হয়েছে। আর্টস পড়বে গাধা টাইপের মেয়েরা। তাঁর মেয়েরা গাধা টাইপ নয়। বুদ্ধি আছে। বাপের প্রতি ফিলিংস আছে।

পরদিন যথারীতি জমীর সাহেব অফিসে রওনা হলেন। একবার মনে হলো, বাসে না গিয়ে একটা রিকশা নিয়ে নেবেন। পরমুহূর্তেই এই চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেললেন। ফালতু একটা চিঠি নিয়ে কিছু ভাবার কোনো মানে হয়? এই সব জিনিস প্রশ্রয় দেয়াই উচিত না। ঝিকাতলার মোড়ে অন্যসব অফিস যাত্রীর মতো তিনিও একটা টিফিন বক্স এবং ছাতা হাতে বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন এবং যথারীতি প্রচণ্ড ভিড়ে ঠেলাঠেলি করে বাসে উঠে পড়লেন। বাস ছেড়ে দিল। সেই মুহূর্তে কিছু একটা হলো তাঁর, মনে হলো ছিটকে বাস থেকে পড়ে যাচ্ছেন। তিনি একসঙ্গে অনেক লোকের চিৎকার শুনলেন– থামো, থামো, থামো– এই রুককে, রুককে–

জমীর সাহেব রাস্তায় ছিটকে পড়ে জ্ঞান হারালেন। জ্ঞান হলো হাসপাতালে। তাঁর বাম পা হাঁটুর নিচে ভেঙেছে। এক জায়গায় না, দু'জায়গায়। মিতু এবং শাহানা মাথার কাছে বসে আছে। দু'জনই কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে। সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের ডাক্তার সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, 'কাঁদছেন কেন? বললাম তো তেমন সিরিয়াস কিছু হয় নি। দিন পনেরোর মধ্যে সুস্থ হয়ে বাসায় যাবে। দুটা ফ্র্যাকচার হয়েছে, তবে সিরিয়াস কিছু না।'

ডাক্তারের কথামত পনেরো দিনের মাথাতেই জমীর সাহেব বাড়ি ফিরলেন। তবে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে নয়। বাঁ পা অচল হয়ে গেল। এ দেশে না-কি কিছু করা সম্ভব না। বিদেশে যদি কিছু হয়।

চাকরি শেষ হবার আগেই জমীর সাহেব রিটায়ার করলেন। তিনি এবং তাঁর পরিবারের কেউ ঐ হলুদ চিঠিটার কথা একবারও তুলল না। যেন ঐ চিঠি একটা অভিশপ্ত চিঠি। তার কথা তোলা উচিত না। চিঠিটা জমীর সাহেবের শোবার ঘরের টেবিলের তিন নম্বর ড্রয়ারে পড়ে রইল। মাঝে মাঝে জমীর সাহেব চিঠিটা বের করে পড়েন এবং তাঁর

অচল পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন। সেই রাতে তাঁর এক ফোঁটা ঘুম হয় না। কেমন ভয়ভয় লাগতে থাকে।

নতুন বছরের গোড়াতে ঝিকাতলার বাসা উঠিয়ে উত্তর শাহজাহানপুরে সস্তায় একটা ফ্ল্যাটে তাঁরা চলে গেলেন। রোজগার কমেছে। এখন টাকা-পয়সা সাবধানে খরচ করতে হবে। নতুন ফ্ল্যাটে দু'টা মাত্র শোবার ঘর। একটিতে জমীর সাহেব শাহানাকে নিয়ে থাকেন, অন্যটিতে মিতু আর তার ছোট বোন ইরা থাকে। জমীর সাহেবের বড় ছেলে থাকে বসার ঘরে। একটা খাট বসার ঘরে গাদাগাদি করে রাখা হয়েছে। এই বাড়িতে মাস তিনেক কাটানোর পর আরেকটি বিয়ারিং চিঠি এলো। আগের মতো গোটা গোটা হরফে লেখা। মোটা কলমের নিচ দিয়ে মেয়েলী অক্ষরে সুস্মিতা লিখছে–

প্রিয়তমেষু,
তুমি কেমন আছ? এত দুশ্চিন্তা করছ কেন? তোমাকে দুশ্চিন্তা করতে দেখলে আমার ভালো লাগে না। সংসারে দুঃখ-কষ্ট সমস্যা থাকেই। এতে বিচলিত হলে চলে? মনে সাহস রাখো। আচ্ছা একটা কথা– তোমার বড় ছেলেটাকে কিছুদিন ঢাকা শহরের বাইরে রাখতে পারো না? আমার কেন জানি মনে হচ্ছে ও কোনো ঝামেলায় পড়ে যাবে। তোমাদের গ্রামের বাড়িতে ওকে কিছু দিনের জন্যে পাঠিয়ে দাও না। ও যেতে চাইবে না। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করাও।

বিনীতা
তোমার সুস্মিতা

এবার আর সুস্মিতার চিঠি নিয়ে কেউ হাসাহাসি করল না। চিঠি পড়বার সময় শাহানার হাত থরথর করে কাঁপতে লাগল। জমীর সাহেব অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেলেন। বড় ছেলে সুমনকে গ্রামের বাড়িতে...প্রশ্নই ওঠে না। কারণ তার বি.এ. ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হয়েছে। দু'টা পেপার হয়ে গেছে। তবু শাহানা বললেন, থাক, পরীক্ষা দিতে হবে না। ওকে পাঠিয়ে দাও।

জমীর সাহেব বললেন, দরকার আছে বলে তো মনে হয় না। চিঠি পাওয়ার পরেও তো পনেরো দিন হয়ে গেল।

'হোক পনেরো দিন, পাঠিয়ে দাও। আমার ভালো লাগছে না।'

'আচ্ছা বলে দেখো। যদি যেতে রাজি হয় তাহলে যাক।'

সুমন যেতে রাজি হলো। শুধু যে রাজি হলো তাই না, তৎক্ষণাৎ যেতে রাজি। টাকা দিলে আজ রাতের ট্রেনেই রওনা হয়ে যায় এমন অবস্থা। ঠিক হলো সে সোমবার সকালের ট্রেনে যাবে। জমীর সাহেবও সঙ্গে যাবেন। পৈতৃক বাড়ি ঠিকঠাক করবেন, জমিজমার খোঁজখবর করবেন। সম্ভব হলে কিছু জমি বিক্রি করে আসবেন। টাকা-পয়সার খুব টানাটানি যাচ্ছে।

তাদের যাবার কথা সোমবারে। তার আগের দিন অর্থাৎ রোববার ভোররাতে পুলিশ এসে জমীর সাহেবের বাড়ি ঘেরাও করে সুমনকে ধরে নিয়ে গেল। হতভম্ব জমীর সাহেবকে পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন– আপনার ছেলের বিরুদ্ধে মার্ডার চার্জ আছে। সাত দিন আগে চারজনে মিলে খুনটা করেছে। কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার। আপনার ছেলে এই চারজনের একজন। আপনি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ছেলেকে রাজসাক্ষী হতে রাজি করান। এতে আপনারও লাভ, আমাদেরও লাভ। না হলে কিন্তু ফাঁসি-টাসি হয়ে যাবে। পলিটিক্যাল প্রেসারও আছে।

সুমন রাজসাক্ষী হতে রাজি হলো না। দীর্ঘদিন মামলা চলল। রায় বেরুতে লাগল দু'বছর। তিনজনের সাত বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড, একজনের ফাঁসি। সেই একজন সুমন। অন্য তিনজন ছেলেটাকে ধরে রেখেছিল খুন করেছে সুমন। ধারালো ক্ষুর দিয়ে রগ কেটে দিয়েছে।

পাঁচ বছর কেটে গেছে। পরবর্তী বেয়ারিং চিঠিটি এলো পাঁচ বছর কেটে যাবার পর। এই পাঁচ বছরে জমীর সাহেবের সংসারে বড় রকমের উলট-পালট হয়েছে। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। মিতুর বিয়ে হয়েছে কৃষি খামারের এক ম্যানেজারের সঙ্গে। সে স্বামীর সঙ্গে গোপালপুরে থাকে। ছোট মেয়ের বিয়ে হয়েছে ওষুধ কোম্পানির এক কেমিস্টের সঙ্গে। তারা ঢাকা শহরেই থাকে। প্রায়ই বাবা-মাকে দেখতে আসে। বড় মেয়ের কোনো ছেলেপুলে হয় নি। ছোট মেয়ের একটি ছেলে হয়েছে। ছেলের নাম ফরহাদ। এই ছেলেটি জমীর সাহেবের খুব ভক্ত। তাঁর কাছে এলেই কোলে উঠে বসে থাকে, কিছুতেই কোল থেকে নামানো যায় না।

পাঁচ বছর পর একদিন পিওন এসে বলল, 'স্যার, আপনার একটা বেয়ারিং চিঠি আছে, রাখবেন?' জমীর সাহেব শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

সেদিন ইরারা বেড়াতে এসেছে। জমীর সাহেবের কোলে ফরহাদ। তিনি ফরহাদকে মাটিতে নামিয়ে চিঠি হাতে নিলেন। হাতের লেখা চিনতে তাঁর অসুবিধা হলো না। সেই হাতের লেখা। সেই ন্যাপথলিনের গন্ধ।

পিওন বলল, চার টাকা লাগবে।

জমীর সাহেব একবার ভাবলেন, বলবেন, চিঠি রাখব না। তিনি তা বলতে পারলেন না। যন্ত্রের মতো পকেটে হাত দিয়ে টাকা বের করলেন। চিঠি পাঞ্জাবির পকেটে রেখে দিলেন। কাউকে কিছু বললেন না। তাঁর বমি বমি ভাব হলো। মাথা ঘুরতে লাগল।

রাতে তিনি কিছু খেলেন না। ইরাদের আসা উপলক্ষে ভালোমন্দ রান্না হয়েছিল। তিনি কিছুই মুখে দিলেন না। ইরা বলল, বাবা, তোমার কি হয়েছে?

তিনি ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'কিছু হয় নি। শরীরটা ভালো না।'

'রোজই তুমি বলো শরীর ভালো না, অথচ একজন ভালো ডাক্তার দেখাও না। একজন ভালো ডাক্তার দেখাও বাবা।'

'দেখাব।'

'আর মা'কেও একজন ভালো ডাক্তার দেখাও।'

মেয়ে-জামাই রাত ন'টার দিকে চলে গেল। ফরহাদ গেল না, সে নানার সঙ্গে থাকবে।

সারারাত জমীর সাহেবের ঘুম হলো না। পরদিন হু-হু করে গায়ে জ্বর এসে গেল। জ্বরের মূল কারণ কাউকে বলতে পারলেন না। বেলা যতই বাড়তে লাগল জ্বর ততই বাড়তে লাগল। দুপুরের পর ঘাম হতে লাগল। ইরা হতভম্ব হয়ে বলল, 'বাবা, চলো তোমাকে ক্লিনিকে নিয়ে ভর্তি করি। আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না। তুমি এ রকম ঘামছ কেন? হার্টের কোনো সমস্যা না তো?'

জমীর সাহেব ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'চিঠি পেয়েছি।'

'চিঠি পেয়েছি মানে? কার চিঠি?'

'বেয়ারিং চিঠি।'

ইরা দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, 'কি লেখা এবারের চিঠিতে?'

'চিঠি পড়ি নি।'

'পড়ে দেখো। না পড়েই এ রকম করছ কেন? হয়তো এবার কোনো ভালো খবর আছে।'

জমীর সাহেব কাঁপা গলায় বললেন, 'ভয় লাগছে রে ইরা।'

'ভয়ের কিছু নেই। দাও, আমার কাছে দাও ,আমি পড়ি।'

ইরা চিঠি খুলে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেল। অন্যদের সেই চিঠি দেখাল। যারা দেখল প্রত্যেকেই গম্ভীর হলো, কারণ চিঠিতে কিছু লেখা নেই। সাদা একটা পাতা। শেষে নাম সই করা–বিনীতা, তোমার সুস্মিতা। এই সাদা না-লেখা অংশে কি বলতে চাচ্ছে সুস্মিতা? কে সে? কেনই বা সে চিঠি লিখে, আবার আজ কেনই বা লিখল না?

বীণার অসুখ

বীণার বয়স একুশ।

সে লালমাটিয়া কলেজে বি.এ. সেকেন্ড ইয়ারে পড়ত। বীণার মামা ইদরিশ সাহেব একদিন হঠাৎ বললেন, বীণা, তোর কলেজে যাবার দরকার নেই। বাসায় থেকে পড়াশোনা কর। পরীক্ষার সময় পরীক্ষা দিলেই হবে। কলেজে আজকাল কি পড়াশোনা হয় তা তো জানাই আছে। যাওয়া না-যাওয়া একই।

বীণা ঘাড় নেড়ে ক্ষীণস্বরে বলল, 'জি আচ্ছা।'

মামার কথার উপর কথা বলার সাহস বীণার নেই। তার পড়াশোনার যাবতীয় খরচ মামা দেন। গত বছর গলার একটা চেইন বানিয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া তার বিয়ের কথা হচ্ছে। বিয়ে যদি ঠিকঠাক হয় সেই খরচও মামাকেই দিতে হবে। বীণার বাবা প্যারালিসিস হয়ে দেশের বাড়িতে পড়ে আছেন। তাঁর পক্ষে একটা টাকাও খরচ করা সম্ভব না। তিনি সবার কাছ থেকে টাকা নেন। কাউকে কিছু দেন না।

ইদরিশ সাহেব বললেন, 'বীণা তুই আমাকে এক গ্লাস শরবত বানিয়ে দে। আর শোন, কলেজে না-যাওয়া নিয়ে মন-টন খারাপ করিস না। মন খারাপের কিছু নাই।'

'জি আচ্ছা, মামা।'

বীণা শরবত আনতে চলে গেল। তার মনটা অসম্ভব খারাপ। কলেজ বন্ধ করে দেবার কোনো কারণ সে বুঝতে পারছে না। জিজ্ঞেস করার সাহসও নেই। দিনের পর দিন ঘরে বসে থেকেই–বা সে কি করবে? শরবত বানাতে বানাতে তার মনে হলো– হয়তো তার বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গেছে। গফরগাঁয়ের ঐ ছেলে শেষ পর্যন্ত হয়তো রাজি হয়েছে। ওরাই হয়তো বলেছে– মেয়েকে কলেজে পাঠাবেন না। বিয়ে ঠিকঠাক হলে ছেলে পক্ষের লোকজন অদ্ভুত অদ্ভুত শর্ত দিয়ে দেয়।

গফরগাঁয়ের ঐ ছেলেটাকে বীণার একেবারেই পছন্দ হয় নি। কেমন যেন পশু পশু চেহারা। সোফায় বসেছিল দুই হাঁটুতে দু'হাত রেখে। মুখ একটু হাঁ হয়েছিল। সেই হাঁ-করা মুখের ভেতর কালো কুচকুচে জিভ। বীণার দিকে এক পলক তাকাতেই বীণার বুক ধক করে উঠল। মনে হলো একটা পশু জিভ বের করে বসে আছে। তার নাকে ঝাঁঝালো গন্ধও এসে লাগল। গন্ধ ঐ লোকটার গা থেকে আসছিল। টক দুধ এবং পোড়া কাঠের গন্ধ একত্রে মেশালে যে রকম গন্ধ হয় সে রকম একটা গন্ধ। গা কেমন ঝিমঝিম করে।

লোকটা তাকে কোনো প্রশ্ন করল না। শুধু পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইল। বীণার একবার মনে হলো, লোকটার চোখে হয়তো পাতা নেই। সাপের যেমন চোখের পাতা

থাকে না সে রকম। লোকটার সঙ্গে বয়স্ক যে দু'জন মানুষ এসেছিলেন তারা অনবরত কথা বলতে লাগলেন। একজন বীণাকে ডাকতে লাগলেন– আন্টি। চুল-দাড়ি পাকা বয়স্ক একজন লোক যদি আন্টি ডাকে তখন ভয়ঙ্কর রাগ লাগে। কোনো কথারই জবাব দিতে ইচ্ছা করে না। বীণা অবশ্যি সব প্রশ্নের জবাব দিল, কারণ মামা তার পাশেই বসে আছেন। মামা বসেছেন সোফার ডান দিকে, সে বাঁ দিকে। প্রশ্নের জবাব না দেয়ার কোনো উপায় নেই।

'তারপর আন্টি রবিঠাকুর কত সনে নোবেল পুরস্কার পান তা জানা আছে?'

'জি না।'

'উনিশশ' তের। অবশ্যি উনিশশ' তেরতে না পেয়ে উনিশশ' একত্রিশে পেলেও কিছু যেত আসত না। তবু তারিখটা জানা দরকার। এটা হচ্ছে জেনারেল নলেজ। মেয়েরা শুধু রান্নাবান্না করবে তা– তা না– তাদের পৃথিবীতে কি হচ্ছে না হচ্ছে তাও তো জানতে হবে। কি বলেন আন্টি?

'জি।'

'আন্টি, আপনি খবরের কাগজ পড়েন?'

'না।'

'এইটা হচ্ছে মেয়েদের একটা কমন দোষ। কোনো মেয়ে খবরের কাগজ পড়ে না। আপনি কেন খবরের কাগজ পড়েন না, না-পড়ার কারণটা কি আমাদের একটু বলুন তো আন্টি।'

বীণা কিছু বলল না। মামা পাশে বসে আছেন এই ভয়েই বলল না– কারণ মামা খবরের কাগজ রাখেন না বলেই সে খবরের কাগজ পড়ে না। এই তথ্যটা এঁদের জানানো নিশ্চয়ই ঠিক হবে না। মামা রাগ করবেন।

ইদরিশ সাহেব বললেন, মা বীণা, ইনাদের চা-মিষ্টি দাও। চার-পাঁচ জাতের মিষ্টি টেবিলে সাজানো। বীণা প্লেটে উঠিয়ে সবার দিকে এগিয়ে দিল। লোকটাকে যখন দিতে গেল তখন লোকটা অদ্ভুত এক ধরনের শব্দ করল। থাবার মতো বিশাল হাত বাড়িয়ে মিষ্টির থালা নিল। বীণা লক্ষ করল, লোকটির আঙুলের নখ কালচে ধরনের। নখের মাথা পাখির নখের মতো সুঁচালো। বীণার গা সত্যি সত্যি কাঁটা দিয়ে উঠল। সে মনে মনে বলল, আল্লা, এই লোকটা যেন আমাকে পছন্দ না করে। আল্লা, এই লোকটা যেন আমাকে পছন্দ না করে।

লোকটা বীণাকে পছন্দ করল কি করল না কিছুই বোঝা গেল না। ইদরিশ সাহেব এই প্রসঙ্গে বাসার কারো সঙ্গেই কোনো আলাপ করলেন না। ইদরিশ সাহেবের এই হলো স্বভাব। বাসার কারোর সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে বলবেন না। নিজে যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন।

এই যে তিনি আজ বীণার কলেজে যাওয়া বন্ধ করলেন– এর কারণ তিনি কাউকে বলবেন না। ইদরিশ সাহেবের জীবনের মূলমন্ত্র হচ্ছে– নারী জাতির সঙ্গে কোনো বিষয় আলাপ না করা। নারী জাতির সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনার ফল একটাই– সময় নষ্ট। কি দরকার সময় নষ্ট করে?

ইদরিশ সাহেবের বাসায় তিনি ছাড়া সবাই মেয়ে। সব মিলিয়ে সাতজন মেয়ে। ইদরিশ সাহেবের স্ত্রী, চার কন্যা, তাঁর এক ছোট বোন এবং কাজের একটি মেয়ে। তাঁর বাসায় দুটা বিড়াল থাকে। এই বিড়াল দুটিও মেয়ে-বিড়াল। সঙ্গত কারণেই ইদরিশ সাহেব বাসায় যতক্ষণ থাকেন মনমরা হয়ে থাকেন। চারদিকে মেয়েজাতি নিয়ে বাস করতে তাঁর ভালো লাগে না। তিনি তাঁর ব্যবসা, তাঁর পরিকল্পনা কিছুই কাউকে বলেন না।

দিন পনেরো বীণার খুব ভয়ে ভয়ে কাটল। কে জানে হয়তো লোকটা তাকে পছন্দ করে ফেলেছে। তার চেহারা এমন কিছু খারাপ না, পছন্দ করতেও পারে। রঙ মোটামুটি ফর্সা। চোখ দুটা মায়া মায়া, লম্বা হালকা-পাতলা শরীর। সাজলে তাকে ভালোই দেখায়। পছন্দ করে ফেললে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বীণা বেশ কয়েকবার লজ্জার মাথা খেয়ে তার মামিকে জিজ্ঞেস করেছে, 'মামি মামা কি কিছু বলেছে?'

বীণার মামি হাসিনা পৃথিবীর সরলতম মহিলা। অতি সহজ কথাও তিনি বুঝেন না। একটু ঘুরিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করলে এমনভাবে তাকান যে, মনে হয় অথৈ জলে পড়েছেন। বীণার সহজ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন– কিসের কথা রে?

'ঐ যে শুক্রবার যে আসল?'

'কে আসল শুক্রবারে?'

'তিনজন লোক আসল না?'

'তিনজন লোক আবার কখন আসল?'

'বিয়ের আলাপ নিয়ে আসল না?'

'ও আচ্ছা– মনে পড়েছে। না, কিছু বলে নাই। তোর মামা কি কখনো কিছু বলে? হঠাৎ একদিন শুনবি বিয়ের দিন-তারিখ হয়ে গেছে। তোর মামা আগেভাগে কিছু বলবে? কোনোদিন না।'

মাসখানিক কেটে যাবার পরেও বীণার ভয় কাটল না। মামা তাকে কোনো কারণে ডাকলেই মনে হতো, এই বুঝি বলবেন, বীণা, তোর বিয়ের তারিখ করে ফেললাম। শ্রাবণ মাসের বারো, মঙ্গলবার। তুই তোর বাবাকে চিঠি লিখে দে।

বীণা আতঙ্কে আতঙ্কেই ভয়াবহ কিছু দুঃস্বপ্নও দেখল। এই দুঃস্বপ্নগুলির প্রতিটিতে তার বিয়ে হয় সুন্দর একটা ছেলের সঙ্গে। বাসরঘরে সে আর ছেলেটা থাকে আর সবাই চলে যায়। লজ্জায় সে মাথা নিচু করে থাকে। তখন তার স্বামী আদুরে গলায় বলে– লজ্জায় দেখি মরে যাচ্ছ। এই, তাকাও না আমার দিকে। তাকাও। সে তাকায়। তাকাতেই তার গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়। মানুষ কোথায়, একটা কুকুরের মতো পশু থাবা গেড়ে বসে আছে। হাঁ-করা মুখের ভেতর কুচকুচে কালো একটা জিহ্বা। জিহ্বা মাঝে মাঝে মুখের ভেতর থেকে বের হয়ে আসছে। পশুটার মুখ সুঁচালো। তার গা থেকে টক দৈ আর পোড়া কাঠের গন্ধ ভেসে আসছে। স্বপ্নে মানুষ গন্ধ পায় না। কিন্তু বীণা এই জাতীয় স্বপ্নে গন্ধ পেত। তীব্র কটুগন্ধেই এক সময় ঘুম ভেঙে যেত।

প্রায় দেড় মাস এ রকম আতঙ্কে কাটল। তারপর আতঙ্ক হঠাৎ করেই কেটে গেল। কারণ, ইদরিশ সাহেব এক ছুটির দিনের দুপুরে ভাত খেতে খেতে বললেন, 'বিয়েটা ভেঙে দিলাম।'

হাসিনা বললেন, 'কার বিয়ে ভেঙে দিলে?'

'বীণার, ঐ যে তিনজন এসেছিল শুক্রবারে। খুব চাপাচাপি করছিল। মেয়ে না-কি তাদের খুব পছন্দ। ওদের বাড়ির অবস্থা ভালো। গফরগাঁয়ে কাপড়ের ব্যবসা আছে। গ্রামের বাড়িতে ধান-ভাঙা কল দিয়েছে। বড় বড় আত্মীয়স্বজন।'

'তাহলে বিয়ে ভেঙে দিলে কেন?'

'ছেলের গায়ে বিশ্রী গন্ধ। ঘোড়ার আস্তাবলে গেলে যেমন গন্ধ পাওয়া যায় সেই রকম। যে ক'বার এই ছেলে আমার কাছে এসেছে এ রকম গন্ধ পেয়েছি। কি দরকার?'

হাসিনা দুঃখিত মুখ করে বললেন, আহা, 'গন্ধের জন্যে বিয়েটা বাতিল করে দিলে! ভালোমত সাবান দিয়ে গোসল দিলেই তো গন্ধ চলে যায়।'

ইদরিশ কড়া গলায় বললেন, 'যা বুঝ না তা নিয়ে কথা বলবে না। তুমি রোজ গিয়ে গোসল করিয়ে আসবে না-কি? মেয়েছেলে মেয়েদের মতো থাকবে। সবকিছুর মধ্যে কথা বলবে না।'

'রাগ করছ কেন? রাগ করার মতো কি বললাম?'

'চুপ। আর একটা কথাও না।'

ইদরিশ সাহেবের দুর্ব্যবহারে হাসিনা কাঁদতে বসেন, তবে বীণার আনন্দের সীমা থাকে না। যাক্, শেষ পর্যন্ত লোকটির সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে না। মামার প্রতি কৃতজ্ঞতায় বীণার মন ভরে যায়। মামা কথা না বললেও মানুষ খারাপ না। কে জানে এই যে তাকে কলেজে যেতে নিষেধ করছেনে এরও কোনো ভালো দিক নিশ্চয়ই আছে। মামা যদি শুধু কারণটা বলত! কিন্তু মামা বলবে না। অদ্ভুত মানুষ।

নিতান্তই আকস্মিকভাবে বীণা তার কলেজ বন্ধ হবার রহস্য জেনে ফেলল। ইদরিশ সাহেব বীণার বাবাকে চিঠিতে কারণটা জানিয়েছেন। খামে ভরার আগে এই চিঠি বীণা পড়ে ফেলল।

পাকজনাবেষু

দুলাভাই,

আমার সালাম জানিবেন। পর সমাচার এই যে, বীণার কলেজে যাওয়া একটি বিশেষ কারণে বন্ধ করিতে হইয়াছে। বীণা ইহাতে কিঞ্চিৎ মনে কষ্ট পাইয়াছে। কিন্তু ইহা ছাড়া অন্য উপায় দেখিলাম না। এখন আপনাকে কারণ বলিতেছি।

জোবেদ আলি নামক গফরগাঁয়ের জনৈক যুবকের সহিত বীণার বিবাহের আলাপ হইয়াছিল। পাত্রপক্ষের, বিশেষ করিয়া পাত্রের বীণাকে খুবই পছন্দ হইয়াছিল। একটি বিশেষ কারণে বিবাহের প্রস্তাব বাতিল করিয়া দিতে হইয়াছে। এখন কিছুটা সমস্যা দেখা

দিয়েছে। উক্ত জোবেদ আলি প্রায়ই বীণাকে অনুসরণ করিয়া কলেজ পর্যন্ত যায়। ইহা আমার কাছে অত্যন্ত সন্দেহজনক বলিয়া মনে হইল। আজকালকার ছেলেদের মতিগতির কোনো ঠিক নাই। একবার যদি এসিড জাতীয় কিছু দেয় তাহা হইলে সর্বনাশের কোনো শেষ থাকিবে না। যাহা হউক, আপনি তাহার বি.এ. পরীক্ষা নিয়া কোনো চিন্তা করিবেন না। আমি কলেজের প্রিন্সিপ্যালের সহিত আলাপ করিয়াছি। তিনিও বলিয়াছেন, কোনো অসুবিধা হইবে না। আগেকার মতো কলেজগুলি পার্সেন্টেজ নিয়া ঝামেলা করে না।

আপনার শারীরের হাল অবস্থা এখন কি? শরীরের যত্ন নিবেন। বীণাকে লইয়া অযথা চিন্তাগ্রস্ত হইবেন না।

চিঠি পড়ে বীণার গা কাঁপতে লাগল। কি সর্বনাশের কথা! ঐ লোক তার পেছনে পেছনে যায়, সে তো একদিনও টের পায় নি। আর তার মামার কি উচিত ছিল না ঘটনাটা তাকে জানানো? সে এখন কলেজে যাচ্ছে না ঠিকই কিন্তু অন্য জায়গায় তো যাচ্ছে। আগে জানলে তাও যেত না। ঘরে বসে থাকত। অবশ্যই মামার উচিত ছিল ঘটনাটা তাকে জানানো।

বীণাকে খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে বলা ঠিক হবে না। সে যদি বুদ্ধিমতী হতো তাহলে চট করে বুঝে ফেলত তাকে ঘটনাটা জানানোর জন্যেই ইদরিশ সাহেব খামে ভরার আগে চিঠিটা দীর্ঘ সময় টেবিলে ফেলে রেখেছিলেন। এই জাতীয় ভুল তিনি কখনো করেন না।

বীণা বাড়ি থেকে বের হওয়া পুরোপুরি বন্ধ করে দিল। আগের ভয়ের স্বপ্নগুলি আবার দেখতে লাগল। এবারের স্বপ্নে আরও সব কুৎসিত ব্যাপার ঘটতে লাগল। এমন হলো যে, ঘুমুতে পর্যন্ত ভয় লাগে।

হাসিনা বললেন, 'কি হয়েছে তোর বল তো?'

বীণা ফ্যাকাসে হাসি হেসে বলে, 'কই কিছু হয় নি তো?'

'তুই তো শুকিয়ে চটি জুতা হয়ে যাচ্ছিস। তোর তো আর বিয়েই হবে না। এরকম শুকনো মেয়েকে কে বিয়ে করবে বল? গায়ে গোশত না থাকলে ছেলেরা মেয়েদের পছন্দ করে না। ছেলেগুলি হচ্ছে বদের বদ। ঝাঁটা মারি এদের মুখে।'

বীণার বন্দীজীবন কাটতে লাগল। মেয়েরা যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজেদের খুব সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। বীণাও খাপ খাইয়ে নিল। সারাদিন তিন কামরার ঘরেই সময় কাটে। বাইরের বারান্দায় ভুলেও যায় না। বাইরের বারান্দায় দাঁড়ালে রাস্তার অনেকটা চোখে পড়ে। তার ভয়, বারান্দায় দাঁড়ালে যদি লোকটাকে দেখে ফেলে! এত সাবধানতার পরেও একদিন দেখা হয়ে গেল। বারান্দায় কাপড় শুকাতে দেয়া হয়েছে। হাসিনা বললেন, বৃষ্টি এসেছে, কাপড়গুলি নিয়ে আয় তো বীণা। বীণা কাপড় আনতে গিয়ে পাথরের মতো জমে গেল। বাড়ির সামনের রাস্তাটার অপর পাশে জারুল গাছের নিচে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে বীণার দিকে। মুখ হাঁ হয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে খানিকটা কুঁজো হয়ে। বীণাকে দেখেই সে দ্রুত রাস্তা পার হয়ে এপাশে চলে

এলো। হাত ইশারা করে কি যেন বলল। বীণা চিৎকার করে ঘরে ঢুকল। ঘণ্টা খানিকের মধ্যে তার জ্বর উঠে গেল একশ' তিন।

হাসিনা বললেন, 'এটা কেমন কথা? লোকটা তো বাঘও না, ভালুকও না। তাকে দেখে এত ভয় পাওয়ার কি আছে?'

বীণা বিড়বিড় করে বলল, 'আমি জানি না মামি। কেন এত ভয় লাগছে আমি জানি না। আপনি আমাকে ধরে বসে থাকেন। কেমন যেন লাগছে মামি।'

ইদরিশ সাহেব সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে সব শুনলেন। কাউকে কিছুই বললেন না। সহজ ভঙ্গিতে খাওয়া-দাওয়া করলেন। বড় মেয়েকে অংক দেখিয়ে দিলেন। রাত সাড়ে ন'টার সময় বললেন, 'একটা স্যুটকেসে বীণার কাপড় গুছিয়ে দাও তো। রাত এগারোটায় বাহাদুরাবাদ এক্সপ্রেস। বীণাকে দেশের বাড়িতে রেখে আসি।'

হাসিনা হতভম্ব হয়ে বললেন, 'আজ রাতে?'

ইদরিশ সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, 'আজ রাতে নয় তো কি পরশু রাতে? জোবেদ হারামজাদা বড় বিরক্ত করছে। আমি আরও কয়েকদিন দেখেছি।'

'আজ রাতে যাওয়ার দরকার কি, কাল যাও।'

'কাল যেতে পারলে আজ যেতে অসুবিধা কি? তোমরা মেয়ে মানুষরা যা বোঝ না শুধু সেটা নিয়ে কথা বলো। কাপড় গুছিয়ে দিতে বলেছি, গুছিয়ে দাও।'

'বীণার জ্বর।'

'জ্বরের সঙ্গে কাপড় গোছানোর সম্পর্ক কি? কাপড় তো তুমি গোছাবে। তোমার গায়ে তো জ্বর নেই।'

হাসিনা কাপড় গুছিয়ে দিলেন। তাঁর স্বামীকে তিনি চেনেন। কথাবার্তা বলে লাভ হবে না। বীণা একশ' দুই পয়েন্ট ফাইভ জ্বর নিয়ে বাহাদুরাবাদ এক্সপ্রেসে উঠল। বাড়িতে পৌছতে পৌছতে সেই জ্বর বেড়ে একশ' চার পয়েন্ট ফাইভ।

ইদরিশ সাহেব ছুটি নিয়ে যান নি। বীণাকে রেখে পরদিনই তাঁকে চলে আসতে হলো। বীণা সপ্তাহখানিক জ্বরে ভুগে কংকালের মতো হয়ে গেল। মুখে রুচি নেই। যা খায় তা-ই বমি করে ফেলে দেয়। রাতে ঘুম হয় না। প্রায় রাতই জেগে জেগে কাটিয়ে দেয়। চোখের পাতা এক হলেই ভয়ঙ্কর সব স্বপ্ন দেখে।

এই সময় তার ভয়ের অসুখ হয়। সারাক্ষণই ভয় লাগে। কোনো কারণ ছাড়াই অস্বাভাবিক ভয়। কেউ হয়তো সামনে দিয়ে গেল, ওম্নি বীণার বুক ধড়াস করে ওঠে। বাতাসে জানালার পাট নড়ে উঠল, বীণার হৃৎপিণ্ড লাফাতে শুরু করে, সে আতঙ্কে অস্থির হয়ে যায়। প্রচণ্ড ঘাম হয়।

বীণাদের এই বসতবাড়িটা খুবই পুরানো। বীণার দাদা এক হিন্দু ব্যবসায়ীর কাছ থেকে খুব সস্তায় এই বাড়ি কিনে নিয়েছিলেন। অনেকখানি জায়গা নিয়ে বাড়ি। পুরো জায়গাটা দেয়াল দিয়ে ঘেরা। সংস্কারের অভাবে দেয়াল জায়গায় জায়গায় ভেঙে

পড়েছে। দোতলার ঘরের বেশিরভাগই ব্যবহারের উপযোগী নয়। একতলার তিনটা ঘর শুধু ব্যবহার হয়। দোতলার ঘর তালাবদ্ধ থাকে।

একটা ঘরে বীণার বাবা এমদাদ সাহেব থাকেন। প্যারালিসিসের কারণে এই ঘর থেকে বের হবার তাঁর কোনো উপায় নেই। অন্য একটা ঘরে বীণা এবং বীণার দূর সম্পর্কের মামি মরিয়ম থাকেন। ঘরের কাজকর্ম করার জন্যে বাতাসী নামের কম বয়েসি একটা মেয়ে থাকে। তার চোখের অসুখ আছে। রাতে সে কিছুই দেখে না।

বাড়িতে মানুষ বলতে এই চারটি প্রাণী। সন্ধ্যার পর থেকেই বীণার ভয় ভয় করে। দোতলার বারান্দায় কিসের যেন শব্দ হয়। মনে হয় খড়ম পরে কেউ যেন হাঁটে। বীণা জানে ইঁদুর শব্দ করছে– তবু তার ভয় কাটে না। দুর্বল নার্ভের কারণেই হয়তো আতঙ্কে তার শরীর কাঁপতে থাকে। সে ফিসফিস করে বলে– কিসের শব্দ মামি?

মামি ঘরের কাজ করতে করতে নির্বিকার গলায় বলেন–'জানি না।'

'মনে হয় ইঁদুরের শব্দ, তাই না মামি?'

'হইতেও পারে। আবার অন্য কিছুও হইতে পারে।'

'অন্য কিছু কি?'

'সইন্ধ্যা বেলায় এরার নামও নেওন নাই মা। খারাপ বাতাস হইতে পারে।'

'খারাপ বাতাস?'

'কতদিনের পুরানো বাড়ি। উপরের ঘরগুলান খালি পইড়া থাকে। কেউ বাত্তি দেয় না। ঘরে বাত্তি না দিলে খারাপ বাতাসের আনাগোনা হয়।'

'বাতি দেব না কেন? বাতি দিলেই তো হয়। কাল থেকে রোজ সন্ধ্যায় বাতি দিবেন মামি।'

'আইচ্ছা দিমুনে। অখন ঘুমাও।'

বীণা শুয়ে থাকে। ঘুম আসে না। রাত যতই বাড়তে থাকে দোতলার শব্দ ততই বাড়তে থাকে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয় বীণার বাবার গোঙানি। গভীর রাতে তিনি হাঁটুর ব্যথায় গোঙানির মতো শব্দ করেন। সেই শব্দও বীণার কানে অমানুষিক শব্দ বলে মনে হয়। যেন বীণার বাবা নয়, অন্য কেউ শব্দ করছে। সেই অন্য কেউ মানুষ গোত্রীয় নয়। এক ধরনের চাপা হাসিও শোনা যায়।

বীণাদের স্নানঘর মূল ঘর থেকে অনেকটা দূরে। স্নানঘর বীণার খুব প্রিয়। শ্যাওলা ধরা দেয়াল ঘেরা ছোট্ট চারকোণা একটা জায়গা। ভেতরে চৌবাচ্চা আছে। স্নানঘরের ছাদটা ছিল টিনের। গত আশ্বিন মাসের ঝড়ে টিনের ছাদ উড়ে গেছে। সেই ছাদ আর ঠিক করা হয় নি। গোসলের সময় মাথার উপর থাকে খোলা আকাশ। ঠিক দুপুর বেলায় সূর্যের ছায়া পড়ে চৌবাচ্চার পানিতে। মগ ডুবালেই চৌবাচ্চা থেকে আলো ঠিকরে পড়ে চারদিকের সবুজ দেয়ালে। বীণার বড় ভালো লাগে। দুপুর বেলা বীণার অনেকখানি সময় এই গোসলখানায় কেটে যায়। রোজই মনে হয়, গ্রামের বাড়িতে এসে ভালোই হয়েছে। রাতের তীব্র আতঙ্কের কথা তখন আর মনে থাকে না।

এক দুপুর বেলায় এই গোসলখানাতেই অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার ঘটল। বীণা গোসল করছে, চারদিকে সুনসান নীরবতা। ঘন নীল আকাশের ছায়া পড়েছে চৌবাচ্চায়। বীণার চমৎকার লাগছে। শরীরটা আগের মতো দুর্বল লাগছে না। সে আপন মনে খানিকক্ষণ গুনগুন করল।

বীণা মাথায় পানি ঢালল। ঠাণ্ডা পানি। শরীর কেঁপে উঠল। আর তখনি সে অদ্ভুত একটা গন্ধ পেল। অদ্ভুত হলেও গন্ধ চেনা, গন্ধ সে আগেও পেয়েছে। বীণা আতংকে অভিভূত হয়ে পড়ল। নির্জন গোসলখানায় এই গন্ধ এলো কোত্থেকে? গুঁড়া কাঠ কয়লার সঙ্গে মেশানো নষ্ট দুধের মিশ্র গন্ধ। বীণা মগ ছুঁড়ে ফেলে গোসলখানার দরজায় আছড়ে পড়ল। দরজা খুলে দৌড়ে পালিয়ে যেতে হবে। আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা যাবে না। এক মুহূর্তও না।

আশ্চর্যের ব্যাপার! বীণা দরজা খুলতে পারল না। ছিটকিনি নামানো হয়েছে। বীণা প্রাণপণে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে অথচ দরজা এক চুলও নড়ছে না। যেন কেউ তাকে আটকে ফেলেছে। বীণা চিৎকার করবার চেষ্টা করল, গলা দিয়ে শব্দ বেরুল না। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল। দরজা তো নড়লই না, কোনো শব্দ পর্যন্ত হলো না। অথচ ঘরে অন্য এক রকম শব্দ হচ্ছে। যেন কি একটা পড়ছে চৌবাচ্চায়। টুপটাপ শব্দ। বৃষ্টির ফোঁটার মতো।

'কি পড়ছে?'

'কিসের শব্দ হচ্ছে?'

বীণা হতভম্ব হয়ে দেখল টকটকে লালবর্ণের রক্ত পড়ছে চৌবাচ্চায়। চৌবাচ্চার পানি ক্রমেই ঘোলা হয়ে উঠছে। কেউ একজন খোলা ছাদে বসে আছে। রক্ত পড়ছে তার গা থেকে।

বীণা সেই দৃশ্য দেখতে চায় না। সে কিছুতেই উপরের দিকে তাকাবে না। সে জানে, উপরের দিকে তাকালেই ভয়ঙ্কর কিছু দেখবে। এমন ভয়ঙ্কর কিছু যা ব্যাখ্যার অতীত, অভিজ্ঞতার অতীত।

'ও বীণা, বীণা।' বীণা তাকাল। হ্যাঁ, ঐ লোকটিই বসে আছে। তবে লোকটির মুখ পশুর মতো নয়। মায়া মাখা একটি মুখ। বড় বড় চোখ দুটি বিষণ্ন ও কালো। লোকটি পা ঝুলিয়ে বসে আছে। পা দুটি অস্বাভাবিক থ্যাঁতলানো। চাপ চাপ রক্ত সেই থ্যাঁতলানো পা বেয়ে চৌবাচ্চার জলে পড়ছে। লোকটি ভারী-শ্লেষ্মাজড়িত স্বরে ডাকল– বীণা, ও বীণা।

বীণা জ্ঞান হারাল।

তার জ্ঞান ফিরল তৃতীয় দিনে জামালপুর সদর হাসপাতালে। চোখ মেলে দেখল, আরও অনেকের সঙ্গে বিছানার পাশে ইদরিশ সাহেব বসে আছে। তাঁকে টেলিগ্রাম করে আনানো হয়েছে।

ইদরিশ সাহেব গভীর মমতার সঙ্গে বললেন, 'কি হয়েছে রে মা?'

বীণা ফুঁপাতে ফুঁপাতে বলল, 'ভয় পেয়েছি মামা।'

ইদরিশ সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, 'ভয় পাবারই কথা। ঐ জংলা বাড়িতে আমি নিজেই ভয় পাই আর তুই পাবি না? এখানে থাকার দরকার নেই, চল আমার সঙ্গে ঢাকায়। ঢাকায় গিয়ে আবার কলেজে যাওয়া-আসা শুরু কর। ঐ ছেলে আর তোকে বিরক্ত করবে না। বেচারা ট্রাক এ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে।'

বীণা চোখ বন্ধ করে ফেলল।

ইদরিশ সাহেব নিজের মনেই বললেন, পায়ের উপর দিয়ে ট্রাক চলে গেছিল। দুটা পা-ই ছাতু হয়ে গেছে। হাসপাতালে নেয়ার আঠারো ঘণ্টা পরে মারা গেছে। খবর পেয়ে দেখতে গিয়েছিলাম। না গেলে অভদ্রতা হয়।

ইদরিশ সাহেব খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'ছেলেটা খারাপ ছিল না, বুঝলি? খামোকাই আজেবাজে সন্দেহ করেছি। অতি ভদ্র ছেলে। তোর কথা জিজ্ঞেস করল। বেশ কয়েকবার জিজ্ঞেস করল।'

বীণার খুব ইচ্ছা করল বলতে– আমার কথা কি জিজ্ঞেস করল মামা? সে বলতে পারল না।

ইদরিশ সাহেব বললেন, 'ছেলেটার অ্যাকসিডেন্টের খবর তার অঞ্চলে পৌঁছামাত্র সেখানকার সব লোক এসে উপস্থিত। হাজার হাজার মানুষ। হাউমাউ করে কাঁদছে। দেখবার মতো একটা দৃশ্য! বুঝলি বীণা, আমরা মানুষের বাইরেরটাই শুধু দেখি। অন্তর দেখি না। এটা খুবই আফসোসের ব্যাপার। তোর যাতে ভালো বিয়ে হয় এই জন্যে আমাকে কিছু টাকাও দিয়ে গেছে। না করতে পারলাম না। একটা মানুষ মারা যাচ্ছে, কি করে 'না' বলি! ঠিক না?'

কুকুর

'কেমন আছেন প্রফেসর সাহেব?'

আমি মনের বিরক্তি গোপন করার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে বললাম, 'জি ভালো আছি।'

ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন, 'বসব খানিকক্ষণ?'

'জি বসুন। আমি অবশ্যি কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরুব।'

'আমাকে কি চিনতে পারছেন?'

'জি না।'

'ঐ যে মোড়ের সিগারেটের দোকানের সামনে আলাপ হলো। আপনি সিগারেট কিনছিলেন, আমি পান।'

আমি ভদ্রলোককে চিনতে পারলাম না। মোড়ের পানের দোকানে সামান্য আলাপের পর সারাজীবন চিনে রাখব আমার স্মৃতিশক্তি এত ভালো নয়। ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন, 'আমার নাম আলিমুজ্জামান। পোস্টাল সার্ভিসে ছিলাম। তিন বছর আগে রিটায়ার করেছি। এইটথ্ মে মঙ্গলবার। এখন ঘরেই থাকি। একটা বাগান করেছি।'

'ভালো, খুবই ভালো।'

ভদ্রলোক সোফায় বসেছেন। কৌতূহলী চোখে চারদিকে দেখছেন। বারবার আমার বইয়ের আলমিরায় তাঁর চোখ আটকে যাচ্ছে। আমি শংকিত বোধ করছি। এখনি হয়তো বলবেন, আপনার তো অনেক বই। কয়েকটা নিয়ে যাই। পড়ে ফেরত দেব।

আমি এখন পর্যন্ত কাউকে দেখি নি যে বই পড়ে ফেরত দেয়। ইনিও দেবেন তা মনে হয় না। বই নেয়ার ছুঁতায় রোজ এসে বিরক্ত করবেন। আমি এমন কোনো মিশুক লোক না যে এই বুড়ো মানুষটির সঙ্গ পছন্দ করব।

'প্রফেসর সাহেব আপনি কি ভূত-প্রেত এই সব বিশ্বাস করেন?

'জি না, করি না।'

'শুনে ভালো লাগল। আজকাল শিক্ষিত লোক দেখি এইসব বিশ্বাস করে। মনটা খারাপ হয়। মানুষ চাঁদে যাচ্ছে সেটা বিশ্বাস করছে আবার ভূতও বিশ্বাস করছে। ফিজিক্সের এক প্রফেসরের হাতে দেখেছি চারটা পাথরে আংটি।'

আমি চুপ করে রইলাম। আমার কাছ থেকে উত্তর না পেলে ভদ্রলোকের আলাপের উৎসাহ হয়তো কমে যাবে। তিনি বিদায় হবেন।

'প্রফেসর সাহেব!'

'জি।'

'আপনি কি কো-ইনসিডেন্সে বিশ্বাস করেন?'

'আপনার প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'কাকতালীয় ঘটনা।'

'আমি এখনো আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পারছি না।'

'আরেকদিন আপনাকে বলব। আজ মনে হচ্ছে আপনি একটু বিরক্ত। তবে ঘটনাটা বলা শুরু করলে আপনার বিরক্তি কেটে যেত।'

আমি ভদ্রলোকের কথায় সত্যিকার অর্থেই লজ্জিতবোধ করলাম। আমি বিরক্ত নিশ্চয়ই হয়েছি কিন্তু সেই বিরক্তি উনি ধরে ফেলবেন তা বুঝতে পারি নি। রিটায়ার্ড মানুষ। একা-একা থাকেন। কথা বলার সঙ্গী তো তাঁদেরই দরকার।

'প্রফেসর সাহেব, উঠি।'

'উঠবেন?'

'জি। আজকাল কোথাও বেশিক্ষণ বসি না। রিটায়ার্ড মানুষদের কেউ পছন্দ করে না। সবাই ভাবে সময় নষ্ট করার জন্যে গিয়েছি। তাছাড়া মানুষদের সঙ্গ আমি নিজেও যে খুব পছন্দ করি তা না।'

'আপনি আসবেন, আপনার সঙ্গে গল্প করব। কোনো অসুবিধা নেই। আজ অবশ্যি একটু ব্যস্ত।'

'গল্পগুজব আমি তেমন পারি না। কো-ইনসিডেন্সের একটা ব্যাপার আমার জীবনে আছে– ঐ গল্পটা ছাড়া আমি কোনো গল্প জানি না। গল্পটা খুবই ব্যক্তিগত। এই জীবনে অল্প কয়েকজনকে বলেছি। আপনাকে কেন জানি বলার ইচ্ছা করছিল।'

'অবশ্যই বলবেন।'

'আপনি যদি দয়া করে একটু বারান্দায় আসেন তাহলে আমার বাসাটা আপনাকে দেখাতাম। হঠাৎ কোনো-একদিন চলে এলে ভালো লাগত।'

আমি বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। ভদ্রলোক হাত উঁচু করে দেয়াল দিয়ে ঘেরা একতলা একটি বাড়ি দেখালেন। পুরানো বাড়ি। দোতলার কাজ শুরু করা হয়েছিল। শেষ হয় নি। বাড়ির সামনে দুটা জড়াজড়ি কাঁঠাল গাছ।

'একদিন যদি আসেন আপনার ভালো লাগবে। আমার জীবনের কো-ইনসিডেন্সের ঘটনাটাও শুনবেন।'

'জি আচ্ছা, একদিন যাব।'

'আমার নামটা আপনার মনে আছে তো?'

'জি আছে।'

'নামটা বলুন তো?'

আমি দ্বিতীয়বার লজ্জা পেলাম। কারণ, ভদ্রলোকের নাম কিছুতেই মনে করতে পারলাম না।

ভদ্রলোকের স্বভাবও এমন বিচিত্র যে, আমার লজ্জা বুঝতে পেরেও জবাবের জন্যে মাথা নিচু করে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

'নামটা বোধহয় আপনার মনে পড়ছে না, তাই না?'

'জি না।'

'মনে থাকার কথাও না। আন-কমন নাম মানুষের মনে থাকে। আমার নাম খুবই কমন্‌– আলিমুজ্জামান। একদিন আসবেন আমার বাসায় দয়া করে। ঘটনাটা বলব। শুনতে আপনার খারাপ লাগবে না।'

'জি আচ্ছা, আমি যাব। খুব শিগগিরই একদিন যাব।'

এক বৃহস্পতিবার বিকেলে ভদ্রলোকের বাসায় উপস্থিত হলাম। গল্প শোনার আগ্রহে নয়। লজ্জা কাটানোর জন্যে। ভদ্রলোক ঐ দিন আমাকে খুব লজ্জায় ফেলে ছিলেন।

বাসায় ঢুকে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। সাধারণ একটা বসার ঘর। বেতের কয়েকটা চেয়ার। দেয়ালজোড়া বইয়ের আলমিরা। খুব কম করে হলেও হাজার পনেরো বই ভদ্রলোকের সংগ্রহে আছে। কারো ব্যক্তিগত সংগ্রহে এত বই থাকে আমার জানা ছিল না। নিজের অজান্তেই আমি বললাম– অপূর্ব!

ভদ্রলোক হাসিমুখে বললেন–'বলেছিলাম না, আমার বাসায় এলে আপনার ভালো লাগবে।'

'আপনার বইয়ের সংখ্যা কত?'

'ষোল হাজারের কিছু বেশি। আমার শোবার ঘরেও বেশ কিছু বই আছে। আপনাকে দেখাব।'

'সব আপনার নিজের সংগ্রহ?

'আমার বাবার সংগ্রহ অনেক আছে। বই কেনার বাতিক বাবার কাছ থেকে পেয়েছি। খুব বই-পাগল লোক ছিলেন। খুব বই পড়তেন। আমি তাঁর মতো পড়তে পারি না। অনেক বই আছে আমি কিনে রেখেছি, এখনো পড়ি নি।'

'এখন তো প্রচুর অবসর। এখন নিশ্চয় পড়ছেন।'

'আমার চোখের সমস্যা আছে। খুব বেশিক্ষণ একনাগাড়ে পড়তে পারি না। আমি খুব খুশি হব যদি আমার লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে আপনি পড়েন। বই তো পড়ার জন্যেই। আলমিরায় সাজিয়ে রাখার জন্যে না।'

'আপনি কি সবাইকেই বই পড়তে দেন?'

'জি দেই।'

'তারা বই ফেরত দেয়?'

'অনেকেই দেয় না। সেই সব পরে কিনে ফেলি। আমার সংসার ছোট। একটা মাত্র মেয়ে, স্ত্রী মারা গেছেন। সংসারের তুলনায় টাকা-পয়সা ভালোই আছে। বই কেনায় একটা অংশ ব্যয় করি। আপনি ঘুরে ঘুরে বই দেখুন। আমি চা নিয়ে আসছি।'

'চা লাগবে না।'

‘কেন লাগবে না? চা খেতে খেতে গল্প করব। আমার ঘটনাটা আপনাকে বলব। আপনাকে বলার জন্যে আমি এক ধরনের আগ্রহ অনুভব করছি।’

‘কেন বলুন তো?

‘আপনি বিজ্ঞানের মানুষ। আপনি শুনলে একটা ব্যাখ্যা হয়তো দাঁড় করতে পারবেন। অবশ্যি ব্যাখ্যার জন্যে আমি খুব ব্যস্তও না। প্রতিটি বিষয়ের পেছনে একটা কার্যকারণ যে থাকতেই হবে এমন তো কোনো কথা না। আমরা কোত্থেকে এসেছি, আমরা কোথায় যাচ্ছি– এই বিষয়গুলির তো এখনো মীমাংসা হয় নি, কি বলেন প্রফেসর সাহেব....’

অন্য সময় হলে এই ভদ্রলোকের কথায় আমি তেমন কোনো গুরুত্ব দিতাম না। কিন্তু যার বাড়িতে বইয়ের সংখ্যা ষোল হাজার তার কথা মন দিয়ে শুনতে হয়। তার তুচ্ছতম কথাও অগ্রাহ্য করা যায় না।

ভদ্রলোকের গল্প সেই কারণেই অতি আগ্রহ নিয়ে শুনলাম। যেভাবে শুনেছি ঠিক সেইভাবে বলার চেষ্টা করছি। ভদ্রলোক গল্পের মাঝামাঝি পর্যায়ে এসে ইংরেজিতে বলা শুরু করেছেন। আমি তা করছি না। কোনোরকম ব্যাখ্যা বা টীকা-টিপ্পনীও দিচ্ছি না। পুরোটা পাঠকদের উপর ছেড়ে দিচ্ছি।

‘ভাই, ঘটনাটা তাহলে বলা শুরু করি।’

কিছু কিছু মানুষ আছে পশুপ্রেমিক। কুকুর-বেড়াল, গরু-ভেড়া এই সব জন্তুর প্রতি তাদের অসাধারণ মমতা। রাস্তায় একজন ভিখারি চিৎকার করে কাঁদলে সে ভিখিরির কাছে এগিয়ে যাবে না। কিন্তু একটা বিড়াল কুঁইকুঁই করে কাঁদলে ছুটে যাবে, বিড়ালটাকে পানি খাওয়াবে।

আপনাকে শুরুতেই বলে রাখি– আমি এ রকম কোনো পশুপ্রেমিক না। কুকুর-বেড়াল এইসব আমার অপছন্দের প্রাণী। একটা গরু বা ভেড়ার গায়ে আমি হাত দিতে পারি কিন্তু কুকুর বা বেড়ালের গায়ে হাত দিতে আমার ঘেন্না লাগে। তাছাড়া ডিপথেরিয়া, জলাতংক এইসব অসুখ এদের মধ্যে ছড়ায়– এটাও আমি সব সময় মনে রাখি।

যাই হোক, মূল, গল্পে ফিরে যাই। আমি তখন ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। শীতকাল। কলেজে প্রাকটিক্যাল শেষ করে বাসায় ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। তখন পড়ি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে। আমাদের বাসা ঠাকুরপাড়ায়।

একদিন বাসায় ফিরছি। দিনটা মনে আছে– বুধবার। সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে। গায়ে গরম কাপড় ছিল না। প্রচণ্ড শীত লাগছে। বাসার কাছাকাছি এসে দেখি পাড়ার তিন-চারটা ছেলে কাগজ, শুকনো কাঠ এইসব জড়ো করে আগুন করছে। আমাদের সামনের বাসার নান্টুকেও দেখা গেল। মহাত্যাঁদড় ছেলে। তার হাতে একটা কুকুরছানা। ছানাটার গায়ে কাপড় জড়ানো। শুধু মুখ বের হয়ে আছে। কুকুরছানা আরামে কুঁইকুঁই করছে।

আমি বললাম, কি হচ্ছে রে নান্টু?

নান্টু দাঁত বের করে হাসল। অন্য একজন বলল, নান্টু কুকুরকে কম্বল পরিয়েছে। শীত লাগে তো এই জন্যে। দলের বাকি সবাই হো-হো করে হেসে উঠল। ছেলেগুলির বয়স দশ থেকে এগারোর মধ্যে। এই বয়সের বালকরা সব সময় খুব আনন্দে থাকে। নানা জায়গা থেকে আনন্দের উপকরণ সংগ্রহ করে। কুকুরকে কাপড় দিয়ে মোড়া হয়েছে এতেই তাদের আনন্দের সীমা নেই।

মানুষের সাধারণ প্রবৃত্তি হচ্ছে আনন্দে অংশগ্রহণ করা। আমি ওদের দিকে এগিয়ে গেলাম। অবাক হয়ে লক্ষ করলাম আমার এগিয়ে যাওয়াটা কেউ তেমন পছন্দ করছে না। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। হয়তো তারা চায় না ছোটদের খেলায় বড়রা অংশগ্রহণ করুক। নান্টুকে খুবই বিরক্ত মনে হলো।

ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়ানো মাত্র কেরোসিনের গন্ধ পেলাম। হয়তো বাসা থেকে কেরোসিন এনে কেরোসিন ঢেলে আগুন করেছে। বালকরা কায়দা-কানুন করতে খুব ভালোবাসে।

'কেরোসিন দিয়েছিস না-কি?'

কেউ কোনো জবাব দিল না। নান্টুর মুখ কঠিন হয়ে গেল। আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না। নান্টু বলল, আপনি চলে যান। তার গলা কঠিন। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। তাকিয়ে দেখি নান্টুর কোলের কুকুরছানা ভিজে চুপচুপ করছে। বুকটা ধক করে উঠল। এরা কুকুরছানাটার গায়ের কাপড় কেরোসিন দিয়ে চুবিয়েছে না-কি? নতুন কোনো খেলা? একে আগুনে ছেড়ে দেবে না তো? শিশুরা মাঝে মাঝে নিষ্ঠুর খেলায় মেতে ওঠে। আমি কড়া গলায় বললাম,

'এই নান্টু, তুই কুকুরটার গায়ে কেরোসিন ঢেলেছিস?'

নান্টু কঠিন মুখে বলল, 'তাতে আপনার কি?'

'কেন কেরোসিন ঢাললি?'

নান্টু কিছু বলল না। অন্য একজন বলল, 'কুকুরটা আগুনের মধ্যে ছাড়বে। এর গলায় ঘুংঘুর বাঁধা আছে। আগুনে ছাড়লে এর গায়ে আগুন লাগবে আর সে দৌড়াবে। ঘুংঘুর বাজাবে। যত তাড়াতাড়ি দৌড়াবে তত তাড়াতাড়ি ঘুংঘুর বাজবে। এইটাই মজা।'

আমি হতভম্ব। এরা বলে কি? ছেলেটার কথা শেষ হবার আগেই নান্টু কুকুরছানাটা আগুনে ফেলে দিল। দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। কুকুরছানা দৌড়াল না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। হয়তোবা মানুষের নিষ্ঠুরতায় হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।

আমি আগুনের উপর লাফিয়ে পড়লাম। আমার শার্টে আগুন ধরে গেল। প্যান্টে আগুন ধরে গেল। এইসব কিছুই গ্রাহ্য করলাম না। আমার একমাত্র চিন্তা বাচ্চাটাকে আগুন থেকে বের করতে হবে।

আলিমুজ্জামান সাহেব থামলেন।

আমি বললাম, 'বের করতে পেরেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'বাচ্চাটা বেঁচেছিল?'

'না বাঁচে নি। বাঁচার কথাও না। আমার গায়ে থার্ডডিগ্রি বার্ন হয়ে গেল। কুমিল্লা মেডিকেলে কিছুদিন থাকলাম। তারপর আমাকে পাঠানো হলো ঢাকা মেডিকেল কলেজে। দু'মাসের উপর হাসপাতালে থাকতে হলো। এক পর্যায়ে ডাক্তাররা আমাকে বাঁচানোর আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। সেই সময় বার্ন-এর চিকিৎসার তেমন ব্যবস্থা ছিল না। স্কিন গ্রাফটিং হতো না। অল্পতেই শরীরে ইনফেকশন হয়ে যেত। যাই হোক, বেঁচে গেলাম তবে সেই বছর পরীক্ষা দিতে পারলাম না।'

আলিমুজ্জামান সাহেব নিশ্বাস নেবার জন্যে থামামাত্র আমি বললাম, 'আপনি একজন অসাধারণ মানুষ!'

'মোটেই না। আমাকে বোকা বলতে পারেন। সামান্য একটা কুকুরছানার জন্যে নিজের জীবন যেতে বসেছিল। তখন সবাই আমার বোকামির কথাটা আলোচনা করত। আমার নিজেরও মাঝে মাঝে মনে হয়েছে হয়তো বোকামিই করেছি। একজন মানুষের জীবন কুকুরের জীবনের চেয়ে অবশ্যই মূল্যবান।'

'আপনার গল্প শুনে মুগ্ধ হয়েছি।'

'এটা কিন্তু গল্প না। এটা গল্পের ভূমিকা– মূল এখন বলব।'

'ঢাকা থেকে সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরেছি। শরীর তখনো খুব দুর্বল। ডাক্তার বলে দিয়েছে প্রচুর রেস্ট নিতে। শুয়ে-বসেই দিন কাটছে। আমার ঘর দোতলায়। মাথার কাছে বিরাট জানালা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে শুয়ে থাকতে খুব খারাপ লাগে না।

এক রাতের কথা। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। ফকফকে জ্যোৎস্না। এই জ্যোৎস্নায় অদ্ভুত একটা দৃশ্য চোখে পড়ল। রাজ্যের কুকুর এসে জড়ো হয়েছে বাসার সামনে। কেউ কোনো সাড়াশব্দ করছে না বা ছোটাছুটি করছে না। সব ক'টা মূর্তির মতো বসে আছে। আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ব্যাপারটা কি?

একসঙ্গে এতগুলি কুকুর আমি এর আগে কখনো দেখি নি। এদের এই জাতীয় আচরণের কথাও শুনি নি। আমাকে তাকাতে দেখে এরা সবাই মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাল।

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি– দেখি, হঠাৎ তাদের মধ্যে এক ধরনের চাঞ্চল্য দেখা গেল। এরা একে একে চলে গেল। যেন ওদের কোনো গোপন অনুষ্ঠান ছিল, অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে– এখন চলে যাচ্ছে।

এই ব্যাপার মাঝে মাঝে ঘটতে লাগল। নির্দিষ্ট কোনো সময় না। মাসে একবার কিংবা দু'মাসে একবার এরকম হয়।

এ রকম একটা ঘটনা চাপা থাকার কথা নয়। সবাই জেনে গেল। অনেকেই দুপুর রাতে কুকুরের দল দেখতে আসত। খবরের কাগজেও ঘটনাটা উঠেছিল। দৈনিক আজাদে। ক্যাপশন ছিল– কুকুরের কাণ্ড।

আমার ছোট বোন আমাকে খুব ক্ষেপাত। সে বলত কুকুরের জন্যে তুমি জীবন

দিতে যাচ্ছিলে। কাজেই তারা তোমাকে তাদের রাজা বানিয়েছে। তুমি হচ্ছ "কুকুর রাজা"।

আমার বাবা পরের বছর বদলি হয়ে পাবনা চলে গেলেন। আমিও বাবার সাথে গেলাম। সেখানেও একই কাণ্ড। এক মাস দু'মাস পরপর হঠাৎ রাজ্যের কুকুর বাসার সামনে এসে জড়ো হয়। মূর্তির মতো চুপচাপ বসে থাকে। একবার আমার চোখ পড়ামাত্র মাথা নিচু করে চলে যায়। যেখানে গিয়েছি এই কাণ্ড ঘটছে। যেন কোনো-এক অদ্ভুত উপায়ে কুকুররা আমার খবর পৌঁছে দিয়েছে। শুধু তাই না, আমার মনে হয় কুকুররা আমাকে পাহারা দেয়। আমি যখন রাস্তায় হাঁটি, একটা দু'টা কুকুর সবসময় আমার সঙ্গে থাকে।

আজ আমার বয়স সাতষট্টি। আজও এই ব্যাপার ঘটছে।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'বলেন কি?'

'যা বলছি তার মধ্যে এক বর্ণ মিথ্যা নেই। তবে কুকুরের সভা আগের মতো ঘনঘন হয় না। ছ'মাসে এক বছরে একবার হয়। তবে হয়। কুকুরের ভাষা আমি জানি না। জানলে জিজ্ঞেস করতাম–তোমরা কি চাও? এইসব কেন তোমরা করো?'

'ব্যাপারটা কি আপনার পছন্দ হয় না?'

'না, পছন্দ হয় না। একদিন দুদিনের ব্যাপার হলে হয়তো পছন্দ হতো। একদিন দুদিনের ব্যাপার তো নয়। দিনের পর দিন ঘটছে।'

'ভবিষ্যতে আবারও হবে বলে কি আপনার ধারণা?'

'হ্যাঁ হবে। আজ রাতেও হতে পারে। আপনি কি দেখতে চান?'

বলতে বলতে আলিমুজ্জামান সাহেবের চোখ-মুখ বিকৃত হয়ে গেল। যেন তিনি প্রচণ্ড রাগ করছেন। যেন এই মুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠবেন। আমি বললাম, 'আপনি মনে হয় পুরো ব্যাপারটায় খুব আফসেট। এতে আফসেট হবার কিছু নেই। পশুরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে– এতে রাগ হবার কি আছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অধিকার নিশ্চয়ই পশুদেরও আছে।'

'এটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনো ব্যাপার নয়। এটা একটা ভৌতিক ব্যাপার। সুপার ন্যাচারাল ব্যাপার।'

'এর মধ্যে সুপার ন্যাচারালের অংশটি কোনটি?'

'পুরো ব্যাপারটিই সুপার ন্যাচারাল। এই অংশটি আপনাকে বলি নি বলে আপনি বুঝতে পারছেন না।'

'বলুন শুনি।'

'যে কুকুরছানাটিকে আমি বাঁচাতে চেয়েছিলাম সেই কুকুরছানাটি দলটার মধ্যে সব সময় থাকে। পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া একটা কুকুর। গলায় ঘুংঘুর বাঁধা। কুকুরছানাটা মাথা দুলায় আর ঘুংঘুরের শব্দ হয়।'

'আপনি ছাড়া অন্যরাও কি এই কুকুরছানাটা দেখে?'

'না, আর কেউ দেখতে পায় না। শুধু আমি দেখতে পাই। দেখুন ভাই, আমি বিজ্ঞানের ছাত্র না। আমার বিষয় ইতিহাস। তবু অবৈজ্ঞানিক কোনো কিছুই আমি আমার জীবনে গ্রহণ করি নি। ভূত-প্রেত, ঝাড়-ফুঁক, পীর-ফকির– কিছুই না। অথচ সেই আমাকেই কি-না সারাজীবন একটা অতিপ্রাকৃত বিষয় হজম করে যেতে হচ্ছে।'

আমি বললাম, 'আবার কখনো এরকম কিছু হলে আপনি দয়া করে আমাকে খবর দেবেন।' তিনি জবাব দিলেন না।

আমি বিদায় নিয়ে চলে এলাম। তার পাঁচ মাস পর রাত দুটোয় টেলিফোন বেজে উঠল। আলিমুজ্জামান সাহেব টেলিফোন করেছেন। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'ওরা এসেছে। আপনি কি আসবেন?'

শ্রাবণ মাসের রাত। বাইরে ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে। বাড়ির বাইরে পা দিলেই এক হাঁটু পানি। এমন দুর্যোগের রাতে কোথাও যাবার প্রশ্নই ওঠে না। আমি টেলিফোন নামিয়ে বিছানায় চাদরের নিচে ঢুকে পড়লাম।

ভয়

ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার কিভাবে পরিচয় হলো আগে বলে নেই। কেমিস্ট্রি প্রাকটিক্যাল পরীক্ষার এগজামিনার হয়ে পাড়াগাঁ ধরনের শহরে গিয়েছি। (শহর এবং কলেজের নাম বলার প্রয়োজন দেখছি না। মূল গল্পের সঙ্গে এদের সম্পর্ক নেই। নামগুলি প্রকাশ করতেও কিছু অসুবিধা আছে)। এই অঞ্চলে আমি কখনো আসি নি। পরিত্যক্ত এক রাজবাড়িকে কলেজ বানানো হয়েছে। গাছগাছড়ায় চারদিক আচ্ছন্ন। বিশাল কম্পাউন্ড। কিন্তু লোকজন নেই। পরীক্ষার জন্যে কলেজ ছুটি হয়ে গেছে। খাঁ খাঁ করছে চারদিক। আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম।

একটা সময় ছিল যখন এগজামিনারদের আলাদা খাতির-যত্ন ছিল। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নিজের বাসায় রাখতেন। সকাল-বিকাল নানান ধরনের খাবার। জাল ফেলে পাকা রুই ধরা হতো। যত্নের চূড়ান্ত যাকে বলে। এখন সেই দিন নেই। কেউ পাত্তাই দেয় না। বিরক্ত চোখে তাকায়।

আমার জায়গা হলো মেটিস্ট্রি ল্যাবরেটরির পাশের একটা খালি কামরায়। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বললেন, 'আপনাকে হোস্টেলেই রাখতে পারতাম কিন্তু বুঝতেই পারছেন চারদিকে থাকবে ছাত্র। আপনি অস্বস্তিবোধ করবেন। ছাত্ররা তো আর আগের মতো নেই। মদটদ খায় । একবার বাজে মেয়ে নিয়ে এসে নানান কীর্তি করেছে। বিশ্রী ব্যাপার। তবে আপনার খাওয়া-দাওয়ার কোনো অসুবিধা হবে না। আমার বাসা থেকে খাবার যাবে।

থাকার ঘর দেখে চমকে উঠলাম। আগে বোধহয় স্টোর রুম ছিল। একটামাত্র জানালা। রেল টিকিট দেয়ার জানালার মতো ছোট। ঘর ভর্তি মাকড়সার ঝুল। দুটি বিশাল এবং কুৎসিত মাকড়সা পেটে ডিম নিয়ে বসে আছে। এই নিরীহ প্রাণীটিকে আমি অসম্ভব ভয় পাই। এদের ছায়া দেখলেও আমার গা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। ঝাড়ুদারকে পাঁচটা টাকা দিলাম মাকড়সা এবং মাকড়সার ঝুল পরিষ্কার করার জন্যে।

সে কি করল কে জানে। ঘর যেমন ছিল তেমনি রইল। দুটির জায়গায় এখন দেখছি তিনটি মাকড়সা। তৃতীয়টির গায়ের রং কালো। চোখ জ্বলজ্বল করছে।

সন্ধ্যাবেলা হারিস নামের একজন লোক একটা হারিকেন জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। অথচ দিনের বেলায় ইলেকট্রিসিটি আছে দেখেছি। হারিস বলল– রাত দশটার পর কারেন্ট আসে। আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। রাত দশটার পর আমি কারেন্ট দিয়ে করব কি?

সন্ধ্যার পর এলেন কেমিস্ট্রির ডেমনেসট্রেটর সিরাজউদ্দিন। এর সঙ্গে আমার সকালে একবার দেখা হয়েছে। তখন বোধহয় তেমন মনোযোগ দিয়ে দেখি নি। মুখ ভর্তি আর্নেস্ট হেমিংওয়ের মতো চাপ দাড়ি। মাথায় টুপি। চোখে সুরমা। গা থেকে আতরের গন্ধ বেরুচ্ছে। বেঁটেখাটো একজন মানুষ। বয়স পঞ্চাশের মতো হলেও চমৎকার স্বাস্থ্য। এই গরমেও গায়ে ঘিয়া রঙের একটা চাদর। তিনি কথা বলেন খুব সুন্দর করে।

'স্যার কেমন আছেন?'

'ভালোই আছি।'

'আপনার খুব তকলিফ হলো স্যার।'

'না, তকলিফ আর কি?'

'আগে এগজামিনার সাহেবরা এলে প্রিন্সিপ্যাল স্যারের বাসায় থাকতেন। কিন্তু ওর এক ছেলের মাথায় দোষ আছে। প্রিন্সিপ্যাল স্যার এখন আর কাউকে বাসায় রাখেন না। ছেলেটা বড় ঝামেলা করে।'

আমি বললাম, 'আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

সিরাজউদ্দিন সাহেব ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন- 'স্যার, ভেতরে এসে একটু বসব?'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আসুন গল্প করি।'

সিরাজউদ্দিন সাহেব বসতে বসতে বললেন, 'এখানে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের একটা ডাকবাংলা আছে। আপনাকে সেখানে রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে রেভিন্যুর সি.ও. তাঁর ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন। কোয়ার্টারের খুব অভাব।'

'বুঝতে পারছি। এই নিয়ে আপনি ভাববেন না। দিনের বেলাটা তো কলেজেই কাটবে। রাতে এসে শুধু ঘুমানো। বইপত্র নিয়ে এসেছি। সময় কাটানো কোনো সমস্যা না।'

সিরাজউদ্দিন সাহেব ইতস্তত করে বললেন–'রাতে ঘর থেকে বেরুতে হলে একটু শব্দ-টব্দ করে তারপর বেরুবেন। খুব সাপের উপদ্রব।'

'তাই নাকি?'

'জি স্যার। এখন সাপের সময়। গরমে অতিষ্ঠ হয়ে গর্ত থেকে বের হয়। হাওয়া খায়।'

আমার গা হিম হয়ে গেল। এ তো মহাযন্ত্রণা! প্রায় দু'শ গজ দূরে ঝোপঝাড়ের মধ্যে বাথরুম। আমার আবার রাতে কয়েক বার বাথরুমে যেতে হয়।

'তবে স্যার ঘরের মধ্যে কোনো ভয় নেই। চারদিকে কার্বলিক এ্যাসিড দিয়ে দিয়েছে। সাপ আসবে না।'

'না এলেই ভালো।'

'যদি স্যার আপনি অনুমতি দেন পা উঠিয়ে বসি। বসুন বসুন। যেভাবে আপনার আরাম হয় সেভাবেই বসুন।'

ভদ্রলোক পা উঠিয়ে বসলেন এবং একের পর এক এক সাপের গল্প শুরু করলেন। সেইসব গল্পও অতি বিচিত্র। রাতে ঘুম ভেঙেছে, হঠাৎ তাঁর মনে হলো নাভীর উপর চাপ পড়ছে। চোখ মেললেন। ঘরে চাঁদের আলো। সেই আলোয় লক্ষ করলেন– একটা সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে নাভীর উপর শুয়ে ঘুমুচ্ছে, আসল সাপ। শঙ্কচূঁড়।

এক সময় আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'সাপের গল্প আর শুনতে ইচ্ছে করছে না। দয়া করে অন্য গল্প বলুন।'

ভদ্রলোক সম্ভবত সাপের গল্প ছাড়া অন্য কোনো গল্প জানেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শুরু করলেন সাপের সঙ্গম দৃশ্যের বর্ণনা। চৈত্র মাসের এক জ্যোৎস্নায় তিনি এই দৃশ্য দেখেছেন। বর্ণনা শুনে আমার গা ঘিনঘিন করতে লাগল। সিরাজউদ্দিন সাহেব বললেন, 'সাপ যে জায়গায় এইসব করে তার মাটি কবচে ভরে কোমরে রাখলে পুরুষত্ব বাড়ে।'

বিজ্ঞানের একজন শিক্ষকের মুখে কি অদ্ভুত কথা। আমি ঠাট্টা করে বললাম, 'আপনি সেখানকার মাটি কিছু সংগ্রহ করলেন?'

তিনি আমার ঠাট্টা বুঝতে পারলেন না। সরল ভঙ্গিতে বললেন, 'জি না স্যার।'

লোকটি নির্বোধ। নির্বোধ মানুষের সঙ্গে আমার কথা বলতে ভালো লাগে না। কিন্তু এই লোক উঠছে না। সাপ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সে আমাকে দেবে বলে বোধহয় তৈরি হয়েই এসেছে। মুক্তি পাবার জন্যে এক সময় বলেই ফেললাম, 'সারাদিনের জার্নিতে টায়ার্ড হয়ে এসেছি। যদি কিছু মনে না করেন বাতিটাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ব।'

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, 'কিছু বলছেন স্যার? ভাত না খেয়ে ঘুমাবেন? ভাত তো এখনো আসে নি। দেরি হবে। আমি প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের বাসা থেকে খোঁজ নিয়ে তারপর আপনার কাছে এসেছি। আমি যাওয়ার পর রান্না চড়িয়েছে। গোশ্ত রান্না হচ্ছে।'

'তাই নাকি?'

'জি। আপনি গরু খান তো?'

'জি খাই।'

'এখানে কসাইখানা নাই। মাঝে মাঝে গরু কাটা হয়। আজ হাটবার, তাই গরু কাটা হয়েছে। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব দুই ভাগ নিয়েছেন।'

'ও আচ্ছা।'

'পঁচিশ টাকা করে ভাগ।'

'তাই বুঝি?'

'প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের স্ত্রীর রান্না খুব ভালো।'

'তাই নাকি?'

'জি। তবে আজ রান্না করছে তাঁর ছেলের বৌ। যে ছেলেটা পাগল তার বৌ।'

'ও আচ্ছা।'

'বিরাট অশান্তি চলছে প্রিন্সিপ্যাল স্যারের বাড়িতে। ছেলে বঁটি নিয়ে তার মাকে

কোপ দিতে গেছে। বৌ গিয়ে মাঝখানে পড়ল। এখন ছেলেকে বেঁধে রেখেছে। এই জন্যেই রান্নার দেরি হচ্ছে।'

'কোনো হোটেলে গিয়ে খেয়ে এলেই হতো। এদের দুঃসময়ে...'

'কি যে বলেন স্যার। আপনি আমাদের মেহমান না? তাছাড়া ভদ্রলোকের খাওয়ার মতো হোটেল এই জায়গায় নাই। নিতান্তই গণ্ডগ্রাম। হঠাৎ সাব-ডিভিশন হয়ে গেল। ভালো একটা চায়ের দোকান পর্যন্ত নাই।'

রাত সাড়ে দশটায় খাবার এলো। দুটি প্লেট। সিরাজউদ্দিন সাহেবও আমার সঙ্গে খেতে বসলেন। হাত ধুতে ধুতে বললেন, 'প্রিন্সিপ্যাল স্যার আমাকে আপনার সঙ্গে খেতে বলেছেন। আপনি হচ্ছেন আমাদের মেহমান। আপনি একা-একা খাবেন, তা কি হয়।'

প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের ছেলের বৌ অনেক কিছু রান্না করেছে। অসাধারণ রান্না। সামান্য সব জিনিসও রান্নার গুণে অপূর্ব হয়েছে। মেয়েটার জন্যে আমার কষ্ট হতে লাগল। বেচারি হয়তো চোখের জল ফেলতে ফেলতে রেঁধেছে। আজ রাতে সে কিছু খাবেও না।

'সিরাজউদ্দিন সাহেব।'

'জি স্যার।'

'প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের ছেলের বৌকে বলবেন, আমি এত ভালো রান্না খুব কম খেয়েছি। দ্রৌপদী এরচে' ভালো রাঁধত বলে আমার মনে হয় না।'

'জি স্যার, বলব। তবে প্রিন্সিপ্যাল স্যারের স্ত্রীর রান্নার কাছে এ কিছুই না। আছেন তো কিছুদিন, নিজেই বুঝবেন।'

প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে বেশ বিচক্ষণ লোক বলে মনে হলো। তিনি একটা টর্চ লাইট পাঠিয়েছেন। ফ্লাস্ক ভর্তি চা পাঠিয়েছেন। পান-সুপারি-জর্দাও আছে কৌটায়।

খাওয়া-দাওয়ার পরও সিরাজউদ্দিন সাহেব অনেকক্ষণ বসে রইলেন। চা খেলেন, পান খেলেন। দীর্ঘ একটা সাপের গল্প বললেন। বিদায় নিলেন রাত এগারোটার পর। যে লোকটি ক্রমাগতই সাপের কথা বলছে তার দেখলাম তেমন ভয়-টয় নেই। টর্চ বা লাঠি ছাড়াই দিব্যি হনহন করে চলছে।

আমি দরজা বন্ধ করে বিছানায় এসে বসলাম। নতুন জায়গায় চট করে ঘুম আসবে না। শুয়ে শুয়ে হালকা ধরনের কিছু বই পড়া যায়। হারিকেনের এই আলোয় সেটা সম্ভব হবে না। আমি সিগারেট ধরিয়ে স্যুটকেস খুললাম বই বের করব। ঠিক তখন একটা কাণ্ড হলো। প্রচণ্ড ভয় লাগল। অথচ ভয়ের কোনোই কারণ ঘটে নি। তবু আমার হাত-পা কাঁপতে লাগল। যেন বন্ধ দরজার ওপাশেই অশরীরী কিছু দাঁড়িয়ে আছে। যেন এক্ষুনি সেই অশরীরী অতিথি ভয়ঙ্কর কিছু করবে। নিজের অজান্তেই আমি চেঁচিয়ে উঠলাম–কে কে? আর তখনি শুনলাম থপথপ শব্দে একজন কেউ যেন দূরে চলে যাচ্ছে। ছোট একটা কাশির শব্দও শুনলাম।

ভয়টা যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ চলে গেল। আমি খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। চাঁদের আলোয় চারদিক থৈ থৈ করছে। কোথাও

কেউ নেই। হঠাৎ এই অস্বাভাবিক ভয় আমাকে অভিভূত করল কেন? এখনো গা ঘামে ভেজা। হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে। আমি শারীরিকভাবে পুরোপুরি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম। হালকা বাতাস দিচ্ছে। বেশ লাগছে দাঁড়িয়ে থাকতে। লুঙ্গি পরা খালি গায়ের একটি লোক বিড়ি টানতে টানতে আসছে। আমাকে দেখেই বিড়ি লুকিয়ে ফেলে বলল, 'আদাব স্যার।'

'আদাব। তুমি কে?'

'আমার নাম কালিপদ। আমি কলেজের দারোয়ান।'

'তুমি কিছুক্ষণ আগে কি এইখানেই ছিলে?'

'জি স্যার। লাইব্রেরি ঘরের সামনে বসে ছিলাম।'

'কাউকে যেতে দেখেছ?'

'আজ্ঞে না। কেন স্যার? কি হয়েছে?'

'না, এমনি।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ইলেকট্রিসিটি চলে এলো। আমি নিশ্চিন্ত মনে বই নিয়ে শুতে গেলাম। স্টিফান কিং-এর লেখা ভৌতিক উপন্যাস। দারুণ রগরগে ব্যাপার। একবার পড়তে শুরু করলে ছাড়তে ইচ্ছা করে না। ভয় ভয় লাগে, আবার পড়তেও ইচ্ছা করে। পুরোপুরি ঘুমুতে গেলাম একটার দিকে। বারবার মনে হতে লাগল কিছুক্ষণ আগে এই অস্বাভাবিক ভয়টা কেন পেলাম? রহস্যটা কি?

আমি খুব-একটা সাহসী মানুষ এ রকম দাবি করি না। কিন্তু অকারণে এত ভয় পাবার মতো মানুষও আমি নই। একা এক বহু রাত কাটিয়েছি।

সে রাতে আমার ভালো ঘুম হলো না।

দিনের বেলাটা খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটল। একুশজন ছেলে পরীক্ষা দেবে। জোগাড়যন্ত্র কিছুই নেই। ল্যাবরেটরির অবস্থা শোচনীয়। একটামাত্র 'ব্যালেন্স' তাও ঠিকমত কাজ করছে না। প্রয়োজনীয় কেমিকেলসও নেই। সে নিয়ে কারো মাথাব্যথাও নেই। কেমিস্ট্রির দু'জন টিচার। ওরা নির্বিকার ভঙ্গিতে বসে আছেন। একজন আমাকে বলে গেলেন, কলেজের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন। ক্লাস-ট্রাসও তেমন হয় নি। একটু দেখেশুনে নিবেন স্যার। পাস মার্কটা দিয়ে দিবেন। আমি হেসে বললাম, 'কি করে দেব বলুন! দেবার তো একটা পথ লাগবে। এরা তো মনে হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল কাজ কিছুই করে নি।'

'কি করে করবে বলেন, স্ট্রাইক-ফাইক লেগেই আছে। জিনিসপত্রও কিছু নেই।'

একমাত্র সিরাজউদ্দিন সাহেবকে দেখলাম ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে। চেষ্টা করছেন কিভাবে ছাত্রদের খানিকটা সাহায্য করা যায়। একুশজন ছাত্রছাত্রীর কেউ তাঁকে এক মুহূর্তের আড়াল করতে রাজি নয়। একটি মেয়ে সল্ট অ্যানালিসিসে কিছুই না পেয়ে তাদের স্বভাব মতো কাঁদতে শুরু করেছে। সিরাজউদ্দিন সাহেব তাকে একটা ধমক দিলেন, খবরদার কাঁদবি না। কাঁদলে চড় খাবি। গোড়া থেকে কর। ড্রাই টেস্টগুলি আগে কর। আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে করবি।

এগজামিনারদের একটা দায়িত্ব হচ্ছে লক্ষ রাখা যেন ছাত্ররা তাদের নিজেদের কাজগুলি নিজেরাই করে। কিন্তু সব সময় দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না। দেখেও না

দেখার ভান করতে হয়। এখন যেমন করছি। ছাত্রদের জন্যে আমার খানিকটা মমতাও লাগছে। যন্ত্রপাতি নেই, কেমিকেলস নেই, স্যারদের কোনো আগ্রহ নেই, ছেলেরা করবে কি?

দুপুরবেলা প্রিন্সিপ্যাল সাহেব দেখতে এলেন পরীক্ষা কেমন হচ্ছে। ভদ্রলোককে মনে হলো বিপর্যস্ত। কিছুক্ষণ মুখ কুঁচকে রেখে বললেন, 'দেন, সবক'টিকে ফেল করিয়ে দেন। ঝামেলা চুকে যাক।'

কোনো প্রিন্সিপ্যালকে এ রকম কথা বলতে শুনি নি। আমি হেসে ফেললাম। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বললেন, 'রাতে অসুবিধা হয় নি তো?'

'জি না, হয় নি।'

'সিরাজউদ্দিনকে আপনার খোঁজখবর রাখতে বলেছি। কোনো কিছুর দরকার হলেই তাকে বলবেন। সংকোচ করবেন না।'

'না, করব না।'

'সাপের গল্প বলে মাথা খারাপ করিয়ে দেবে। পাত্তা দেবন না। এখানে সাপের উপদ্রব একেবারেই নেই।'

'তাই নাকি!'

'আপনাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে বোধ হয়? আমাকেও দিয়েছিল। প্রথম যখন আসি এমন অবস্থা ঘর থেকে বেরুবার আগে হারিকেন, লাঠি এইসব নিয়ে বের হতাম। হা হা হা।'

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বেশিক্ষণ দাঁড়ালেন না। আগামীকাল সন্ধ্যায় চা খাবার দাওয়াত দিয়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে চলে গেলেন।

পাঁচটায় পরীক্ষা শেষ হবার কথা। শেষ হলো রাত ন'টায়। সিরাজউদ্দিন সাহেবের বিধ্বস্ত অবস্থা। আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'পরীক্ষা তো আপনার ছাত্ররা দেয় নি, দিয়েছেন আপনি। মনে হচ্ছে ভালোই দিয়েছেন।'

আমার সঙ্গেই তিনি ঘরে ফিরলেন। খাওয়া-দাওয়া করে নিজের জায়গায় ফিরে যাবেন। অতিরিক্ত ক্লান্ত থাকার জন্যে বোধহয় আজ সাপের গল্প শুরু হলো না। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করে তিনি উঠে পড়লেন।

'স্যার যাই। দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েন। রাত-বিরাতে বেরুবোর সময় একটু খেয়াল রাখবেন। শব্দ করে পা ফেলবেন। সাপেরই এখন সিজন।'

'খুব খেয়াল রাখব।'

আমি দরজা বন্ধ করে বিছানায় এসে বসামাত্র ঠিক আগের মতো হলো। তীব্র একটা ভয় আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। থরথর করে হাত-পা কাঁপছে। নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। মনে হচ্ছে এক্ষুনি বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যাব। দরজার কড়ায় টন করে একটা শব্দ হলো। যেন কেউ কড়া নাড়তে গিয়ে কড়া নাড়ল না। ঠিক তখন ভয়টা চলে গেল। আমি পুরোপুরি স্বাভাবিক।

জগ থেকে ঢেলে এক গ্লাস পানি খেলাম। গলা উঁচিয়ে ডাকলাম– কালিপদ, কালিপদ। কেউ সাড়া দিল না। আজ বোধহয় ডিউটি দিচ্ছে না।

বারান্দায় একটা চেয়ার টেনে এনে বসলাম। সিগারেট ধরালাম। আকাশে অল্প মেঘ। মাঝে মাঝে মেঘের আড়ালে চাঁদ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, আবার ভেসে উঠছে। অপূর্ব আলো-আঁধারী। ঢাকা শহরে বসে এই দৃশ্য ভাবাই যায় না। তবে বড় বেশি নির্জন। ঝিঁঝি ডাকছে। ঢাকা শহরে ঝিঁঝির ডাকও ম্যাজিকের মতো হঠাৎ করে থেমে যাচ্ছে। সেই সময়টা বেশ অদ্ভুত মনে হয়। সবাই যেন বিরাট কোনো ঘটনার জন্যে অপেক্ষা করছে। বই-পত্র পড়ে আমার ধারণা হয়েছিল শিয়াল বোধহয় প্রহরে প্রহরে ডাকে। এই ধারণাও দেখলাম সত্যি না। সারাক্ষণই শিয়াল ডাকছে। সেই ডাকের মধ্যে একটা করুণ ব্যাপার আছে। শুনতে ভালো লাগে।

ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে নিয়ে আবার এসে বসলাম বারান্দায়। আর তখন দেখলাম কালিপদ আসছে। তার হাতে একগাদা এঁটো বাসন-কোসন। সম্ভবত পুকুরে ধোবে।

'এই কালিপদ।'

'আদাব স্যার'

'একটু শুনে যাও তো।'

কালিপদ এগিয়ে এসে মাথা নুইয়ে প্রণাম করল। হিন্দুদের প্রণামের এই ভঙ্গিটি বেশ সুন্দর।

'রাত দুপুরে ধুতে যাচ্ছ নাকি?'

'হ স্যার।'

'আচ্ছা, তুমি কি সিরাজউদ্দিন সাহেবের বাসা চেনো?'

'আজ্ঞে চিনি।'

'কতদূর?'

'দুই মাইলের উপরে হইব।'

'কালিপদ তুমি একটা কাজ করতে পারবে?'

'নিশ্চয় পারব স্যার, বলেন।'

'তুমি কি আমাকে ওর বাসায় নিয়ে যেতে পারবে?'

কালিপদ অবাক হয়ে বলল, 'এখন?'

'হ্যাঁ, এখন। তুমি তোমার কাজ সেরে আস, তারপর যাব।'

'আমি উনারে ডাইকা নিয়া আসি?'

'না, ডেকে আনতে হবে না। আমিই যাব। তোমার কোনো অসুবিধা আছে?'

'আজ্ঞে না, অসুবিধা নাই। আমি আসতাছি।'

সিরাজউদ্দিনের বাসায় যাবার ব্যাপারটা যে আমি ঝোঁকের মাথায় করলাম তা না। আমার নিশ্চিত ধারণা হয়েছে যে, সিরাজউদ্দিনের সঙ্গে আমার হঠাৎ ভয় পাবার একটা সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্কটা বের করতে না পারলে আজ রাতেও আমার ঘুম হবে না। আদিভৌতিক কোনো ব্যাপারেই আমার বিশ্বাস নেই। কার্যকারণ সম্পর্ক ছাড়াও পৃথিবীতে কিছু ঘটে না। বস্তুজগতের প্রতিটি বস্তুকেই নিউটনের গতিসূত্র মানতে হয়।

ডাল ভাঙা ক্রোশ বলে একটা কথা বইপত্রে পড়েছি। আজ সেটা বাস্তবে জানা গেল। হাঁটছি তো হাঁটছিই। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করছি, কালিপদ আর কতদূর? সে তার

উত্তরে ফোঁৎ জাতীয় একটা শব্দ করছে। লোকটি কথা কম বলে। কথাবার্তা হ্যাঁ-না'র মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিংবা কে জানে গ্রাম-ট্রামের দিকে হয়তো চলতি অবস্থায় কথা কম বলার নিয়ম। তার উপর লক্ষ করলাম লোকটা একটু ভীতু টাইপের। কোনো শব্দ হতেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। আমি যখন বলছি– কি হলো কালিপদ? তখন আবার হাঁটা শুরু করছে। আগেও দেখেছি দারোয়ানরা সব সময় ভীতু ধরনের হয়।

এক সময় আমরা ছোটখাটো একটা নদীর ধারে চলে এলাম। বর্ষাকালে এর চেহারা রমরমা থাকলেও থাকতে পারে, এখন দেখাচ্ছে সরু ফিতার মতো। পায়ের পাতাও হয়তো ভিজবে না।

'কালিপদ নদীর নাম কি?'

'বিরুই নদী।'

'বিরুই চালের কথা শুনেছি। এই নামে যে নদীও আছে কে জানত। নদী পার হতে হবে?'

'আজ্ঞে না।'

'এসে পড়েছি নাকি?'

'হ।'

সে হ বলেও থামছে না। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে না কোথাও থামবে। মনে হচ্ছে এটা আমাদের অনন্তযাত্রা। সিরাজউদ্দিনের সঙ্গে কথাবার্তা কি বলব কিছুই ঠিক করি নি। আগে থেকে ঠিকঠাক করে গেলে কোনো লাভ হয় না। আসল কথা বলবার সময় ঠিক করে রাখা কথা একটাও মনে আসে না। কতবার এ রকম হয়েছে। যৌবনে জরী নামের একজন কিশোরীর সঙ্গে বেশ পরিচয় ছিল। খুব সাহসী মেয়ে। সে নিজ থেকেই একবার আমাকে খবর পাঠাল আমি যেন সন্ধ্যাবেলায় তাদের বাড়ির ছাদে অপেক্ষা করি। সারাদিন ভাবলাম ছাদের নির্জনতায় কি সব কথা বলব। কতটুকু আবেগ থাকবে। কোন পর্যায়ে হাতে হাত রাখব। বাস্তবে তার কিছুই হলো না। প্রচণ্ড ঝগড়া বেধে গেল। জরী কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, ছোটলোক। আমি কড়া গলায় বললাম, আমি ছোটলোক না ছোটলোক হচ্ছ তুমি। শুধু তুমি একা না তোমাদের বাড়ির সবাই ছোটলোক। এবং তোমার বড় মামা একটা ইতর। আবেগ-ভালোবাসার একটি কথাও দু'জনের কেউ বললাম না।

'স্যার এই বাড়ি।'

আমি থমকে দাঁড়ালাম। ছোট্ট একটা টিনের ঘর। কলাগাছ দিয়ে ঘেরা। খড় পোড়ানো গন্ধ আসছে। পরিষ্কার ঝকঝকে উঠান। উঠানে দাঁড়াতেই কুকুর ডাকতে লাগল। চোর ভেবেছে বোধহয়। ভেতর থেকে সিরাজউদ্দিন চেঁচাল– কে কে?

কালিপদ বলল, 'দরজাটা খুলেন। আমি কালিপদ।' দরজা সঙ্গে সঙ্গে খুলল না। হারিকেন জ্বালানো হল। তাতে বেশ খানিকটা সময় লাগল। সিরাজউদ্দিন একটি লুঙ্গি পরে খালি গায়ে বের হয়ে এলো। চোখ কপালে তুলে বলল, 'স্যার আপনি?'

'দেখতে এলাম আপনাকে।'

'কেন?'

'কোন কারণ নেই। ঘুম আসছিল না। ভাবলাম, দেখি রাতের বেলা গ্রাম কেমন দেখা যায়? আপনি বোধহয় শুয়ে পড়েছিলেন? ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?'

'জি।'

'খুব লজ্জিত। কিছু মনে করবেন না।'

'আসেন, ভেতরে এসে বসেন।'

সিরাজউদ্দিন সাহেবের বিস্ময় এখনো কাটে নি। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'কোনো ঝামেলা হয়েছে স্যার?'

'না, না, ঝামেলা কি হবে? বেড়াতে এসেছি। একটু অসময়ে চলে এলাম এই আর কি?'

'স্যার একটু চা করি?'

'অসুবিধা না হলে করেন।'

'না, না কোনো অসুবিধা নাই। কোনো অসুবিধা নাই।'

সিরাজদ্দিন সাহেব ছোটাছুটি শুরু করলেন। উঠানে চুলা জ্বালানো হলো। কালিপদ দেখলাম টাকা নিয়ে আবার ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। হয়তো চা বা চিনি নেই, আনতে গেছে। এই রাতদুপুরের কোথায় এসব পাবে কে জানে।

'সিরাজউদ্দিন সাহেব।'

'জি স্যার।'

'লোকজন দেখছি না যে। আপনি একাই থাকেন নাকি?'

'বিয়ে-শাদি তো করি নাই।'

'করেন নি কেন?'

'ভাগ্যে ছিল না। কষ্টের সংসার ছিল। নিজেই খেতে পেতাম না।'

'এখন তো বোধহয় অবস্থা সে রকম না।'

'জি, এখন মাশাআল্লাহ সামলে উঠেছি। কিছু জমিজমাও করেছি।'

'তাই নাকি?'

'অতি অল্প। ধানী জমি।'

'একা একা থাকেন, ভয় লাগে না?'

'ভয় লাগবে কেন?'

সিরাজউদ্দিন সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। আমি খানিকটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। ভয়ের ব্যাপারটা নিয়েই আমি আলাপ করতে চাই। কিন্তু কিভাবে সেটা করা যায়? আমি ইতস্তত করে বললাম, 'আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?'

'জি না। এই সব হচ্ছে কুসংস্কার। এই গ্রামেই একটা রেন্টি গাছ আছে। লোকে নানান কথা বলে। কি কি নাকি দেখে। আমি কোনোদিনই দেখি নাই। রাত-বিরাতে কত যাওয়া-আসা করেছি।'

চা তৈরি হয়েছে। চিনি ছিল না। খেজুর রসের চা। চমৎকার পায়েস পায়েস গন্ধ। কাপে চুমুক দিতে দিতে সিরাজউদ্দিন বললেন, 'তবে জিন বলে একটা জিনিস আছে।' আমি কৌতূহলী হলে বললাম, 'আপনি বিশ্বাস করেন?'

'করব না কেন? কোরান শরীফে পরিষ্কার লেখা জিন এবং ইনসান। হাশরের দিনে মানুষের যেমন বিচার হবে– জিনেরও হবে।'

'আপনি জিন দেখেছেন কখনো?'

'জি না। সাধারণ লোকে দেখে না।'

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম। সিরাজউদ্দিন লোকটি আসলেই সাধারণ। কোনোরকম বিশেষত্ব নেই। আমার হঠাৎ ভয়ের সঙ্গে এই লোকটিকে কিছুতেই জড়ানো যাচ্ছে না। সরাসরি এই প্রসঙ্গটা আনা মুশকিল। তবু একবার বললাম, 'আপনি চলে আসার পর ঐ রাতে কেমন যেন হঠাৎ করে ভয় পাই।'

সিরাজউদ্দিন সাহেব সঙ্গে সঙ্গে উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, 'সাপ জিনিসটা তো ভয়েরই। ভয় পাওয়াটা ভালো। তাহলে সাবধানে চলাফেরা করবেন। অসাবধান হলেই সর্বনাশ। রাতে বের হলে টর্চ লাইটটা সঙ্গে রাখবেন। শব্দ করে পা ফেলেবেন।'

বিদায় নিতে রাত একটা বেজে গেল। সিরাজউদ্দিন আমার সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করে এগিয়ে দিতে এলেন। তিনি এলেন বিরুই নদী পর্যন্ত। চাঁদের আলো আছে। চারদিকে স্পষ্ট দেখা যায়। তবু তিনি জোর করে কালিপদের হাতে একটা হারিকেন ধরিয়ে দিয়ে উল্টো দিকে রওনা হলেন। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। যতক্ষণ তাঁকে দেখা যায় ততক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। যেই মুহূর্তে তিনি বাঁশবনের আড়ালে পড়লেন ঠিক সেই মুহূর্তে আবার সেই রকম হলো। অন্ধ যুক্তিহীন ভয়। যেন ভয়ঙ্কর অশুভ একটা কিছু আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে ছুটে আসছে। সেই অশুভ জিনিসটাকে চোখে দেখা যায় না। কিন্তু আমি রক্তের প্রতি কণিকায় তাকে অনুভব করছি। এর ক্ষমতা অসাধারণ। এ অন্য জগতের কেউ। এ জগতে তাকে কেউ জানে না। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় কাঁপিয়ে দিয়ে ভয়টা চলে গেল। কিছুটা ধাতস্থ হয়ে লক্ষ করলাম আমি মাটিতে বসে আছি। কালিপদ আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলছে, 'কি হইল স্যার? কি হইল?'

'কিছু হয় নি। মাথাটা কেমন যেন করল।'

'মাথা ধুইবেন স্যার? নদীর পানি দিয়া...।'

'মাথা ধুতে হবে না। চলো রওনা দেই।'

বলেও রওনা দিতে পারলাম না। ভয় একেবারেই নেই কিন্তু শরীর অবসন্ন। অসম্ভব ঘুম পাচ্ছে।

'কালিপদ!'

'জে আজ্ঞে।'

'একটু আগে তোমার কি কোনো ভয়-টয় লেগেছে?'

'জে না।'

'ও আচ্ছা! চলো আস্তে আস্তে হাঁটি।'

কালিপদ বারবার মাথা ঘুরিয়ে আমাকে দেখছে। পাগল ভাবছে কি-না কে জানে। ভাবলেও তাকে দোষ দেয়া যায় না। যে লোক মাঝরাত্রিতে বেড়াতে বের হয়, অকারণে ভয় পেয়ে আধমরা হয়ে যায় সে আর যাই হোক খুব সুস্থ নয়।

পরের দিনটা আমার খুব খারাপ কাটল। কিছুতেই মন বসাতে পারি না। ভাইভা শুরু হয়েছে। ছাত্রদের প্রশ্নের জবাবগুলিও ঠিকমত শুনছি না। বি.এস.সি. পরীক্ষা দিতে এসে একজন দেখি সোডিয়াম ক্লোরাইডের ফরমুলাতে দুটি ক্লোরিন এটম দেখাচ্ছে। প্রচণ্ড রাগ হবার কথা। রাগও হচ্ছে না। পাস নাম্বার দিয়ে বিদায় করে দিচ্ছি। কেমিস্ট্রির হেড বললেন, 'আপনার কি শরীর খারাপ?'

আমি ক্লান্ত গলায় বললাম, 'হ্যাঁ। কিছুতেই মন বসছে না। খুব টায়ার্ড লাগছে।'

'রাতে ঘুম কেমন হয়েছে?'

'ঘুম ভালোই হয়েছে।'

'যদি হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস করেন তাহলে এক ডোজ ওষুধ দিতে পারি।'

আমি বিরক্ত স্বরে বললাম, 'আপনি কি হোমিওপ্যাথিকও করেন?'

'জি। ছোটখাটো একটা ডিসপেনসারি আছে। রোগী-টুগী ভালোই হয়।'

মফস্বল কলেজের টিচারদের এই এক জিনিস। একটিমাত্র পেশায় তাঁরা খুশি নন। প্রত্যেকের দ্বিতীয় কোনো পেশা আছে। কোন পেশাটি প্রধান বোঝা মুশকিল।

'কি স্যার হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস আছে?

'জি না, ভূত-প্রেত এবং হোমিওপ্যাথি– এই তিন জিনিস আমি বিশ্বাস করি না। আপনি কিছু মনে করবেন না।'

ভদ্রলোক মুখ কালো করে বললেন, 'হোমিওপ্যাথি বিশ্বাস করেন না কেন? এটা তো হাইলি সায়েন্টিফিক ব্যাপার। হ্যানিম্যান সাহেবের কথাই ধরেন। উনি নিজে একজন পাস করা ডাক্তার ছিলেন।'

হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধে আমি একগাদা কথা বলতে পারতাম। টু হানড্রেড পাওয়ারের একটি ওষুধে যে আসলে কোন অষুধই থাকে না সেটা মোলার কনসাইট্রেসন এবং অ্যাভাগেড্রো নাম্বার দিয়ে সহজেই প্রমাণ করা যেত। তর্কের ক্ষেত্রে সব সময় তাই করি। আজ ইচ্ছা করছে না। পাঁচটা বাজতেই উঠে পড়লাম। পরীক্ষা তখনও চলছে– চলতে থাকুক। আমি বললাম,

'আপনারা ভাইভা শেষ করে দিন, আমি ঘরে চলে যাব।'

'প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের বাসায় আপনার না চা খাওয়ার কথা?'

ভুলেই গিয়েছিলাম। মনে পড়ায় মেজাজ আরও খারাপ হলো। কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না। তবু যেতে হবে।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেবও দাওয়াতের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। আমাকে দেখে অনেকক্ষণ অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থেকে বললেন– 'ও আচ্ছা, আচ্ছা। আসুন আসুন। চা খেতে বলেছিলাম তাই না? কিচ্ছু মনে নেই। আসুন বারান্দায় বসি। নানান ঝামেলায় আছি ভাই।'

তিনি আমাকে বসিয়ে রেখে ভেতরে চলে গেলেন। অনেকক্ষণ তাঁর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। দরজা ধরে পাঁচ-ছ'বছর বয়সের মিষ্টি চেহারার একটি মেয়ে কৌতূহলী চোখে আমাকে দেখছে। এর সঙ্গে দু'একটা কথা বলা উচিত কিন্তু ইচ্ছা করছে না। বাড়ির ভেতর থেকে হিংস্র পশুর গর্জনের মতো গর্জন কানে আসছে। একটি মেয়েও

কাঁদছে। কখনো কখনো কান্না থেমে যাচ্ছে, আবার শুরু হচ্ছে। এইরকম অবস্থায় চায়ের জন্যে অপেক্ষা করাটাও অপরাধ।

'অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম। ছেলেটা বড় ঝামেলা করছে। শুনেছেন বোধহয়?'

'জ্বি শুনেছি।'

'ভালো খবর কেউ কখনো শুনে না। কিন্তু এইসব খবর সবাই শুনে ফেলে। নিতান্ত অপরিচিত লোকও এসে গায়ে পড়ে বিচিত্র সব চিকিৎসার কথা বলে।'

আমি চুপ করে রইলাম। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব তিক্ত গলায় বলেন, 'সেই জাতীয় চিকিৎসা এখন হচ্ছে। সাত নদীর পানিতে গোসল। ঠাণ্ডায় গোসল দিয়ে নিউমোনিয়া বাঁধাবে।'

'ডাক্তারি চিকিৎসা করাচ্ছেন না?'

'তাও আছে। বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক সবরকম চিকিৎসাই চলছে। কোনোটাই লাগছে না।'

'অসুখটা শুরু হলো কিভাবে?'

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। এই প্রসঙ্গে নিয়ে কথা বলতে হয়তো তাঁর ইচ্ছা করছে না। চা চলে এলো। শুধু চা নয়। মিষ্টি, সিঙ্গাড়া, কচুরি।

'নিন চা নিন। ক্ষিদে না থাকলে এই খাবারগুলি খাবেন না। সবই দোকানের কেনা। এদিকে আবার খুব ডাইরিয়া হচ্ছে।'

চা-টা চমৎকার! এক চুমুক দিয়েই মাথা ধরাটা অনেকখানি সেরে গেল। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বললেন, 'কি করে অসুখটা শুরু হলো সত্যি জানতে চান?'

'বলতে ইচ্ছে না করলে থাক।'

'না না, শুনুন। গত বছর গরমের সময় আমার এই ছেলে তার বউকে নিয়ে এখানে আসে। আমি অনেকদিন থেকেই আসতে বলছিলাম। ছুটি পায় না, আসতে পারে না। ব্যাংকের চাকরি। ছুটিছাঁটা কম। সাত দিনের ছুটি নিয়ে এসেছে। আমি এখানে এসেছি দু'বছর আগে। ছেলে প্রথম এল। আমরাও খুব খুশি।

'রাত্রিবেলা বেশ গল্পগুজব করছি। সিরাজউদ্দিন এসেছে। সাপের গল্প-টল্প করছে। রাত দশটার দিকে সিরাজউদ্দিন চলে যেতেই ছেলে যেন কেমন হয়ে গেল। থরথর করে কাঁপছে। মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে। কোনোমতে বলল– তার নাকি অসম্ভব ভয় লাগছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে স্বাভাবিক হয়ে গেল। হাসি-তামাশা করতে লাগল। তখন কিছু বুঝতে পারি নি। এখন বুঝছি ঐ রাতেই তার পাগলামির প্রথম শুরু।'

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব চুপ করলেন। আমি নিশ্বাস বন্ধ করে শুনেছি। আমার শরীর দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে যাচ্ছে। পিপাসায় বুক শুকিয়ে কাঠ। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বললেন,

'কয়েকদিন পর আবার এরকম হলো। সেও রাতের বেলা। কলেজের কিছু প্রফেসরকে খেতে বলেছিলাম। তারা খাওয়া-দাওয়া করে চলে যাবার পর আবার আমার ছেলে ঐ রকম করতে লাগল।'

আমি ক্ষীণ স্বরে বললাম, 'সিরাজউদ্দিন সাহেবেরও দাওয়াত ছিল?'

'হ্যাঁ, ছিল। কলেজ স্টাফের সবাইকে বলেছিলাম।'

'তারপর কি হলো বলুন?'

'আর বলার কিছু নেই। রোজই ওরকম হতে লাগল।'

'কখন হতো?'

'রাত দশটা সাড়ে দশটা।'

আমি কোনো কথা না বলে পরপর দুটা সিগারেট শেষ করলাম। চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে, এখন আমার চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু যেতে পারছি না। আমি নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললাম, 'সিরাজউদ্দিন সাহেব কি প্রায়ই আসেন নাকি এখানে?'

'আসে। আমার ছোট ছেলেটাকে প্রাইভেট পড়ায়। সিনসিয়ার লোক। রোজ সাতটার সময় আসে, রাত দশটা সাড়ে দশটার আগে যায় না।'

'আমি কি আপনার ছেলেটাকে একটু দেখতে পারি?'

তিনি বেশ অবাক হলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আসুন আমার সঙ্গে।' আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম। না গেলেই ভালো করতাম। সাতাশ-আটাশ বছরের একটা ছেলে। দড়ি দিয়ে বাঁধা। কি যে অসহায় লাগছে। ছেলেটি আমার দিকে কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে। আমি বললাম, 'একে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। ঢাকায় নিয়ে চিকিৎসা করান।'

'ঢাকাতেই তো ছিল। কোনোরকম উন্নতি হয় না। টাকার শ্রাদ্ধ। এখানে বরংচ ভালো আছে। সিরাজউদ্দিনের সঙ্গে বেশ খাতির। সে এলে শান্ত থাকে। প্রায় স্বাভাবিক আচরণ করে।'

'তাই নাকি?'

'জি। কয়েকদিন ধরে সিরাজ আসছে না। আপনাকে নিয়ে ব্যস্ত। তাই ছেলেটার উগ্র স্বভাব হয়ে গেছে। গত পরশু বঁটি নিয়ে তার মাকে কাটতে গিয়েছিল।'

'সিরাজউদ্দিন সাহেবের কথা-টথা বলে?'

'না, কথা-টথা কিছু না। চুপচাপ থাকে, ও এলে খুশি হয়, এটা বুঝি। মুচকি মুচকি হাসে। সিরাজউদ্দিন গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে একেবারে শান্ত হয়ে যায়।'

আমি তাকিয়ে আছি ছেলেটির দিকে। সে গোঙানির মতো একটা চাপা শব্দ করছে। মুখ থেকে অনবরত লালা বেরুচ্ছে। মুখ ঈষৎ হাঁ হয়ে আছে। একটু আগেই যাকে অসহায় লাগছিল এখন সেরকম লাগছে না। বরং কেমন যেন ভয়ংকর লাগছে। আমি ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে বললাম, 'প্রিন্সিপ্যাল সাহেব, আমাকে আজ রাতেই ঢাকা চলে যেতে হচ্ছে।'

'কি বললেন?'

'আমি কিছুতেই থাকতে পারছি না। কেন পারছি না– সেই কারণও আপনার কাছে ব্যাখ্যা করতে পারছি না। কোনোদিন পারব বলেও মনে হয় না।'

'আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আপনি পরীক্ষা কয়েকদিন পিছিয়ে দিন। নতুন এগজামিনার এসে বাকিটা শেষ করবে।'

'অসম্ভব কথা আপনি বলছেন।'

'তা বলছি। কিন্তু আমাকে যেতেই হবে।'

সেই রাতেই আমি ঢাকা চলে আসি। এই অস্বাভাবিক ঘটনাটি স্মৃতি থেকে পুরোপুরি মুছে ফেলি। নিজেকে বোঝাই যে সমস্তটাই ছিল উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা। গ্রামের নির্জনতা কোনো না কোনোভাবে আমাকে প্রভাবিত করেছিল।

এই ঘটনার চার বছর পর সিরাজউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা। আমি তাঁকে চিনতে পারি নি। তিনি বায়তুল মোকাররমের ফুটপাত থেকে উলেন স্যুয়েটার কিনছিলেন। তিনি আমাকে দেখতে পেয়ে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন।

'স্যার, আমাকে চিনতে পেরেছেন? আমি সিরাজ।'

'চিনতে পেরেছি।'

'ঐবার স্যার কাউকে কিছু না বলে হুট করে চলে এলেন। পরীক্ষা এক মাস পিছিয়ে গেল। কি দুর্দশা ছাত্রদের! গরিবের ছেলেপুলে।'

আমি কঠিন স্বরে বললাম, 'আপনারা সবাই ভাল তো?'

'জি ভালো।'

'প্রিন্সিপ্যাল সাহেব– উনি ভালো আছেন?'

'উনার খবরটা জানি না। ছেলেটা মারা যাওয়ার পর চাকরি ছেড়ে দিয়ে জামালপুর চলে গেলেন।'

'ছেলেটা মারা গেছে বুঝি?'

'জি, বড়ই দুঃখের কথা। পাগল মানুষ বাড়ি থেকে বের হয়ে কোথায় চলে গেল। নানা জায়গায় খোঁজাখুঁজি। তিনদিন পর নদীতে লাশ ভেসে উঠেছে। আমিই খুঁজে পাই। আমার বাড়ির পাশের ঘাটে গিয়ে লেগেছিল।'

'তাই বুঝি?'

'জি স্যার। খুবই আফসোসের কথা।'

'এখন কি নতুন প্রিন্সিপ্যাল আসছেন?'

'জি, খুবই ভালো লোক। প্রায়ই যাই উনার বাসায়। আমাকে খুব আদর করেন। উনার সঙ্গে গল্পগুজব করি।'

'খুবই ভালো কথা।'

'তবে স্যার অদ্ভুত ব্যাপার কি জানেন? নতুন প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের স্ত্রী মাঝে মাঝে বিনা কারণে ভয় পেয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি করেন। অবিকল আগের প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের ছেলের মতো অবস্থা। মনে হয় বাড়িটার একটা দোষ আছে।'

আমি কঠিন চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সিরাজউদ্দিন বলল, 'আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে বড় ভালো লাগছে স্যার। আপনার কথা আমার প্রায়ই মনে হয়।'

সিরাজউদ্দিন হাসল। তার হাসিতে শিশুর সারল্য। চোখ দুটি মমতায় আর্দ্র।

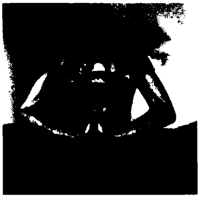

গোবর বাবু

নীলগঞ্জ হাইস্কুলের ড্রিল স্যারের নাম ইয়াকুব আলি। বয়স পঞ্চাশের উপর। বেঁটে-খাটো মানুষ। সাধারণত ড্রিল স্যারদের স্বাস্থ্য খুব ভালো হয়ে থাকে। ইয়াকুব আলি সাহেব ব্যতিক্রম। ভয়ংকর রোগা। বছরের বেশিরভাগ সময় পেটের অসুখে ভুগেন। যে ঋতুতে সে অসুখটা হওয়ার কথা তাঁর তা হয়। বসন্তকালে চিকেন পক্স কিংবা হাম হয়, বর্ষাকালে ভয়াবহ ধরনের ডায়রিয়া হয়। সারা শীতকাল খকখক করে কাশেন, এই সময় তাঁর হাঁপানির টান ওঠে।

ভদ্রলোক নিতান্তই ভালমানুষ।

জগতের সমস্ত ভালোমানুষরা সরল ধরনের হয়ে থাকেন। ইয়াকুব সাহেব একটু বেশিমাত্রায় সরল। তাঁর মাথায় স্বাস্থ্যরক্ষা অর্থাৎ ব্যায়াম ছাড়া কিছুই ঢুকে না। তিনি দুটি বই লিখেছেন– হাসতে হাসতে ব্যায়াম শিক্ষা এবং ছোটদের সহজ ব্যায়াম। টাকার অভাবে বই দুটি ছাপাতে পারছেন না।

তাঁর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এঁদের কোনো ছবি নেই। তিনটি বাঁধানো ছবি আছে– একটি গামা পালোয়ানের, একটি শ্যামাকান্তের, অন্যটি ভীম ভবানীর। এ ছাড়াও তাঁর শোবার ঘরে একটা সূচিকর্ম আছে। চারদিকে লতা, ফুল, পাতা, মাঝখানে লেখা, 'স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল'। সূচিকর্ম তাঁর স্ত্রীর করা। বিয়ের দ্বিতীয় বছরে ভদ্রমহিলা মারা যান। ইয়াকুব সাহেব দ্বিতীয়বার আর বিয়ে করেন নি।

ড্রিল ক্লাসে তিনি ছাত্রদের ব্যায়াম করান কবিতায়। এইসব কবিতা তাঁর নিজের লেখা। গানের মতো সুরে তিন মাত্রায় পড়তে হয়, সেই সঙ্গে ব্যায়াম করতে হয়। একেক ক্লাসের জন্য একেক ধরনের কবিতা। প্রাইমারি সেকশনের জন্য লেখা তার ব্যায়াম কবিতাটা এই রকম,

বায়ু বহে ভীম বেগে শব্দ শন শন
এইবার দাও দেখি পাঁচ বুক ডন।।

[এইখানে ছাত্ররা পাঁচটা বুক ডন দেবে। বুক ডন শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে বলবে–]

দেখো দেখো উড়ে যায় সাদা সাদা বক
এইবার দাও দেখি দশ বৈঠক।।

[দশটা বৈঠক দিতে হবে। অতি দ্রুত।]

পাল তুলে চেয়ে দেখ চলে ছোট নাও।
কোমরে হাত রেখে সোজা দৌড়াও।।

[দৌড়ে স্কুলের মাঠে দুটা চক্কর দিতে হবে।]

ইয়াকুব আলি সাহেব নিতান্তই দরিদ্র ব্যক্তি। ড্রিল টিচার হিসেবে স্কুল থেকে সামান্যই বেতন পান। একা মানুষ বলে কষ্টেসৃষ্টে কোনোরকমে চলে যায়। শারীরিক কষ্ট তাঁর গায়ে লাগে না। তবে কেউ যখন ব্যায়াম বিষয়ে আজেবাজে কথা বলে তখন তাঁর মনটা খুব খারাপ হয়।

আজ তাঁর মনটা খারাপ। শুধু খারাপ বললে কম বলা হবে, খুবই খারাপ। কারণ নীলগঞ্জ স্কুলের হেড স্যার ব্যায়াম নিয়ে তাঁকে কিছু কটু কথা বলেছেন। অথচ কটু কথা বলার মতো কিছুই তিনি করেন নি। ব্যাপারটা এরকম– তিনি টিচার্স কমন রুমে বসে লিখছিলেন। হেড স্যার ঘরে ঢুকে বললেন, 'ইয়াকুব সাহেব কি করছেন?'

তিনি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, 'লিখছি স্যার।'

'কি লিখছেন?'

'স্যার, একটা গ্রন্থ রচনা করছি– ব্যায়ামের অ আ ক খ।'

হেডস্যার সঙ্গে সঙ্গে মুখ এমন করলেন যেন 'ব্যায়ামের অ আ ক খ' লেখা খুব অন্যায়। তিনি খড়খড়ে গলায় বললেন, ক্লাস থ্রিতে একটু যান তো। ওদের অংক স্যার আসেন নি। ছাত্ররা খুব হৈচৈ করছে। গোটা কয়েক ভাগ অংক দিয়ে বসিয়ে দিন। পারবেন তো?

'অবশ্যই পারব, স্যার।'

ইয়াকুব সাহেব ক্লাসে গেলেন। রোল কল করে বোর্ডের কাছে চলে গেলেন। বোর্ডে বড় বড় করে লিখলেন– অংক। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, 'অংক জিনিসটা কি বলো তো?'

কেউ বলতে পারল না। তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, 'সামান্য জিনিস বলতে পারছিস না? অংক হচ্ছে মাথার ব্যায়াম। তাহলে ব্যায়াম কত রকমের হলো? দু'রকম। শরীরের ব্যায়াম এবং মাথার ব্যায়াম। শরীরের ব্যায়ম ক' ধরনের হয় তোরা জানিস? তোদের ক্লাসে ফার্স্ট বয় কে উঠে দাঁড়া দেখি?'

ফার্স্ট বয় উঠে দাঁড়াল। ইয়াকুব সাহেব হতাশ গলায় বললেন, 'ও-কি, এমন বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়েছিস কেন? সোজা হয়ে দাঁড়া। বুক টান করে দাঁড়া। বুক টান করে দাঁড়ানোও এক ধরনের এক্সারসাইজ।'

ভাগ অংক কিছুই করা হলো না। পুরো এক ঘণ্টা চলে গেল। ইয়াকুব স্যার জলের মতো বুঝিয়ে দিলেন বুকটান করে দাঁড়ানোর কি উপকারিতা। এতে ফুসফুসের কি হয়–এই সব।

ক্লাসের শেষে তিনি কমন রুমে এসে বসেছেন, হেডস্যার ডেকে পাঠালেন। থমথমে গলায় বললেন, 'বারান্দায় দাঁড়িয়ে আপনার পড়ানো শুনছিলাম। এক সময় শুনি আপনি গান গাচ্ছেন। এর মানে কি?'

ইয়াকুব সাহেব বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'গান না স্যার। যোগ ব্যায়াম নিয়ে একটা কবিতা লিখেছিলাম। ছাত্রদের পড়ে শুনালাম। এই কবিতাটা গানের সুরে পড়তে হয়। তাই নিয়ম।'

'অংকের ক্লাসে আপনি যোগ ব্যায়ামের কবিতা পড়াচ্ছেন, এর মানে কি?'

ইয়াকুব সাহেব মাথা চুলকাতে লাগলেন। হেড স্যার কঠিন স্বরে বললেন, 'আমার তো ধারণা আপনার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে।'

'খারাপ হয় নি, স্যার।'

'আপনি বললে তো হবে না, আমরা দশজন যা দেখছি তাতে আমাদের ধারণা হয়েছে, আপনার মাথা পুরো এলোমেলো অবস্থায় আছে। সবাই আপনাকে নিয়ে হাসাহাসি করে এটা জানেন?'

'জি না।'

'তা তো জানবেনই না। আপনাকে নিয়ে যে হাসি-তামাশা হয় তা বোঝার মতো বুদ্ধিও তো আপনার নেই। শুনছি ইদানীং না-কি ঘাস খাচ্ছেন। এটা কি সত্যি?'

ইয়াকুব সাহেব জবাব দিলেন না। চুপ করে রইলেন। তাঁর নীরবতার কারণ হচ্ছে ঘাস খাওয়ার ব্যাপারটা সত্যি। তাঁর ধারণা হয়েছে ঘাসে প্রচুর ভিটামিন। সেই ভিটামিন কাজে লাগানো যায় কি-না তা পরীক্ষা করে দেখছেন। আধাসের কচি ঘাসে এক তোলা সোডা দিয়ে ঘণ্টা খানিক জ্বাল দিয়েছেন। থকথকে সবুজ জেলির মতো একটা বস্তু তৈরি হয়েছে। রোজ বিকেলে চিনি দিয়ে তিনি সেই বস্তু দু'চামচ করে খান।

'কি, কথা বলছেন না কেন? ঘাস খাচ্ছেন না-কি?'

'জি স্যার, খাচ্ছি?'

'খেতে কেমন?'

'খেতে ভালো না, তবে বলকারক।'

হেডস্যার থমথমে গলায় বললেন, 'লোকে যখন জানবে এই স্কুলের একজন প্রবীণ শিক্ষক রোজ ঘাস খাচ্ছেন তখন স্কুল সম্পর্কে তাদের কি ধারণা হবে বলুন দেখি?'

'আপনি যদি নিষেধ করেন তাহলে আর খাব না।'

'না, আমি নিষেধ করব না। আপনার ইচ্ছা হলে ঘাস খাবেন, কাঁঠাল পাতা খাবেন, কচুরিপানা খাবেন। আপনি খাবেন রুচিমত– আমি সেখানে বলার কে? তবে ঢাকঢোল পিটিয়ে খাবেন না। গোপনে খাবেন।'

'জি আচ্ছা।'

'শুধু একটা কথা আপনাকে বলি– ব্যায়াম নিয়ে হৈচৈ করবেন না। স্কুল পড়াশোনার জায়গা। কুস্তির আখড়া না। ব্যায়াম প্রসঙ্গে একটি কথাও যেন আর না শুনি।'

'বই কি লিখতে পারব স্যার?'

'কি বই?'

'ছোটদের ব্যায়ামের অ আ ক খ।'

'আপনি আমার সামনে থেকে যান।'

তিনি বিষণ্ন মুখে বের হয়ে এলেন। তাঁর মনটা ভেঙে গেল। রোজ যথানিয়মে স্কুলে যান। টিচার্স কমন রুমে চুপচাপ বসে থাকেন। বিকেলে বাসায় ফিরে আসেন। তাঁকে কোনো ক্লাস দেয়া হয় না। এমনকি পিটি ক্লাসও না। ব্যায়ামের বইটা লেখার চেষ্টা করেন। লেখা তেমন আগায় না। মন ভার না থাকলে লেখা আসে না।

দেখতে দেখতে ম্যাট্রিক পরীক্ষা এসে গেল। কোচিং ক্লাস শুরু হয়েছে। রোজ তিন ঘণ্টার কোচিং-ইংরেজি, অংক, ইলেকটিভ অংক, বিজ্ঞান। স্কুলের গত বছরের রেজাল্ট খারাপ হয়েছে, এবার যেন খারাপ না হয়।

এই সময় ইয়াকুব সাহেব এক কাণ্ড করলেন। এক সকালে হেড স্যারের ঘরে উঁকি দিয়ে বললেন, 'স্যার আসব?'

'জরুরি কিছু না থাকলে আসবেন না। কাজ করছি।'

'খুব জরুরি।'

'আসুন। বলুন কি ব্যাপার?'

ইয়াকুব সাহেব হড়বড় করে বললেন– 'ম্যাট্রিকের ছাত্রদের তো কোচিং হচ্ছে। আমি ভাবছিলাম এই সঙ্গে এক ঘণ্টা ব্যায়ামের কোচিং দিয়ে দিলে খুব ভালো হয়।'

হেডস্যার হতভম্ব হয়ে বললেন, 'ব্যায়ামের কোচিং মানে? কি বলছেন আপনি?'

'ছাত্রদের এক ঘন্টা করে ব্যায়াম করা। ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ, বৈঠক, বুকডন আর যোগ ব্যায়াম। যোগ ব্যায়ামের মধ্যে থাকবে– প্রাণায়াম এবং কুম্ভক। সব লিখে এনেছি।'

ইয়াকুব আলি সাহেব খাতাটা এগিয়ে দিলেন। খাতায় ছক টেনে সবকিছু লেখা। কোন বারে কি ব্যায়াম, কতক্ষণের ব্যায়াম সব সাজানো আছে।

'একেবারে সিলেবাস বানিয়ে নিয়ে এসেছেন?'

'জি স্যার।'

'কেন এটা করেছেন জানতে পারি?'

'পরীক্ষার আগে আগে স্বাস্থ্যটা ঠিক রাখা খুবই জরুরি। স্বাস্থ্য ঠিক না থাকলে একটু কঠিন প্রশ্ন দেখলেই মাথা ঘুরে পড়ে যাবে এবং পরীক্ষার আগের রাতে একশ তিন জ্বর এসে যাবে। এতদিনের পরিশ্রম সব গেল।'

হেড স্যার হিমশীতল গলায় বললেন, 'আপনি কি আমার সঙ্গে ফাজলামি করছেন না-কি?'

'জি না স্যার, ফাজলামি করব কেন?'

'আমার তো আপনার কথাবার্তা শুনে সে রকমই ধারণা হচ্ছে।'

'আপনি যদি উত্তেজিত না হয়ে আমার খাতার ছকগুলি একটু পরীক্ষা করে দেখেন, খুব যত্ন নিয়ে করেছি। প্রচুর মেধা ব্যয় করেছি।'

'শুনুন ইয়াকুব আলি সাহেব, আপনি আর স্কুলে আসবেন না।'

'কি বললেন স্যার?'

'আপনি আর স্কুলে আসবেন না। আমার ধারণা আপনার ব্রেইন ডিফেক্ট হয়ে গেছে। আপনার স্কুলে আসা মানে স্কুলের জন্য সমস্যা। আমি স্কুল কমিটিতে বিষয়টি তুলব। তারা যা সিদ্ধান্ত নেয় নেবে।'

'স্কুলে না এসে আমি করবটা কি স্যার?'

'বাড়িতে বসে ব্যায়াম-কবিতা লিখবেন এবং ঘাসের চাটনি খাবেন। এখন আমার সামনে থেকে যান। এ কি, খাতা না নিয়ে চলে যাচ্ছেন কেন? খাতা নিয়ে যান।'

তিনি বাড়িতে চলে এলেন। মন অসম্ভব খারাপ। বয়স কম হলে চিৎকার করে কাঁদতেন। এই বয়সে চিৎকার করে কাঁদা মানায় না বলে কাঁদতেও পারছেন না। সত্যি সত্যি চাকরি চলে গেলে গভীর সমুদ্রে পড়তে হবে। খাবেন কি?

ঘাসের চাটনি জিনিসটা বলকারক হলে অতি অখাদ্য। কষটা তিতকুটে ভাব আছে। মুখে নিলেই বমি ভাব হয়, নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসে। এই বস্তু খেয়ে জীবনধারণ করা নিতান্তই অসম্ভব। প্রাইভেট টিউশানিও যে করবেন সে উপায় নেই। কে আর ব্যায়ামের জন্যে প্রাইভেট টিউটর রাখবে?

তিনি দুপুরে কিছু খেলেন না। রাতেও কিছু খাবেন না বলে ঠিক করে রেখেছিলেন। শেষমেশ ক্ষিদের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে খিচুড়ি রাঁধতে বসলেন। তোলা উনুনে রান্না হচ্ছে। তিনি দরজার দিকে পেছনে ফিরে বসেছেন, হঠাৎ মনে হলো কে যেন দরজার পাশে এসে দাঁড়াল। চিকন গলায় বলল, 'জনাব আপনার সঙ্গে কি একটা কথা বলব?'

ইয়াকুব আলি বললেন, 'কে?'

'আমাকে তো জনাব চিনবেন না। যদিও আমি আপনার প্রতিবেশী।'

খিচুড়ি ধরে গিয়েছে। চামচ দিয়ে প্রবল বেগে নাড়তে হচ্ছে বলে ইয়াকুব সাহেব দরজার দিকে তাকাতে পারছেন না। খিচুড়ি নাড়তে নাড়তে বললেন, কোন বাড়িতে থাকেন, বলুন। বললেই চিনব। 'আমি তো জনাব কোনো বাড়িতে থাকি না, আম গাছে থাকি। আপনার বাসার পেছনে যে আমগাছ আছে ঐ আমগাছে থাকি।'

'আম গাছে থাকেন মানে? আপনি কে?'

'আমি স্যার একজন ভূত।'

ইয়াকুব সাহেবের মনে হলো–তিনি কানে ভুল শুনেছেন। ভূত আবার কি? ভূত-প্রেত থাকে বাচ্চাদের রূপকথার বই-এ। নিশ্চয়ই কোনো দুষ্টু ছেলে ফাজলামি করছে। তিনি খিচুড়ির হাঁড়ি চুলা থেকে নামিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। চারদিকে ফকফক চাঁদের আলো। কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। এটা কি স্বপ্ন? স্বপ্ন হওয়া তো সম্ভব না। স্বপ্নে গন্ধ পাওয়া যায় না। তিনি খিচুড়ির গন্ধ পাচ্ছেন। খিচুড়ি ধরে গেছে। সেই ধরা খিচুড়ির পোড়া পোড়া গন্ধ।

ইয়াকুব সাহেব ভূতে বিশ্বাস করেন না, তবু তাঁর গা ছমছম করতে লাগল। এসব কি হচ্ছে? তিনি কাঁপা গলায় বললেন, 'কে? কে কথা বলছিল?'

'জি জনাব, আমি। আপনার পাশেই আছি। অদৃশ্য হয়ে আছি তো, এই জন্যে দেখতে পাচ্ছেন না। বড় আশা করে আপনার কাছে এসেছি, জনাব। অধীনকে নিরাশ করবেন না।'

বাতাসের সঙ্গে কথা বলার কোনো মানে হয় না। তাঁর যা করা উচিত তা হচ্ছে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে খেতে বসা। তবু তিনি নিজের অজান্তেই বলে ফেললেন, 'আমার কাছে কি ব্যাপার?'

'আমার সন্তানটাকে আপনার দরবারে নিয়ে এসেছি জনাব। বড় আশা করে এনেছি।'

'কি জন্যে এনেছেন?'

'ওর স্বাস্থ্যটা খুবই খারাপ। যদি দয়া করে তার শরীরটা ঠিক করে দেন। ব্যায়াম-ট্যায়াম করান। এই বিষয়ে আপনার চেয়ে ভালো তো কেউ জানে না। আপনি হচ্ছেন বিশেষজ্ঞ অতি ওস্তাদলোক।'

ইয়াকুব সাহেব মনে মনে খুশি হলেন। যা ঘটছে তা স্বপ্ন না চোখের ভুল তিনি জানেন না। তবু তো তাকে ব্যায়াম বিষয়ে কিছু ভাল কথা বলছে। এইটাইবা কে বলে?'

'স্যার, একটু দয়া করুন, মা-হারা সন্তান।'

তিনি চমকে উঠলেন। ভূতদেরও মৃত্যু হয়? মানুষ মরে ভূত হয় শুনেছেন, ভূত মরে কি হয়?

ইয়াকুব সাহেব গলা খাঁকাড়ি দিয়ে বললেন, 'এই ছেলের মাতা কি গত হয়েছেন?'

'জি না স্যার, পালিয়ে গেছে। দুর্বল পাতলা ছেলে দেশে মনের দুঃখে দেশান্তরী হয়েছে। ভূত-সমাজে এরকম ছেলে জন্মে দিলে মা'র অপমান। সবাই ছিঃ ছিঃ করে। এখন যদি স্যার আপনি আপনার চরণ কমলে অধীনের সন্তানকে ঠাঁই দেন– মনটা শান্ত হয়। আমি ছেলের মা'র সন্ধানে যেতে পারি। ছেলেকে নিয়ে আপনার কোনো চিন্তা করতে হবে না স্যার। ছেলে নম্র-ভদ্র। আপনার খাটের নিচে শুয়ে থাকবে। ছোটখাটো কাজকর্ম করে দেবে।'

'কি কাজকর্ম করে দেবে?'

'এই ধরুন এক গ্লাস পানি আনা, থালা-বাসন ধোয়া। ভারী কাজ পারবে না স্যার। শরীর দুর্বল।'

'শরীর দুর্বল হলো কেন?'

'খাওয়া-দাওয়া ঠিকমত করে না। না খেলে শরীরে বল হয়? স্যার আপনি বিচক্ষণ ব্যক্তি, আপনি বলুন। এই বিষয়ে আপনার চেয়ে বেশি কে জানে? এই যে রোজ বিকেলে দু'চামচ করে ঘাসের চাটনি খাচ্ছেন, কি জন্যে খাচ্ছেন? শরীর ঠিক রাখার জন্যই তো খাচ্ছেন। জিনিসটা যে খেতে কি খারাপ সে তো খাবার সময় আপনার মুখ দেখেই বুঝতে পারি। ছেলেকে কত বার বলেছি এই লোকটাকে দেখে শেখ– স্বাস্থ্যের জন্য কত কষ্ট করতে হয়।'

ইয়াকুব সাহেব ইতস্তত করে বললেন, 'ভূতদের খাদ্য কি?'

'আমাদের খাদ্য হলো স্যার–আলো। চাঁদের আলো। সূর্যের আলোও খাওয়া যায়-তবে সহজে হজম হয় না। তারার আলো, মোমবাতির আলো– এইগুলো খুব ভালো। খেতে স্বাদ আছে। সহজে হজম হয়। বিশেষ করে মোমবাতির আলো তো খুবই উপকারী। তা স্যার মোমবাতির আলো তো আজকাল পাওয়াই যায় না। সব জায়গায় ইলেকট্রিক বাতি।'

'ইলেকট্রিক বাতির আলো খাওয়া যায় না?'

'আমরা খাই না। কেউ কেউ খায়। একেবারেই টেস্ট নেই। খেলে এল্যার্জির মতো হয়। হাত-পা ফুলে যায়। তবে স্যার জিনিসটার মধ্যে ভাইটামিন আছে।'

ইয়াকুব সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, 'খাওয়া নিয়ে এত বাছবিচার করলে তো চলবে না। সব জিনিস খেতে হবে। এটা খাব ওটা খাব না করলে তো চলবে না।'

'এটা স্যার আপনি বুঝবেন। সন্তান আপনার হাতে তুলে দিয়েছে। যা করলে ভালো হয় করবেন। প্রয়োজনে শাসন করবেন। ওর স্বাস্থ্য ঠিক না হলে আমার আত্মহত্যা ছাড়া পথ থাকবে না। পানিতে ডুবে মরতে হবে। একজন ভূতের কাছে পানিতে ডুবে মৃত্যুর চেয়ে অপমানের মৃত্যু আর কিছুতেই হয় না।'

ইয়াকুব সাহেব ভূতের কথায় খুব আনন্দ পেলেন। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে এই উদ্বেগ যদি মানুষদের মধ্যে থাকত তাহলে কত ভালো হতো। বাচ্চাদের পড়াশোনা নিয়ে বাবা-মা'র যত চিন্তা তার একশ ভাগের এক ভাগ চিন্তাও স্বাস্থ্য নিয়ে নেই। ইংরেজি, অংকের জন্যে প্রাইভেট মাস্টার রাখে অথচ স্বাস্থ্যের জন্যে প্রাইভেট মাস্টার নেই। কি অন্যায়!

'জনাব, যদি অনুমতি দেন তাহলে যাই।'

'যাবেন?'

'আমাকে তুমি করে বলবেন স্যার। আপনি বলে অধমকে লজ্জা দেবেন না।'

ভূতের বিনয়ও তাঁর ভালো লাগল। বিনয় নামক ব্যাপারটা তো দেশ থেকে উঠেই যাচ্ছে। এটাও দুঃখের কথা। তবে পুরো ব্যাপারটা স্বপ্ন কিনা তাও তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। স্বপ্ন হতে পারে, আবার উত্তেজিত মস্তিষ্কের কল্পনাও হতে পারে। ইয়াকুব সাহেব গলা খাঁকাড়ি দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, ছেলেকে রেখে যাও, দেখি কি করতে পারি।'

'স্যার, আপনার অসীম দয়া। মনে বড় শান্তি পেলাম। ছেলেটাকে আরও আগেই আপনার কাছে আনা উচিত ছিল। আগে আনলে স্বাস্থ্যটা ইতোমধ্যে অনেকখানি ভালো হতো। মানুষজনকে ভয় দেখাতে শুরু করতে পারত।'

ইয়াকুব সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, 'ভয় দেখানো মানে?'

'ভূতের প্রধান কাজই তো ভয় দেখানো। আমরা করি কি স্যার সুযোগ পেলেই মানুষকে ভয় দেখাই। তা আমার ছেলে ভয় দেখাবে কি–সে নিজেই ভয়ে অস্থির। কি লজ্জার কথা ভেবে দেখুন। ভূতের ছেলে অথচ ভয় দেখাতে পারছে না। ঐদিন কি হলো শুনুন। রাত দশটার মতো বাজে। ঘুটঘুটে অন্ধকার টুপটাপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আপনাদের স্কুলের হেডস্যার ছাতা মাথায় দিয়ে বাজারে যাচ্ছেন। আমি ছেলেকে বললাম, বাপধন, একটা কাজ কর তো, পেছন থেকে গিয়ে হেডস্যারের ছাতাটা টেনে ধর। দেখ, উনি কেমন ভয় পান। তা ছেলে এই কাজ করবে না। তার সাহস নেই। বুক নাকি ধড়ফড় করে। কি লজ্জার কথা! আমার ছেলের এই হল সাহসের নমুনা।'

'তোমার বুঝি খুব সাহস?'

'নিজের কথা নিজের মুখে বলা ঠিক না, আত্মপ্রশংসা হয়। তবে স্যার আপনাদের দশজনের দোয়ায় হাজার হাজার মানুষকে ভয় দেখিয়েছি। নীলগঞ্জ থানার ওসি সাহেবকে কি আপনার মনে আছে? ইয়া জোয়ান। ভূত-প্রেত কিছুই বিশ্বাস করেন না। অসীম সাহস। এমন ভয় দেখিয়েছি তাঁকে যে একেবারে হার্ট অ্যাটাকের মতো হয়ে গিয়েছিল। ঘটনাটা আপনাকে সংক্ষেপে বলি– ওসি সাহেব রাত একটার সময় দলবল

নিয়ে আসামি ধরতে যাচ্ছেন, সাহসী লোক তো– আগে আগে যাচ্ছেন। আমি করলাম কি, ঠিক তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, 'কেমন আছেন ওসি সাহেব?'

ওসি সাহেব চমকে উঠে বললেন, 'কে, কে? কে কথা বলল?'

আমি তখন তাঁর অন্য কানের কাছে মুখ নিয়ে ছোট বাচ্চাদের মতো আদুরে গলায় বললাম, 'এই খোকাবাবু গু খাবে?'

ওসি সাহেব সঙ্গে সঙ্গে ফিট। সেটা একটা দেখার মতো দৃশ্য। হা হা হা। মনে হলেই আনন্দ হয়।'

ইয়াকুব সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কাজটা কি ঠিক হলো? এটা তো অভদ্রতা। শুধু অভদ্রতা না অসভ্যতাও। আমার কাচে থাকলে তো এসব চলবে না। আচার-ব্যবহারও শিখতে হবে।'

'আপনি যা বলবেন তাই। আপনি দয়াপরবশ হয়ে আপনার চরণ কমলে আমার ছেলেটাকে আশ্রয় দিয়েছেন–এই যথেষ্ট। আপনার হাতে ছেড়ে দিয়েছি। এখন তাহলে স্যার যাই। যাবার আগে একটা কথা নিবেদন করতে চাই স্যার।'

'নিবেদন করো।'

'আমার সন্তানকে চরণে আশ্রয় দিয়েছেন এই জন্যে সামান্য উপহার দিতে চাই।'

'কি উপহার?'

'এক কলসি সোনার মোহর। বাদশাহ জাহাঙ্গীর আমলের। কলসিটা কোথায় পুঁতা আছে আপনাকে দেখিয়ে দেব, আপনি তুলে নেবেন।'

'এইসব লাগবে না। সামান্য কাজের জন্য আমি অর্থ গ্রহণ করি না।'

'আপনি এই কথা বলবেন আমি জানতাম। যাই স্যার।'

আমগাছের ডালে একটা প্রবল ঝাঁকুনি হলো। তারপর চারদিকে নিঃশব্দ। ইয়াকুব সাহেব বললেন, 'কেউ আছে?'

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

'এই যে ভূতের ছেলে, তুমি কি আছ? তোমার নাম তো জানা হলো না?'

কোনো উত্তর নেই। তিনি নিশ্চিত হলেন যে এতক্ষণ যা ঘটেছে সবই কল্পনা। কল্পনা ছাড়া কিছুই না। মাথা গরম হয়েছিল তাই এইসব দেখেছেন।

তিনি ঘরে ঢুকে খেতে বসলেন। তখনই ঘটনাটা ঘটল। তিনি দেখলেন পানি ভর্তি একটা গ্লাস ভাসতে ভাসতে তাঁর দিকে আসছে। তাঁর থালার পাশে এসে গ্লাসটা আপনাআপনি থেমে গেল। সুন্দর করে বসে গেল থালার পাশে। ইয়াকুব সাহেবের গা খানিকটা কেঁপে উঠল। বুক ধকধক করতে লাগল। এই জাতীয় দৃশ্য আগে দেখেন নি। কখনো দেখবেন তাও ভাবেন নি। ভূতের বাচ্চাটা তাহলে যায় নি। আছে। ঘরেই আছে। তিনি চাপা গলায় বললেন, 'তুমি আছ?'

'হুঁ।'

'হুঁ না, বলো জি। এটা হলো ভদ্রতা। ভদ্রতা শিখতে হবে। খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?

'না।'

'এ তো কোনো কাজের কথা না। এখনো জ্যোৎস্না আছে, যাও খেয়ে আসো।'

'ক্ষিদে নেই।'

'ক্ষিদে নেই বললে শুনব না। স্বাস্থ্য রক্ষার প্রধান নিয়ম হলো সময়মত খাওয়া-দাওয়া করা। যাও বললাম, একটা মোড়া নিয়ে উঠানে গিয়ে বসো। আরাম করে চাঁদের আলো খাও। তোমাদের খাওয়ার নিয়ম-কানুন তো আমি ঠিক জানি না। চাঁদের আলো কেমন করে খাও? চিবিয়ে খাও না গিলে ফেলো?'

'সবাই চিবিয়ে খায়। আমি কুঁৎ করে গিলে ফেলি। ভালো লাগে না তো, এই জন্যে।'

'অসম্ভব, এখন থেকে গেলা চলবে না। একগাল করে চাঁদের আলো মুখে নেবে, বত্রিশ বার করে চিবুবে। এতে হজম ভালো হয়। বুঝলে?'

'হুঁ।'

'আবার হুঁ? বলো জি।'

'জি।'

'নাম কি তোমার?'

'ৎৎঘুঁৎ!'

'এই নাম তো উচ্চারণ করা সম্ভব না। তোমার নাম আমি দিলাম গোবর।'

'গোবর?'

'শুনেই আঁৎকে উঠলে। বিখ্যাত কুস্তিগীর গোবার পালোয়ানের নামে তোমার নাম দিলাম। গোবার বাবু ১৯২০ সনে কুস্তিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়ান হয়েছিলেন। বাঙালি ছেলে। ইংল্যান্ড, আমেরিকার সব বাঘা বাঘা কুস্তিগীরকে কুপোকাৎ করেছিলেন। তোমাকেও তাই হতে হবে। তুমি হবে ভূত-সমাজের গোবর বাবু। বুঝলে?'

'গোবর বাবু হতে চাই না।'

'না চাইলেও হতে হবে। তোমাকে আমি গোবর বানিয়ে ছাড়ব। বুঝলে?

'জি।'

'ব্যায়াম শুরু হবে কাল সকাল থেকে। চার্ট করে দেব। রুটিন দেখে দেখে ব্যায়াম হবে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা নিয়েও আমি চিন্তা করব। কোন খাবারটা তোমার সবচে' প্রিয়?'

'জোনাকি পোকার আলো।'

'আচ্ছা, জোনাকি পোকা কয়েকটা ধরে আনার চেষ্টা করব। আর শোনো, খাটের নিচে শোয়ার দরকার নেই। আমার সঙ্গেই ঘুমুবে। খাট বড় আছে, অসুবিধা হবে না। তোমরা কি দাঁত মাজ?'

'অন্যরা মাজে। আমি মাজি না, ভালো লাগে না।'

'তোমাকে দাঁত মাজতে হবে। রাতে ঘুমুতে যাবার আগে একবার, ঘুম থেকে উঠার পর একবার।'

'জি আচ্ছা।'

ইয়াকুব সাহেব রাতে ঘুমুতে গেলেন। ঘুম খুব ভালো হলো না। তাঁর পাশে একটা ভূতের বাচ্চা শুয়ে আছে। তাকে দেখা যাচ্ছে না তবে সে যে আছে তা বোঝা যাচ্ছে। ভূতদের ব্যায়াম কিভাবে করতে হয় তিনি জানেন না। আস্তে আস্তে জানবেন। একটা

বই লেখার চিন্তাও মাথায় ঘুরতে লাগল। বইটার নাম হবে– ভূতদের সহজ ব্যায়াম শিক্ষা।

স্কুল কমিটির বৈঠকে হেড স্যার খুব জোরালো বক্তব্য রাখলেন। বক্তব্যের বিষয়বস্তু হচ্ছে, একজন পাগল শিক্ষককে স্কুলে রাখার কোনো মানে হয় না। সে স্কুলের প্রতি হুমকি স্বরূপ। তাকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য করা উচিত। ইত্যাদি।

স্কুলের সেক্রেটারি আজমল সাহেব বললেন, 'ইয়াকুব স্যারকে তো আমি চিনি। আমার শিক্ষক ছিলেন। অতি ভালো মানুষ। তাকে পাগল বলছেন কেন? কি পাগলামি উনি করেছেন?

'উনি ঘাস খাচ্ছেন।'

'ঘাস খেতে যদি উনার ভালো লাগে, খাবেন। শাকসবজি আমরা খাই না? কাঁচা লেটুস পাতা খাই, কি-খাই না? উনি হয়তো খোঁজ পেয়েছেন যে ঘাসে কোন নতুন ভাইটামিন আছে যা অন্য কিছুতে নেই। এতে পাগলামির কি দেখলেন? তেমন কোনো ভিটামিনের সন্ধান পাওয়া গেলে আমার তো মনে হয় আমাদের সবারই ঘাস খাওয়া উচিত।'

হেডস্যার বললেন, 'ঘাস খাওয়া ছাড়াও সারাক্ষণ ব্যায়াম ব্যায়াম করেন।'

'তা তো করবেনই। তিনি হচ্ছেন ব্যায়ামের শিক্ষক। উনি ব্যায়াম ব্যায়াম করবেন না? যিনি অংকের শিক্ষক তিনি করবেন অংক অংক। যিনি গানের শিক্ষক তিনি গান নিয়ে মাতামাতি করবেন। এ ছাড়া উনি আর কি করেছেন যার থেকে আপনার ধারণা হয়েছে উনি পাগল?'

'এস. এস. সি. পরীক্ষার কোচিং হচ্ছিল, উনি বললেন ব্যায়ামেরও কোচিং দরকার।'

'আমার তো মনে হয় অতি উত্তম কথা বলেছেন। পড়াশোনার প্রচণ্ড চাপের মধ্যে শরীরটা ঠিক রাখতে হবে। রুগ্ণ শরীর পড়াশোনার চাপ সহ্য করতে পারবে না। আপনি উনাকে বলুন ব্যায়ামের কোচিং শুরু করতে।'

হেড স্যার বিমর্ষ গলায় বললেন,

'জি আচ্ছা, বলব।'

'আর শুনুন, চট করে একজনকে পাগল বলবেন না। এটা ঠিক না।'

হেডস্যার শুকনো মুখে বের হয়ে এলেন। তাঁর মেজাজ খুব খারাপ। বাসায় ফিরছেন। বাসা অনেকখানি দূর। মাইল খানিকেরও বেশি। পোস্টাফিসের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন। অন্ধকারে একটা লোক ঝোপের পাশে বসে আছে। হেডস্যার বললেন, 'কে ওখানে? কে?'

'স্যার আমি। আমি ইয়াকুব।'

'ওখানে কি করছেন?'

'জোনাকি পোকা ধরছি স্যার।'

'জোনাকি পোকা ধরছেন কেন?'

ইয়াকুব সাহেব চুপ করে রইলেন। জবাব দিলেন না। খুকখুক করে দু'বার কাশলেন।

‘কি ব্যাপার, জোনাকি পোকা কেন ধরছেন? খাবেন না-কি?’

‘জি স্যার। তবে পোকা খাওয়া হবে না। পোকার আলো খাওয়া হবে।’

‘কে খাবে, আপনি?’

‘জি না, আমার এক ছাত্র।’

‘ও আচ্ছা। আপনার ছাত্র? তা আলোটা কিভাবে খাবে?’

‘গিলে ফেলা যায়, আবার চিবিয়েও খাওয়া যায়। আমি চিবিয়ে খেতে বলেছি। এতে হজমের সুবিধা। মুখে জারক রসের সঙ্গে আলোটা ভালো করে মিশতে পারে।’

‘নাম কি আপনার ছাত্রের?’

‘ওর নাম গোবর।’

হেড স্যার বিস্মিত হয়ে বললেন,

‘গোবর! বাপ-মা নাম রেখেছে গোবর?’

‘জি না, বাপ-মা অন্য নাম রেখেছে। আমি নাম দিয়েছি গোবর।’

‘ভালো করেছেন। খুব ভালো করেছেন। সুন্দর নাম। বিষ্টা হলে আরও ভালো হতো। তা গোবর নামও খারাপ না।’

হেডস্যার আর দাঁড়ালেন না। একজন উন্মাদের সঙ্গে বেশি সময় থাকা ঠিক না। মাথার ঠিক নেই কখন কি করে বসবে। স্কুলের সেক্রেটারিকে এই ঘটনার কথা বলতে হবে। তারপরেও যদি উনি মনে করেন ইয়াকুব সাহেব মানসিকভাবে সুস্থ তাহলে ভিন্ন কথা। হেডস্যার আবার সেক্রেটারি সাহেবের বাসায় ফিরে গেলেন। দেরি করে লাভ নেই। আজই বলা যাক।

সেক্রেটারি সাহেব সব শুনে হাসতে হাসতে বললেন, ‘ইয়াকুব সাহেব আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করেছেন।’

‘ঠাট্টা?’

‘অবশ্যই ঠাট্টা। আপনি উনাকে পাগল ভাবেন, এই জন্যেই পাগলের মতো কথাবার্তা বলে উনি আপনাকে ভড়কে দিয়েছেন। জোনাকি পোকার আলো খাচ্ছে তাঁর ছাত্র– এই সব তো ঠাট্টার কথা, এটও বুঝেন না? আমার কি মনে হয় জানেন? আমার মনে হয়, আপনি এক ধরনের স্নায়বিক উত্তেজনায় ভুগছেন। এই কথা বলায় কিছু মনে করবেন না।’

‘জি না, কিছু মনে করছি না।’

‘আপনি ইয়াকুব সাহেবকে খবর দিয়ে স্কুলে আনুন। উনাকে আগের মতো ক্লাস নিতে দিন। দেখবেন উনি আর ঠাট্টা-তামাশা করছেন না।’

‘জি আচ্ছা।’

হেডস্যার ইয়াকুব সাহেবকে খবর দিয়ে স্কুলে আনলেন। যথারীতি ক্লাস নিতে বললেন। একবার ভাবলেন জোনাকি পোকার আলো খাওয়ার ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করবেন। শেষটায় বাদ দিলেন। দরকার কি ঝামেলায়। বরং দু'একটা সামাজিক ভদ্রতার কথা বলাই ভালো। হেডস্যার বললেন, ‘ইয়াকুব সাহেব, আছেন কেমন?’

‘জি ভালো আছি। তবে খুব ব্যস্ত।’

'ব্যস্ত কেন?'

'ছাত্র একটা আছে, ব্যায়াম শেখাচ্ছি।'

'কোন ছাত্র?' গোবর যার নাম?

'জি। একটা বইও লিখছি।'

'ব্যায়ামের বই?'

'বইয়ের কি নাম?'

'ভূতদের সহজ ব্যায়াম শিক্ষা।'

'কি বললেন– ভূতদের সহজ ব্যায়াম শিক্ষা?'

'জি। আমাদের জীবনে যেমন ব্যায়ামের প্রয়োজন আছে, ভূতদেরও আছে।'

'তা তো বটেই। আপনার ধারণা–এই বই পড়ে ভূতরা সব ব্যায়াম শিখবে?'

'তা শিখবে। ওদের শেখার আগ্রহ খুব বেশি।'

হেডস্যার অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন। একজন বৃদ্ধ উন্মাদের সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলা উচিত না। কি থেকে কি হয়ে যায় কে জানে। হঠাৎ খ্যাঁক করে কামড়ে ধরতে পারে। এদের কাছ থেকে যতটা দূরে থাকা যায় ততই ভালো।

গোবরের ব্যায়াম শিক্ষা পুরোদমে চলছে। ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ, যোগ ব্যায়ম কোনোটাই বাদ যাচ্ছে না। ইয়াকুব সাহেব ঘরে রিং টানিয়ে দিয়েছেন। রিং-এর খেলাও হয়। জানা গেছে গোবর লম্বায় একটু খাটো। রিং টানাটানিতে যদি খানিকটা লম্বা হয়।

খাওয়া-দাওয়ার দিকে তিনি খুব লক্ষ রাখছেন। নানান ধরনের আলোর ব্যবস্থা করেছেন– মোমবাতির আলো, ঘিয়ের প্রদীপের আলো, তিসির তেলের আলো, জোনাকির আলো। টর্চ লাইটের আলো আছে। তবে এই আলো গোবরের সহ্য হয় না। খাওয়া মাত্র বমি হয়ে যায়।

গোবরের স্বাস্থ্য কতটা ভালো হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না। ওজন বাড়ল কি-না ধরতে পারছেন না, কারণ ভূতদের ওজন নেই। হাত-পা মোটা মোটা হলো কি-না তাও বোঝা যাচ্ছে না– কারণ ভূতদের দেখা যায় না।

একদিন সন্ধ্যার কথা। ইয়াকুব সাহেব ভূতদের সহজ ব্যায়াম শিক্ষা বইটার সেকেন্ড চ্যাপ্টার লিখছেন– গোবর এসে তাঁর পা ছুঁয়ে সালাম করে দাঁড়াল। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কি ব্যাপার?'

গোবার ফিসফিস করে বলল, 'আমার স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে স্যার।'

ইয়াকুব সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে কি করে বুঝলে?'

গোবর ক্ষীণ স্বরে বলল, 'এখন মানুষকে ভয় দেখাতে পারি।'

'সে কি! কাকে ভয় দেখালে?'

'হেডস্যারকে।'

ইয়াকুব সাহেব মহাবিরক্ত হয়ে বললেন, 'তাঁকে কিভাবে ভয় দেখিয়েছ?'

গোবর মিনমিন করে বলল, তাঁকে একটা সুপারি গাছের মাথায় বসিয়ে রেখেছি। গাছে বসে তিনি চিৎকার করছেন।

ইয়াকুব সাহেব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। থমথমে গলায় বললেন, 'কখন করলে এই কাজ?'

'কিছুক্ষণ আগে।'

'আর কখনো এই কাজ করবে না। কখনো না। হেড মাস্টার সাহেব বিশিষ্ট ভদ্রলোক। স্কুলঅন্তপ্রাণ। তাঁকে ভয় দেখানো অমার্জনীয় অপরাধ হয়েছে। আমি খুব রাগ করেছি। সেই সঙ্গে ব্যথিত হয়েছি।'

গোবর কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'মানুষদের ভয় দেখাতেই হয়। এটা ভূতদের নিয়ম।'

'ভয় যদি দেখাতেই হয় দুষ্টু লোকদের ভয় দেখাবে। ধরো, ডাকাত এসেছে গ্রামে, ডাকাতদের ভয় দেখাও। চোর এসেছে, চোরদের ভয় দেখাও। দেশে দুষ্টু মানুষের তো অভাব নেই।'

'আর করব না স্যার।'

'শুধু স্বাস্থ্য ভালো করলে তো চলবে না। স্বাস্থ্যের সঙ্গে ন্যায়-নীতি শিখতে হবে। আদব-কায়দা শিখতে হবে। আমি তো ঠিক করেছি হেডস্যারকে বলে তোমাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেব। আজ যা কাণ্ড করেছ তাতে হেডস্যার রাজি হবেন কিনা কে জানে। দুষ্টু ছাত্র হেডস্যারের চোখের বিষ। তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে, বুঝলে?'

'জি স্যার, বুঝেছি।'

'কোন্ গাছে হেডস্যারকে বসিয়ে রেখেছ? চলো যাই উনাকে নামিয়ে নিয়ে আসি। একা একা নামতে পারবে না। সুপারি গাছ থেকে নামা কঠিন ব্যাপার।'

স্কুল সেক্রেটারির বাসার ঠিক সামনের সুপারি গাছের মাথায় হেডস্যার বসে আছেন। কিছুক্ষণ পরপর চিৎকার করছেন– 'বাঁচাও, বাঁচাও।'

সেক্রেটারি সাহেব দৌড়ে বাড়ি থেকে বের হলেন। অবাক হয়ে বললেন, 'গাছে কে?'

'আমি নীলগঞ্জ হাইস্কুলের হেডমাস্টার।'

'গাছে বসে কি করছেন?'

'কিছু করছি না, শুধু বসে আছি।'

'গাছে উঠলেন কিভাবে?'

'জানি না।'

'জানি না মানে? গাছে উঠেছেন, তারপর বলছেন জানেন না কিভাবে উঠেছেন?'

'রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি গাছে বসে আছি।'

'নেমে আসুন। আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'নামতে পারছি না। কি করে নামতে হয় জানি না।'

'আপনার যে মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে বুঝতে পারছেন?'

'পারছি।'

'আপনি শিক্ষক হিসেবে খুবই ভালো। কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন বিকৃতমস্তিষ্ক শিক্ষক রাখা সম্ভব না।'

'বুঝতে পারছি। আমি রেজিগনেশন লেটার দিয়ে কাল সকালে দেশে চলে যাব। দয়া করে আমাকে গাছ থেকে নামানোর ব্যবস্থা করুন।'

কথাবার্তার এই পর্যায়ে ইয়াকুব সাহেব এসে পড়লেন।

ততক্ষণে আরও বহু লোক জড়ো হয়েছে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা চলে এসেছে।

বেজায় হৈচৈ।

ইয়াকুব সাহেব বললেন, 'আমার ছাত্র গোবরের কারণে এই লজ্জাজনক ঘটনা ঘটেছে। সে তার জন্যে সকলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। এক্ষুনি সে হেডস্যারকে গাছ থেকে নামাবে।'

সবাই হতভম্ব হয়ে দেখল হেডস্যার পাখির পালকের মতো খুব ধীরে ভাসতে ভাসতে নিচে নেমে আসছেন। সেক্রেটারি সাহেব এই দৃশ্য সহ্য করতে পারলেন না। মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন।

এমন অস্বাভাবিক ঘটনা কিভাবে ঘটছে কেউ কিছু বুঝতে পারল না। ব্যাপারটা বুঝতে ইয়াকুব সাহেবের সপ্তাহখানেক সময় লাগল। একটা ভূতের বাচ্চা তাঁর সঙ্গে বাস করছে এবং ব্যায়াম শিখছে এটা চট করে বিশ্বাস করার কথাও না আবার কাণ্ডকারখানা চোখের সামনে ঘটতে দেখা যাচ্ছে। শুরুতে গোবরকে সবাই ভয়ে ভয়ে দেখত–শেষে অভ্যস্ত হয়ে গেল। এক রবিবার সকালে ইয়াকুব সাহেব তাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন।

পড়াশোনায় গোবর তেমন ভাল ছিল না, তবে ম্যাট্রিক এক চান্সেই পাস করল। যদিও পরীক্ষার সময় বেশ সমস্যা হয়েছিল। ইনভিজিলেটর এসে দেখেন একজন পরীক্ষার্থীর খাতায় আপনা-আপনি কলম দিয়ে লেখা হচ্ছে কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তিনি কিছুক্ষণ দৃশ্যটি দেখলেন, তার পরেই মাথা ঘুরে নিচে পড়ে গেলেন। মাথায় পানি ঢেলে তাঁকে সুস্থ করা হলো। ধারণা করা হয়েছিল বিষয়টা নিয়ে তিনি খুব হৈচৈ করবেন। তা করলেন না। কোনো প্রশ্নও করলেন না।

গোবরের খুব শখ ছিল কলেজে পড়বে। হেডমাস্টার সাহেব চেষ্টাও করেছিলেন। নিজে সঙ্গে গিয়ে অনেক কলেজে ঘোরাঘুরি করেছেন। সব কলেজের প্রিন্সিপালরা যেই শুনেছেন তিনি একটা ভূতকে কলেজে ভর্তি করাতে চান ওম্নি হেডমাস্টার সাহেবকে বের করে দিয়েছেন। তাঁর কোনো কথাই শুনতে চান নি। গোবর মনে খুব কষ্ট পেল। মনের কষ্ট আরও বাড়ল যখন ইয়াকুব সাহেব মারা গেলেন। তিনদিনের জ্বরে হঠাৎ মৃত্যু। চিকিৎসা করার সুযোগও ছিল না। ইয়াকুব সাহেবের মৃত্যুর পর গোবর বেচারা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল। দিনরাত আমগাছে পা ঝুলিয়ে বসে থাকত। তার বাবা-মা'র সঙ্গেও গোবরের বনে নি। তাঁরা ফিরে এসেছিলেন– গোবরের ম্যাট্রিক পাস করা নিয়ে অসম্ভব বিরক্ত হলেন। 'তুই ভূত সমাজের কলংক'–এই বলে তাঁরা অনেক দূরে কোথাও চলে গেলেন।

নীলগঞ্জের মানুষজন গোবরের কারণে খুব সুখে দিন কাটাত। চোর-ডাকাতের কোনো উপদ্রব ছিল না। নীলগঞ্জ থানার বড় দারোগা সাহেবের কাজের অভাবে কোমরে বাত হয়ে গেল। একবার চেয়ারে বসলে উঠতে পারেন না। উঠলে বসতে পারেন না

এমন অবস্থা। চোর-ডাকাত ভুলেও নীলগঞ্জে আসে না। হঠাৎ একজন মনের ভুলে চলে আসে। গোবর তখন তাকে ধরে খুব উঁচু কোনো সুপারি গাছে বসিয়ে ওসি সাহেবকে খবর দেয়। ওসি সাহেব বিরস মুখে বলেন, 'কে, গোবর?'

'জি।'

'আবার ধরেছিস?'

'জি।'

'সুপারি গাছের মাথায় রেখে দিয়েছিস?'

'জি।'

'এই কাণ্ডটা তুই কেন করিস বল তো? বর্ষার দিন, স্লিপ কেটে যদি সুপারি গাছ থেকে পড়ে কোমর ভাঙে তাহলে তো তুই বিপদে পড়বি। তিনশ' দুই ধারায় কেইস হয়ে যাবে। তোকে কোমরে দড়ি বেঁধে কোর্টে চালান করতে হবে। আইনের চোখে ভূত-প্রেত সব সমান বুঝলি?'

'আর করব না স্যার।'

ওসি সাহেব মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলেন, 'তুই বড় যন্ত্রণা করিস। তোকে স্নেহ করি বলে কিছু বলি না। এখন না বলে পারছি না। সাবধান হয়ে যা।'

গোবর এখনো বেঁচে আছে। তবে বুড়ো হয়ে গেছে। আগের মতো শক্তি-সামর্থ্য নেই। আমগাছে বসে দিনরাত ঝিমায়। মাঝেমাঝে আফসোসের সঙ্গে বলে– এই যুগের পড়াশোনার মান খুব নিচে নেমে গেছে। সামান্য সমাস তাও পারে না। রসগোল্লার ব্যাসবাক্য কি– 'রসের গোল্লা' না 'রসে ডুবানো গোল্লা' তাও জানে না। বড়ই পরিতাপের বিষয়। বড়ই আফসোস। সামান্য একটা দরখাস্ত সেটাও ইংরেজিতে লিখতে পারে না। আফসোস। বড়ই আফসোস।

আমের সময় ছোট ছোট বাচ্চারা গাছের নিচে ভিড় করে। তারা খুব ঘ্যানঘ্যান করে– 'গোবর চাচা, গোবর চাচা, আম পেড়ে দাও না।'

গোবর প্রচণ্ড ধমক দেয়– 'ভাগ, ঘুমের সময় বিরক্ত করিস না। মারব থাপ্পড়।'

বাচ্চারা তারপরেও বিরক্ত করে, তারা জানে গোবর চাচা কখনো তাদের থাপ্পড় মারবে না। এক সময় আম পেড়ে দেবে। কারণ গোবর চাচা তো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভূত।

আয়না

সকাল সাড়ে সাতটা। শওকত সাহেব বারান্দায় উবু হয়ে বসে আছেন। তাঁর সামনে একটা মোড়া, মোড়ায় পানি ভর্তি একটা মগ। পানির মগে হেলান দেয়া ছোট্ট একটা আয়না। আয়নাটার স্ট্যান্ড ভেঙে গেছে বলে কিছু একটাতে ঠেকা না দিয়ে তাকে দাঁড়া করানো যায় না। শওকত সাহেব মুখ ভর্তি ফেনা নিয়ে আয়নাটার দিকে তাকিয়ে আছেন। দাড়ি শেভ করবেন। পঁয়তাল্লিশ বছরের পর মুখের দাড়ি শক্ত হয়ে যায়। ইচ্ছা করলেই রেজারের একটানে দাড়ি কাটান যায় না। মুখে সাবান মেখে অপেক্ষা করতে হয়। এক সময় দাড়ি নরম হবে, তখন কাটতে সুবিধা।

দাড়ি নরম হয়েছে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হবার পর শওকত সাহেব রেজার দিয়ে একটা টান দিতেই তাঁর গাল কেটে গেল। রগ-টগ মনে হয় কেটেছে, গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে। শওকত সাহেব এক হাতে গাল চেপে বসে আছেন। কিছুক্ষণ চেপে ধরে থাকলে রক্ত পড়া বন্ধ হবে। ঘরে স্যাভলন-ট্যাভলন কিছু আছে কি-না কে জানে। কাউকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করছে না। সকালবেলার সময়টা হলো ব্যস্ততার সময়। সবাই কাজ নিয়ে থাকে। কি দরকার বিরক্ত করে?

এই এক মাসে চার বার গাল কাটল। আয়নাটাই সমস্যা করছে। পুরানো আয়না, পারা নষ্ট হয়ে গেছে। কিছুই পরিষ্কার দেখা যায় না। একটা ছোট আয়না কেনার কথা তিনি তাঁর স্ত্রী মনোয়ারাকে কয়েকবার বলেছেন। মনোয়ারা এখনো কিনে উঠতে পারে নি। তার বোধহয় মনে থাকে না, মনে থাকার কথাও না। আয়নাটা শওকত সাহেব একাই ব্যবহার করেন। বাসার সবাই ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়না ব্যবহার করে। কাজেই হাত আয়নাটার যে পারা উঠে গেছে মনোয়ারার তা জানার কথা না। আর জানলেও কি সব সময় সব কথা মনে থাকে?

শওকত সাহেব নিজেই কতবার ভেবেছেন অফিস থেকে ফেরার পথে একটা আয়না কিনে নেবেন। অফিস থেকে তো রোজই ফিরছেন, কই, আয়না তো কেনা হচ্ছে না। আয়না কেনার কথা মনেই পড়েছ না। মনে পড়ে শুধু দাড়ি শেভ করার সময়।

শোবার ঘর থেকে শওকত সাহেবের বড় মেয়ে ইরা বের হলো। সে এ বছর ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেছে। সে জন্যেই সব সময় এক ধরনের ব্যস্ততার মধ্যে থাকে।

শওকত সাহেব বললেন, 'মা, ঘরে স্যাভলন আছে?'

ইরা বলল, 'জানি না বাবা।'

সে যে রকম ব্যস্তভাবে বারান্দায় এসেছিল সে রকম ব্যস্ত ভঙ্গিতেই আবার ঘরে ঢুকে গেল। বাবার দিকে ভালোমত তাকালোও না। তার এত সময় নেই।

রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে কি-না এটা দেখার জন্যে শওকত সাহেব গাল থেকে হাত সরিয়ে আয়নার দিকে তাকালেন। আশ্চর্য কাণ্ড! আয়নাতে দেখা যাচ্ছে ছোট একটা মেয়ে বসে আছে। আগ্রহ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটার গায়ে লাল ফুল আঁকা সুতির একটা ফ্রক। খালি পা। মাথার চুল বেণী করা। দু'দিকে দুটা বেণী ঝুলছে। দুটা বেণীতে দু'রঙের ফিতা। একটা লাল একটা সাদা। মেয়েটার মুখ গোল, চোখ দুটা বিষণ্ন। মেয়েটা কে?

শওকত সাহেব ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দিকে তাকালেন। তাঁর ধারণা হলো, হয়তো টুকটাক কাজের জন্যে বাচ্চা একটা কাজের মেয়ে রাখা হয়েছে। সে বারান্দায় তাঁর পেছনে বসে আছে তিনি এতক্ষণ লক্ষ করেননি।

বারান্দায় তাঁর পেছনে কেউ নেই। পুরো বারান্দা ফাঁকা। তাহলে আয়নায় মেয়েটা এলো কোত্থেকে? শওকত সাহেব আবার আয়নার দিকে তাকালেন। ঐ তো মেয়েটা বসে আছে, তার রোগা রোগা ফর্সা পা দেখা যাচ্ছে। পিটপিট করে তাকাচ্ছে তাঁর দিকে। ব্যাপারটা কি?

মেয়েটা একটু যেন ঝুঁকে এলো। শওকত সাহেবকে অবাক করে দিয়ে মিষ্টি গলায় বলল, 'আপনার গাল কেটে গেছে। রক্ত পড়ছে।'

শওকত সাহেব আবার ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দিকে তাকালেন। না, কেউ নেই। তাঁর কি মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে? একমাত্র পাগলরাই উদ্ভট এবং বিচিত্র ব্যাপার-ট্যাপার দেখতে পায়। এই বয়সে পাগল হয়ে গেলে তো সমস্যা। চাকরি চলে যাবে। সংসার চলবে কিভাবে? শওকত সাহেব আয়নার দিকে তাকালেন না। আয়না হাতে ঘরে ঢুকে গেলেন। নিজের শোবার ঘরের টেবিলে আয়নাটা উল্টো করে রেখে দিলেন। একবার ভাবলেন, ঘটনাটা তাঁর স্ত্রীকে বলবেন, তারপরই মনে হলো– কি দরকার! সবকিছুই সবাইকে বলে বেড়াতে হবে, তা তো না। তা ছাড়া তিনি খুবই স্বল্পভাষী, কারো সঙ্গেই তাঁর কথা বলতে ভালো লাগে না। অফিসে যতক্ষণ থাকেন নিজের মনে থাকতে চেষ্টা করেন। সেটা সম্ভব হয় না। অকারেণ নানান কথা বলতে হয়। যত না কাজের কথা– তারচে' বেশি অকাজের কথা। অফিসের লোকজন অকাজের কথা বলতেই বেশি পছন্দ করে।

শওকত সাহেব ইস্টার্ন কমার্শিয়াল ব্যাংকের ক্যাশিয়ার। ক্যাশের হিসাব ঠিক রাখা, দিনের শেষে জমা-খরচ হিসাব মেলানোর কাজটা অত্যন্ত জটিল। এই জটিল কাজটা করতে গেলে মাথা খুব ঠাণ্ডা থাকা দরকার। অকারণে রাজ্যের কথা বললে মাথা ঠাণ্ডা থাকে না। কেউ সেটা বোঝে না। সবাই প্রয়োজন না থাকলেও তাঁর সঙ্গে কিছু খাজুরে আলাপ করবেই।

'কি শওকত সাহেব, মুখটা এমন শুকনা কেন? ভাবীর সঙ্গে ফাইট চলছে নাকি!'

'আজকের শার্টটা তো ভালো পরেছেন। বয়স মনে হচ্ছে দশ বছর কমে গেছে। রঙে আছেন দেখি।'

'শওকত ভাই, দেখি চা খাওয়ান। আপনার স্বভাব কাউটা ধরনের হয়ে গেছে। চা-টা কিছুই খাওয়ান না। আজ ছাড়াছাড়ি নাই।'

এইসব অকারণ অর্থহীন কথা শুনতে শুনতে শওকত সাহেব ব্যাংকের হিসাব মেলান। মাঝে মাঝে হিসাবে গণ্ডগোল হয়ে যায়। তাঁর প্রচণ্ড রাগ লাগে। পুরো হিসাব আবার গোড়া থেকে করতে হয়। মনের রাগ তিনি প্রকাশ করেন না। রাগ চাপা রেখে মুখ হাসি-হাসি করে রাখার ক্ষমতা তাঁর আছে। মনের রাগ চেপে রেখে অপেক্ষা করেন কখন সামনে বসে থাকা মানুষটা বিদেয় হবে, তিনি তাঁর হিসাব আবার গোড়া থেকে করতে শুরু করবেন। খুবই সমস্যার ব্যাপার। তবে মাসখানিক হলো শওকত সাহেব আরও বড় ধরনের সমস্যায় পড়েছেন। ব্যাংকে কম্পিউটার চলে এসেছে। এখন থেকে হিসাবপত্র সব হবে কম্পিউটারে। চেংড়া একটা ছেলে, নাম সাজেদুল করিম, সবাইকে কম্পিউটার ব্যবহার করা শেখাচ্ছে। সবাই শিখে গেছে, শওকত সাহেব কিছু শিখতে পারেন নি।

যন্ত্রপাতির ব্যাপার তাঁর কাছে সবসময়ই অতি জটিল মনে হয়। সামান্য ক্যালকুলেটারও তিনি কখনো ঠিকমত ব্যবহার করতে পারেন না। একটা বেড়াছেড়া হয়ে যায়ই। তাছাড়া যন্ত্রের উপর তাঁর বিশ্বাস নেই। তিনি যত দায়িত্বের সঙ্গে একটা যোগ করবেন যন্ত্র কি তা করবে? কেনইবা করবে? ভুল-ভ্রান্তি করলে বড় সাহেবদের গালি খাবেন, তাঁর চাকরি চলে যাবে। যন্ত্রের তো সেই সমস্যা নেই। যন্ত্রকে কেউ গালিও দেবে না বা তার চাকরিও চলে যাবে না। তারপরও কেন মানুষ এত যন্ত্র-যন্ত্র করে? কম্পিউটার তাঁর কাছে অসহ্য লাগছে। অনেকটা টেলিভিশনের মতো একটা জিনিস। হিসাব-নিকাশ সব পর্দায় উঠে আসছে। এম্নিতেই টেলিভিশন তাঁর ভালো লাগে না। বাসায় তিনি কখনো টিভি দেখেন না। যে যেটা অপছন্দ করে তার কপালে সেটাই জোটে, এটা বোধহয় সত্যি। তিনি টিভি পছন্দ করেন না। এখন টিভির মতো একটা জিনিস সবসময় তাঁর টেবিলে থাকবে। অফিসে যতক্ষণ থাকবেন তাঁকে থাকতে হবে টিভির পর্দার দিকে। যে পর্দায় গান-বাজনা হবে না, শুধু হিসাব-নিকাশ হবে। কোনোমানে হয়?

অফিস শুরু হয় ন'টার সময়। শওকত সাহেব ন'টা বাজার ঠিক দশ মিনিট আগেই অফিসে ঢোকেন। তাঁর টেবিলে পিরিচে ঢাকা এক গ্লাস পানি থাকে। তিনি পানিটা খান। তারপর তিনবার কুলহু আল্লা পড়ে কাজকর্ম শুরু করেন। এটা তাঁর নিত্যদিনকার রুটিন। আজ অফিসে এসে দেখেন কম্পিউটারের চেংড়া ছেলেটা, সাজেদুল করিম, তাঁর টেবিলের সামনের চেয়ার বসে ভুরু কুঁচকে সিগারেট টানছে। পিরিচে ঢাকা পানির গ্লাসটা খালি। সাজেদুল করিম খেয়ে ফলেছে নিশ্চয়ই। সাজেদুল করিম শওকত সাহেবকে দেখে উঠে দাঁড়াল। হাসিমুখে বলল, 'স্যার, কেমন আছেন?'

'ভালো আছি।'

'আজ আপনার জন্যে সকাল সকাল চলে এসেছি।'

'ও, আচ্ছা।'

'জি এম সাহেব খুব রাগারাগি করছিলেন– আপনাকে কম্পিউটার শেখাতে পারছি না। আজ ঠিক করেছি সারাদিন আপনার সঙ্গেই থাকব।'

শওকত সাহেব শুকনো মুখে বললেন, 'আচ্ছা।'

'আমরা চা খাই, চা খেয়ে শুরু করি। কি বলেন স্যার?'

শওকত সাহেব কিছু বললেন না। বেল টিপে বেয়ারাকে চা দিতে বললেন। সাজেদুল করিম হাসি-হাসি মুখে বলল, 'গতকাল যা যা বলেছিলাম সে সব কি স্যার আপনার মনে আছে?'

শওকত সাহেবের কিছুই মনে নেই, তবু তিনি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

'একটা ছোটখাটো ভাইবা হয়ে যাক। স্যার বলুন দেখি, 'মেগাবাইট ব্যাপারটা কি?'

'মনে নাই।'

'র‍্যাম কি সেটা মনে আছে?'

'না।'

'মনে না থাকলে নাই। এটা এমন কিছু জরুরি ব্যাপার না। ম্যাগাবাইট, র‍্যাম সবই হচ্ছে কম্পিউটারের মেমরির একটা হিসাব। একেক জন মানুষের যেমন একেক রকম স্মৃতিশক্তি থাকে, কম্পিউটারেরও তাই। কিছু কিছু কম্পিউটায়ের স্মৃতিশক্তি থাকে অসাধারণ, আবার কিছু কম্পিউটারের স্মৃতিশক্তি সাধারণ মানের। মেগাবাইট হচ্ছে স্মৃতিশক্তির একটা হিসাব। মেগা হলো টেন টু দ্যা পাওয়ার সিক্স আর বাইট হলো টেন টু দ্যা পাওয়ার সিক্স ভাগের এক ভাগ। র‍্যাম হচ্ছে র‍্যানডম একসেস মেমরি। স্যার, বুঝতে পারছেন?'

শওকত সাহেব কিছুই বোঝেন নি। তারপরেও বললেন, 'বুঝতে পারছি।'

'একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন– কম্পিউটার হলো আয়নার মতো।'

'আয়নার মতো?'

'হ্যাঁ স্যার, আয়নার মতো। আয়নাতে যেমন হয়– আয়নার সামনে যা থাকে তাই আয়নাতে দেখা যায়, কম্পিউটারেও তাই। কম্পিউটারকে আপনি যা দেবেন সে তাই আপনাকে দেখাবে। নিজে থেকে বানিয়ে সে আপানাকে কিছু দেবে না। তার সেই ক্ষমতা নেই। বুঝতে পারছেন?'

'হ্যাঁ।'

'স্যার, এখন আসুন মেমরি এবং হার্ড ডিস্ক এই দুয়ের ভেতরে পার্থক্যটা আপনাকে বুঝিয়ে বলি। আমার কথা মন দিয়ে শুনছেন তো?'

'হ্যাঁ।' শওকত সাহেব আসলে মন দিয়ে কিছুই শুনছেন না। আয়নার কথায় তাঁর নিজের আয়নাটার কথা মনে পড়ে গেছে। ব্যাপারটা কি? আয়নার ভেতরে ছোট মেয়েটা এলো কিভাবে? মেয়েটা কে? তার নাম কি? চোখ পিটপিট করে তাঁর দিকে তাকাচ্ছিল।

বেয়ারা চা নিয়ে এসেছে।

শওকত সাহেব চায়ের কাপে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে চুমুক দিচ্ছেন। সাজেদুল করিম বলল, 'স্যার!'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি কোনো কিছু নিয়ে চিন্তিত?'

'না তো।'

'তাহলে আসুন কম্পিউটারের ফাইল কিভাবে খুলতে হয় আপনাকে বলি। শুধু মুখে বললে হবে না। হাতে-কলমে দেখাতে হবে। হার্ড ডিস্ক হলো আমাদের ফাইলিং ক্যাবিনেট। সব ফাইল আছে হার্ড ডিস্কে। সেখান থেকে একটা বিশেষ ফাইল কিভাবে বের করব?...'

বিকেল চারটা পর্যন্ত শওকত সাহেব কম্পিউটার নিয়ে ঘটঘট করলেন। লাভের মধ্যে লাভ হলো–তাঁর মাথা ধরে গেল। প্রচণ্ড মাথাধরা। সাজেদুল করিমকে মাথা ধরার ব্যাপারটা জানতে দিলেন না। বেচারা এত আগ্রহ করে বোঝাচ্ছে। তার ভাবভঙ্গি থেকে মনে হচ্ছে কম্পিউটারের মতো সহজ কিছু পৃথিবীতে তৈরি হয় নি।

'স্যার, আজ এই পর্যন্ত থাক। কাল আবার নতুন করে শুরু করব।'

'আচ্ছা।'

অফিস থেকে বেরুবার আগে জিএম সাহেব শওকত সাহেবকে ডেকে পাঠালেন। শওকত সাহেবের বুক কেঁপে উঠল। জিএম সাহেবকে তিনি কম্পিউটারের মতোই ভয় পান। যদিও ভদ্রলোক অত্যন্ত মিষ্টভাষী। হাসিমুখ ছাড়া কথাই বলতে পারেন না। জিএম সাহেবের ঘরে ঢুকতেই তিনি হাসিমুখে বললেন, 'কেমন আছেন শওকত সাহেব?'

'জি স্যার, ভালো।'

'বসুন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

শওকত সাহেব বসলেন। তাঁর বুক কাঁপছে, পানির পিপাসা পেয়ে গেছে।

'আপনার কি শরীর খারাপ?'

'জি না স্যার।'

'দেখে অবশ্যি মনে হচ্ছে শরীর খারাপ। যাই হোক, কম্পিউটার শেখার কতদূর হলো?'

শওকত সাহেব কিছু বললেন না। মাথা নিচু করে বসে রইলেন। জিএম সাহেব বললেন, 'আমি সাজেদুল করিমকে গতকাল কঠিন বকা দিয়েছি। তাকে বলেছি– তুমি কেমন ছেলে, সামান্য একটা জিনিস শওকত সাহেবকে শেখাতে পারছ না?'

'তার দোষ নেই স্যার। সে চেষ্টার ত্রুটি করছে না। আসলে আমি শিখতে পারছি না।'

'পারছেন না কেন?'

'বুঝতে পারছি না স্যার।'

'কম্পিউটার তো আজ ছেলেখেলা। সাত-আট বছরের বাচ্চারা কম্পিউটার দিয়ে খেলা খেলছে। আপনি পারবেন না কেন? আপনাকে তো পারতেই হবে। পুরানো দিনের মতো কাগজে-কলমে বসে বসে হিসাব করবেন আর মুখে বিড়বিড় করবেন– হাতে আছে পাঁচ, তা তো হবে না। আমাদের যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। যা হবে সব কম্পিউটারে হবে।'

'জি স্যার।'

'নতুন টেকনোলজি যারা নিতে পারবে না তাদের তো আমাদের প্রয়োজন নেই। ডারউইনের সেই থিয়োরি– সারভাইব্‌ল্‌ ফর দি ফিটেস্ট। বুঝতে পারছেন?'

'জি স্যার।'

'আচ্ছা আজ যান। চেষ্টা করুন ব্যাপারটা শিখে নিতে। এটা এমন কিছু না। আপনার নিজের ভেতরও শেখার চেষ্টা থাকতে হবে। আপনি যদি ধরেই নেন কোনোদিন শিখতে পারব না, তাহলে তো কোনোদিনই শিখতে পারবেন না। ঠিক না?'

'জি স্যার, ঠিক।'

'আচ্ছা, আজ তাহলে যান।'

'বেরুবার সময় তিনি দরজায় ধাক্কা খেলেন। ডান চোখের উপর কপাল সুপুরির মতো ফুলে উঠল। মাথাধরাটা আরও বাড়ল।

শওকত সাহেব মাথাধরা নিয়েই বাসায় ফিরলেন। বাসা খালি, শুধু কাজের বুয়া আছে। বাকি সবাই নাকি বিয়ে বাড়িতে গেছে। ফিরতে রাত হবে। আবার না ফেরার সম্ভাবনাও আছে। কার বিয়ে শওকত সাহেব কিছুই জানেন না। তাকে কেউ কিছু বলে নি। বলার প্রয়োজন মনে করেনি। তিনি হাত-মুখ ধুয়ে বারান্দায় ইজিচেয়ারে চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন। এতে যদি মাথাধরাটা কমে। ইদানীং তাঁর ঘন ঘন মাথা ধরছে। চোখ আরও খারাপ করেছে কি-না কে জানে। চোখের ডাক্তারের কাছে একবার গেলে হয়। যেতে ইচ্ছা করছে না। ডাক্তারের কাছে যাওয়া মানেই টাকার খেলা। ডাক্তারের ভিজিট, নতুন চশমা, নতুন ফ্রেম।

কাজের বুয়া তাঁকে নাশতা দিয়ে গেল। একটা পিরিচে কয়েক টুকরা পেঁপে, আধবাটি মুড়ি এবং সরপড়া চা। পেঁপেটা খেতে তিতা তিতা লাগল। মুড়ি মিইয়ে গেছে। দাঁতের চাপে রবারের মতো চেপ্টা হয়ে যাচ্ছে। তাঁর প্রচণ্ড খিদে লেগেছিল।

তিনি তিতা পেঁপে এবং মিয়ানো মুড়ি সবটা খেয়ে ফেললেন। চা খেলেন। গরম চা খেলে মাথাধরাটা কমবে ভেবেছিলেন। কমল না। কারণ চা গরম ছিল না। এই কাজের বুয়া গরম চা বানানোর কায়দা জানে না। তার চা সবসময় হয় কুসুম-গরম।

শওকত সাহেব মাথাধরার ট্যাবলেটের খোঁজে শোবার ঘরে ঢুকলেন। টেবিলের ড্রয়ারে প্যারাসিটামল ট্যাবলেট থাকার কথা। কিছুই পাওয়া গেল না। ড্রয়ারের ভেতর হাত-আয়নাটা ঢুকানো। মনোয়ারা নিশ্চয়ই রেখে দিয়েছে। আচ্ছা, আয়নার ভেতর মেয়েটা কি এখনো আছে? শওকত সাহেব আয়না হাতে নিলেন। অস্বস্তি নিয়ে

তাকালেন। আশ্চর্য! মেয়েটা তো আছে। আগেরবার বসেছিল, এখন দাঁড়িয়ে আছে। আগের ফ্রকটাই গায়ে। মেয়েটা খুব সুন্দর তো। গোল মুখ, মায়া-মায়া চেহারা। বয়স কত হবে? এগারো-বারোর বেশি না। কমও হতে পারে। মেয়েটার গলায় নীল পুঁতির মালা। মালাটা আগে লক্ষ করেননি। শওকত সাহেব নিচু গলায় বললেন, 'তোমার নাম কি?'

মেয়েটা মিষ্টি গলায় বলল, 'চিত্রলেখা।'

'বাহ, সুন্দর নাম!'

মেয়েটা লাজুক ভঙ্গিতে হাসল। শওকত সাহেব আর কি বলবেন ভেবে পেলেন না। মেয়েটাকে আর কি বলা যায়? আয়নার ভেতর সে এলো কি করে এটা কি জিজ্ঞেস করবেন? প্রশ্নটা মেয়েটার জন্যে জটিল হয়ে যাবে না তো? জটিল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। তিনি কিছু জিজ্ঞেস করার আগে মেয়েটা বলল, 'আপনার কপালে কি হয়েছে?'

'ব্যথা পেয়েছি। জিএম সাহেবের ঘর থেকে বের হবার সময় দরজায় ধাক্কা খেলাম।'

'খুব বেশি ব্যথা পেয়েছেন?'

'খুব বেশি না। তুমি কোন ক্লাসে পড়?'

'আমি পড়ি না।'

'স্কুলে যাও না?'

'উহুঁ।'

'আয়নার ভেতর তুমি এলে কি করে?'

'তাও জানি না।'

'তোমার বাবা-মা, তারা কোথায়?'

'জানি না'

'তুমি কি একা থাকো?'

'হুঁ।'

শওকত সাহেব লক্ষ করলেন মেয়েটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। বুকের উপর দুটা হাত আড়াআড়ি করে রাখা। মনে হয় তার শীত লাগছে। অথচ এটা চৈত্র মাস। শীত লাগার কোনো কারণ নেই। তিনি নিজে গরমে সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে, তার বাতাসটা পর্যন্ত গরম।

'কাঁপছ কেন? শীত লাগছে নাকি?'

'হুঁ, এখানে খুব শীত।'

'তোমার কি গরম কাপড় নেই?'

'না।'

'তোমার এই একটাই জামা?'

'হুঁ।'

'আমাকে তুমি চেনো?'

'চিনি।'

'আমি কে বলো তো?'

'তা বলতে পারি না।'

'আমার নাম জান?'

'আপনি তো আপনার নাম বলেন নি। জানব কিভাবে?'

'আমার নাম শওকত। শওকত আলি।'

'ও আচ্ছা।

'আমার তিন মেয়ে।'

'ছেলে নাই?'

'না, ছেলে নাই।'

'আপনার মেয়েরা কোথায় গেছে?'

'বিয়ে বাড়িতে গেছে।'

'কার বিয়ে?'

'কার বিয়ে আমি ঠিক জানি না। আমাকে বলে নি।'

'আপনার মেয়েদের নাম কি?'

'বড় মেয়ের নাম ইরা, মেজটার নাম সোমা, সবচে' ছোটটার নাম কল্পনা।'

'ওদের নামে কোনো মিল নেই কেন? সবাই তো মিল দিয়ে দিয়ে মেয়েদের নাম রাখে। বড় মেয়ের ইরা হলে মেজটার নাম হয় মীরা, ছোটটার নাম হয় নীরা...'

'ওদের মা নাম রেখেছে। মিল দিতে ভুলে গেছে।'

'আপনি নাম রাখেন নি কেন?'

'আমিও রেখেছিলাম। আমার নাম কারো পছন্দ হয় নি।'

'আপনি কি নাম রেখেছিলেন?'

'বড় মেয়ের নাম রেখিছিলাম বেগম রোকেয়া। মহিয়সী নারীর নামে নাম। তার মা পছন্দ করে নি। তার মা'র দোষ নেই। পুরানো দিনের নাম তো, এই জন্যে পছন্দ হয় নি।'

'বেগম রোকেয়া কে?'

'তোমাকে বললাম না মহিয়সী নারী। রংপুরের পায়ারাবন্দ গ্রামে জন্মেছিলেন। মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের জন্যে প্রাণপাত করেছিলেন। তুমি তাঁর নাম শুনোনি?'

'জি না।'

কলিংবেল বেজে উঠল। শওকত সাহেব আঁৎকে উঠলেন। ওরা বোধহয় চলে এসেছে। তিনি আয়না ড্রয়ারে রেখে দরজা খোলার জন্যে গেলেন। ওদের সামনে আয়না বের করার কোনো দরকার নেই। তারা কি-না কি মনে করবে– দরকার কি? অবশ্যি

আয়নায় তিনি নিজেও কিছু দেখছেন না। সম্ভবত এটা তাঁর কল্পনা। কিংবা তিনি পাগল হয়ে যাচ্ছেন। ছোটবেলায় তিনি যখন স্কুলে পড়তেন তখন তাদের অবনি স্যার স্কুলের সামনের বড় আমগাছটার সঙ্গে কথা বলতেন। কেউ দেখে ফেললে খুব লজ্জা পেতেন। এক বর্ষাকালে তিনি স্কুলের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন, হঠাৎ দেখেন, অবনি স্যার আমগাছের সঙ্গে কথা বলছেন। অবনি স্যার তাকে দেখে খুব লজ্জা পেয়ে বললেন, সন্ধ্যাবেলা এমন ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে হাঁটবি না। খুব সাপের উপদ্রব। তারপরের বছরই স্যার পুরোপুরি পাগল হয়ে গেলেন। তাঁর আত্মীয়স্বজন তাকে নিয়ে ইন্ডিয়া চলে গেল।

কে জানে তিনি নিজেও হয়তো পাগল হয়ে যাচ্ছেন। পুরোপুরি পাগল হবার পর তাঁর স্ত্রী ও মেয়েরা হয়তো তাঁকে পাবনার মেন্টাল হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে আসবে। পাবনায় ভর্তি হতে কত টাকা লাগে কে জানে। টাকা বেশি লাগলে ভর্তি নাও করাতে পারে। হয়তো নিজেদের বাড়িতেই দরজায় তালাবদ্ধ করে রাখবে, কিংবা অন্য কোনো দূরের শহরে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসবে। পাগল পুষতে না পারলে দূরে ছেড়ে দিয়ে আসতে হয়। এতে দোষ হয় না। পাগল তো আর মানুষ না। তারা বোধশক্তিহীন জন্তুর মতোই।

মনোয়ারা বিয়ে বাড়ি থেকে মেয়েদের নিয়ে ফেরেন নি। মেজ মেয়ের মাস্টার এসেছে। শওকত সাহেব বললেন, 'ওরা কেউ বাসায় নেই। বিয়ে বাড়িতে গেছে। আপনি বসেন, চা খান।'

মাস্টার সাহেব বললেন, 'আচ্ছা চা এক কাপ খেয়েই যাই। শওকত সাহেব বুয়াকে চায়ের কথা বলে এসে শুকনো মুখে মাস্টারের সামনে বসে রইলেন। তাঁর মেজাজ একটু খারাপ হলো। মাস্টারের চা খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত সামনে বসে থাকতে হবে। টুকটাক কথা বলতে হবে। কি কথা বলবেন?'

মাস্টার সাহেব বললেন, 'আপনার গালে কি হয়েছে?'

'দাড়ি শেভ করতে গিয়ে গাল কেটে গেছে। আয়নাটা খারাপ, ভালো দেখা যায় না।'

'নতুন একটা কিনে নেন না কেন?

'ইরার মাকে বলেছি– ও সময় করতে পারে না। আপনার ছাত্রী পড়াশোনা কেমন করছে?'

'ভালো। ম্যাথ-এ একটু উইক।'

'আপনি কি শুধু ম্যাথ পড়ান?'

'আমি সায়েন্স সাবজেক্ট সবই দেখাই– ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি।'

বুয়া চা নিয়ে এসেছে। শুধু চা না, পিরিচে পেঁপে এবং মুড়ি। মাস্টার সাহেব আগ্রহ করে তিতা পেঁপে এবং মিয়ানো মুড়ি খাচ্ছেন। প্রাইভেট মাস্টাররা যে কোনো খাবার আগ্রহ করে খায়। শওকত সাহেব কথা বলার আর কিছু পাচ্ছেন না। একবার ভাবলেন আয়নার ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলবেন, নিজেকে সামলালেন। কি দরকার?

'মাস্টার সাহেব!'

'জি।'

'আপনি তো সায়েন্সের টিচার, আয়নাতে যে চবি দেখা যায়, কিভাবে দেখা যায়?'

'আলো অবজেক্ট থেকে আয়নাতে পড়ে, সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে।'

শওকত সাহেব ইতস্তত করে বললেন, 'কোনো বস্তু যদি আয়নার সামনে না থাকে তাহলে তো তার ছবি দেখার কোনো কারণ নেই, তাই না?'

মাস্টার সাহেব খুবই অবাক বললেন, 'তা তো বটেই। এটা জিজ্ঞেস করছেন কেন'?

'এম্নি জিজ্ঞেস করছি। কোনো কারণ নাই। কথার কথা। কিছু মনে করবেন না।' শওকত সাহেব খুবই লজ্জা পেয়ে গেলেন।

পরদিন অফিসে যাবার সময় শওকত সাহেব আয়নাটা খবরের কাগজে মুড়ে সঙ্গে নিয়ে নিলেন। কেন নিলেন নিজেও ঠিক জানেন না। অফিসের ড্রয়ারে আয়না রেখে সাজেদুল করিমের সঙ্গে কম্পিউটার নিয়ে ঘটঘট করতে লাগলেন। কিভাবে উইন্ডো খুলে সেখান থেকে সিস্টেম ফোল্ডার বের করতে হয়, ডাটা এন্ট্রি, ডাটা প্রসেসিং– চৌদ্দ রকম যন্ত্রণা। তিনি মুগ্ধ হলেন ছেলেটার ধৈর্য দেখে। তিনি যেসব গুবলেট করে দিচ্ছেন তার জন্যে সাজেদুল করিম একটুও রাগ করছে না। একই জিনিস বারবার করে বলছে। এমনভাবে কথা বলছে যে তিনি বয়স্ক একজন মানুষ না, বাচ্চা একটা ছেলে। সাজেদুল করিম বলল, 'স্যার, আসুন আমরা একটু রেস্ট নেই। চা খাই। তারপর আবার শুরু করব।'

শওকত সাহেব বললেন আমাকে দিয়ে আসলে কিছু হবে না। বাদ দাও।

'বাদ দিলে চলবে কি করে স্যার? কম্পিউটার চলে এসেছে। এখন তো আর আপনি লম্বা লম্বা যোগ-বিয়োগ করতে পারবেন না। ব্যালেন্স শিট তৈরি হবে কম্পিউটারে।'

শওকত সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, 'আমি পারব না। যারা পারবে তারা করবে। চাকরি ছেড়ে দেব।'

'কি যে স্যার বলেন! চাকরি ছেড়ে দেবেন মানে? চাকরি ছাড়লে খাবেন কি? আপনি মোটেই ঘাবড়াবেন না। আমি আপনাকে কম্পিউটার শিখিয়ে ছাড়ব। আমার সাংঘাতিক জেদ।'

চা খেতে খেতে শওকত সাহেব ছেলেটার সঙ্গে কিছু গল্পও করলেন। গল্প করতে খারাপ লাগল না। তবে এই ছেলে কম্পিউটার ছাড়া কোনো গল্প জানে না। কোনো এক ভদ্রলোক তার কিছু জরুরি ডাটা ভুল করে ইংরেজি করে ফেলেছিলেন। প্রায় মাথা খারাপ হবার মতো জোগাড়। সেই ডাটা কিভাবে উদ্ধার হলো তার গল্প সে এমনভাবে করল যেন এটা এক রোমহর্ষক গল্প।

'বুঝলেন স্যার, দুটা প্রোগ্রাম আছে যা দিয়ে ট্রেস ক্যান-এ ফেলে দেয়া ডাটাও

উদ্ধার করা যায়। একটা প্রোগ্রামের নাম নর্টন ইউটিলিটিজ, আরেকটার নাম কমপ্লিট আনডিলিট। খুবই চমৎকার প্রোগ্রাম।'

শওকত সাহেব কিছুই বুঝলেন না তবু মাথা নাড়লেন যেন বুঝতে পেরেছেন। চা শেষ হবার পর সাজেদুল করিম বলল, 'স্যার আসুন বিসমিল্লাহ বলে লেগে পড়ি।'

শওকত সাহেব কিছুই বুঝলেন না তবু মাথা নাড়লেন যেন বুঝতে পেরেছেন। চা শেষ হবার পর সাজেদুল করিম বলল, 'স্যার আসুন বিসমিল্লাহ বলে লেগে পড়ি।'

শওকত সাহেব লজ্জিত গলায় বললেন, 'আজ থাক। আজ আর ভালো লাগছে না।'

'জিএম সাহেব শুনলে আবার রাগ করবেন।'

'রাগ করলে করবে। কি আর করা! আমাকে দিয়ে কম্পিউটার হবে না। শুধু শুধু তুমি কষ্ট করছ।'

'আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না। ঠিক আছে, আজ আপনি রেস্ট নিন, কাল আবার আমরা শুরু করব। আমি তাহলে স্যার আজ যাই।'

'একটা জিনিস দেখ তো।'

শওকত সাহেব ড্রয়ার থেকে খবরের কাগজে মোড়া আয়না বের করলেন। খুব সাবধানে কাগজ সরিয়ে আয়না বের করলেন। সাজেদুল করিমের হাতে আয়নাটা দিয়ে বললেন, 'জিনিসটা একটু ভালো করে দেখ তো।'

'জিনিসটা কি?'

'একটা আয়না।'

সাজেদুল করিম ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আয়না দেখল। শওকত সাহেব কৌতূহলী গলায় বললেন, 'দেখলে?'

সাজেদুল করিম বিস্মিত হয়ে বলল, 'দেখলাম।'

'কি দেখলে বলো তো?'

'পুরানো একটা আয়না দেখলাম। পারা নষ্ট হয় গেছে। আর তো কিছু দেখলাম না। আর কিছু কি দেখার আছে?'

'না, আমার শখের একটা আয়না।'

শওকত সাহেব আয়নাটা কাগজে মুড়তে শুরু করলেন। সাজেদুল করিম এখনো তাঁর দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছে। শওকত সাহেবের মনে হলো তিনি ছোটবেলায় অবনী স্যারকে গাছের সঙ্গে কথা বলতে দেখে এইভাবেই বোধহয় তাকিয়েছিলেন।

সাজেদুল করিম চলে যাবার পর তিনি তঁর ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। আয়নাটা বের করলেন– ঐ তো, মেয়েটাকে দেখা যাচ্ছে। মেয়েটাকে কেমন দুঃখী দুঃখী লাগছে। শওকত সাহেব মৃদু গলায় বললেন, 'কেমন আছ চিত্রলেখা?'

'ভালো।'

'তোমার মুখটা এমন শুকনা লাগছে কেন? মন খারাপ?'

'হুঁ।'

'মন খারাপ কেন?'

একা একা থাকি তো এই জন্যে মন খারাপ। মাঝে মাঝে আবার ভয় ভয় লাগে।'

'কিসের ভয়?'

'জানি না কিসের ভয়। এটা কি আপনার অফিস?'

'হুঁ।'

'আপনার টেবিলের উপর এটা কি? বাক্সের মতো?'

'এটা হচ্ছে একটা কম্পিউটার। আইবিএম কম্পিউটার।'

'কম্পিউটার কি?'

'একটা যন্ত্র। হিসাব-নিকাশ করে। আচ্ছা শোনো চিত্রলেখা, তোমার বাবা-মা আছেন?'

'জানি না তো।'

'তুমি আজ কিছু খেয়েছ?'

'না।'

'তোমার খিদে লেগেছে?'

'হুঁ।'

'তুমি যেখানে থাকো সেখানে কোনো খাবার নেই?'

'না।'

'জায়গাটা কেমন?'

'জায়গাটা কেমন আমি জানি না। খুব শীত।'

শওকত সাহেব দেখলেন মেয়েটা শীতে কাঁপছে। পাতলা সুতির জামায় শীত মানছে না। তিনি কি করবেন বুঝতে পারলেন না। এই শীতার্ত ও ক্ষুধার্ত মেয়েটার জন্যে তিনি কিইবা করতে পারেন। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আয়নাটা কাগজে মুড়ে ড্রয়ারে রেখে দিলেন। তাঁর নিজেরও খিদে লেগেছে। বাসা থেকে টিফিন কেরিয়ারে করে খাবার এনেছেন। কোনো উপায় কি আছে মেয়েটাকে খাবার দেয়ার? আরে, কি আশ্চর্য! তিনি এসব কি ভাবছেন? আয়নায় যা দেখছেন সেটা মনের ভুল ছাড়া আর কিছুই না। এটাকে গুরুত্ব দেয়ার কোনো মানে হয় না। আসলে আয়নাটা তাঁর দেখাই উচিত না। তিনি টিফিন কেরিয়ার নিয়ে অফিস ক্যানটিনে খেতে গেলেন। কিন্তু খেতে পারলেন না। বারবার মেয়েটার শুকনা মুখ মনে পড়তে লাগল। তিনি হাত ধুয়ে উঠে পড়লেন।

বাসায় ফিরতে ফিরতে তাঁর সন্ধ্যা হয়ে গেল। সাধারণ অফিস থেকে তিনি সরাসরি বাসায় ফেরেন। আজ একটু ঘুরলেন। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বেঞ্চিতে বসে রইলেন। তাঁর ভালোই লাগল। ফুরফুরে বাতাস দিচ্ছে, চারদিকে গাছপালা। কেমন শান্তি-শান্তি ভাব। দুপুরে কিছু খান নি বলে খিদেটা এখন জানান দিচ্ছে। বাদামওয়ালা বুট-বাদাম বিক্রি করছে। এক ছটাক বাদাম কিনে ফেলবেন নাকি? কত দাম এক ছটাক বাদামের? তিনি হাত উঁচিয়ে বাদামওয়ালাকে ডাকলেন। তারপরই মনে হলো বাচ্চা একটা মেয়ে

না খেয়ে আছে। তাঁর মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাদাম না কিনেই তিনি বাসার দিকে রওনা হলেন।

বাসায় ফেরামাত্র তাঁকে নাশতা দেয়া হলো– তিতা পেঁপের টুকরা, মিয়ানো মুড়ি। মনে হয় অনেকগুলো তিতা পেঁপে কেনা আছে এবং টিন ভর্তি মিয়ানো মুড়ি আছে। এগুলো শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে খেতেই হবে। ঘরের ভেতর থেকে হারমোনিয়ামের শব্দ আসছে। অপরিচিত একজন মানুষ নাকি গলায় সা-রে-গা-মা করছে। ইরার গলাও পাওয়া যাচ্ছে। ইরা গান শিখছে নাকি?

সারেগা রেগামা গামাপা মাপাধা পাধানি ধানিসা...

মনোয়ারা চায়ের কাপ নিয়ে শওকত সাহেবের সামনে রাখতে রাখতে বললেন, ইরার জন্যে গানের মাস্টার রেখে দিলাম। সপ্তাহে দু'দিন আসবে। পনের শ' টাকা সে নেয়, বলে-কয়ে এক হাজার করেছি। তবলচিকে দিতে হবে তিন শ'। মেয়ের এত শখ। তোমাকে বলে তো কিছু হবে না। কার কি শখ, কি ইচ্ছা, তুমি কিছুই জানো না। যা করার আমাকেই করতে হবে।

শওকত সাহেব নিঃশব্দে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। এক হাজার যোগ তিনশ'– তের শ'। বাড়তি তেরশ' টাকা কোত্থেকে আসবে? সামনের মাস থেকে বেতন কমে যাবে। প্রফিডেন্ট ফান্ড থেকে দশ হাজার টাকা লোন নিয়েছিলেন, সামনের মাস থেকে পাঁচশ টাকা করে কাটা শুরু হবে। উপায় হবে কি? তিনি কম্পিউটারও শিখতে পারছেন না। সত্যি সত্যি যদি এই বয়সে চাকরি চলে যায়, তখন?

মনোয়ারা বললেন, 'সোমাদের কলেজ থেকে স্টাডি ট্যুরে যাচ্ছে। তার এক হাজার টাকা দরকার। তোমাকে আগেভাগে বলে রাখলাম। কি, কথা বলছ না কেন?'

শওকত সাহেব স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাসেভাবে হাসলেন। কিছু বললেন না।

'তোমার সঙ্গে বসে যে দুটো কথা বলব সে উপায় তো নেই। মুখ সেলাই করে বসে থাকবে। আশ্চর্য এক মানুষের সঙ্গে জীবন কাটালাম!'

মনোয়ারা উঠে চলে গেলেন। ঘরের ভেতর থেকে এখন গানের কথা ভেসে আসছে। মনে হচ্ছে ওস্তাদ টিচার প্রথম দিনেই গান শেখাচ্ছেন–

তুমি বাস কি-না তা আমি জানি না
ভালবাস কি-না তা আমি জানি না
আমার কাজ আমি বন্ধু করিয়া যে যাব
চিন্তা হইতে আমি চিতানলে যাব

শওকত সাহেব একা বসে আছেন। রাতে ভাত খাবার ডাক না আসা পর্যন্ত একাই বসে থাকতে হবে। আয়নাটা বের করে মেয়েটার সঙ্গে দুটা কথা বললে কেমন হয়? কেউ এসে দেখে ফেললে হলো। দেখে ফেললে সমস্যা।

'কেমন আছ চিত্রলেখা?'

'জি, ভালো আছি। কে গান গাচ্ছে?'

'আমার বড় মেয়ে।'

'ইরা?'

'হ্যাঁ, ইরা। তোমার দেখি নাম মনে আছে।'

'মনে থাকবে না কেন? আমার সবার নামই মনে আছে–ইরা, সোমা, কল্পনা। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনার খুব মন খারাপ। আপনার কি হয়েছে?'

'কিছু হয় নি রে মা।'

শওকত সাহেবের গলা ধরে এলো। দিনের পর দিন তাঁর মন খারাপ থাকে। কেউ জানতে চায় না তার মন খারাপ কেন– আয়নার ভেতরের এই মেয়ে জানতে চাচ্ছে। তাঁর চোখে প্রায় পানি আসার উপক্রম হলো। তিনি প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে বললেন, তুমি কি গান জানো?'

'জি না।'

'আচ্ছা শোনো, তুমি যে বলেছিলে খিদে লেগেছে। কিছু কি খেয়েছ? খিদে কমেছে?'

মেয়েটা মিষ্টি করে হাসল। মজার কোনো কথা বলছে এমন ভঙ্গিতে বলল, 'আপনি কি যে বলেন। খাব কি করে? আমাদের এখানে কি কোনো খাবার আছে?'

'খাবার নেই?'

'না। কিচ্ছু নেই। এটা একটা অদ্ভুত জায়গা। শুধু আমি একা থাকি। কথা বলারও কেউ নেই। শুধু আপনার সঙ্গে কথা বলি।'

শওকত সাহেব লক্ষ করলেন, মেয়েটা আগের মতো দু'হাত বুকের উপর রেখে থরথর করে কাঁপছে। তিনি কোমল গলায় বললেন, শীত লাগছে মা?

'লাগছে। এখানে খুব শীত। যখন বাতাস দেয় তখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লাগে। আমার তো শীতের কাপড় নেই। এই একটাই ফ্রক।'

দুঃখে শওকত সাহেবের চোখে প্রায় পানি এসে গেল। তখন মনোয়ারা বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। শীতল গলায় বললেন, আয়না হাতে বারান্দায় বসে আছ কেন? কল্পনার পাশে বসে তার পড়াটা দেখিয়ে দিলেও তো হয়। সব বাবারাই ছেলেমেয়ের পড়াশোনা দেখিয়ে দেয়, একমাত্র তোমাকে দেখলাম অফিস থেকে এসে বটগাছের মতো বসে থাকো। বাবার কিছু দায়িত্ব তো পালন করবে।'

শওকত সাহেব আয়নাটা রেখে কল্পনার পড়া দেখানোর জন্যে উঠে দাঁড়ালেন।

সাজেদুল করিম অসাধ্য সাধন করেছে। শওকত সাহেবকে কম্পিউটার শিখিয়ে ফেলেছে।

'কি স্যার, বলি নি আপনাকে শিখিয়ে ছাড়ব?'

শওকত সাহেব হাসলেন। তাঁর নিজের এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না তিনি ব্যাপারটা ধরে ফেলেছেন। সাজেদুল করিম বলল, 'আর কোনো সমস্যা হবে না। তাছাড়া আমি

আপনার জন্যে আরেকটা কাজ করেছি– প্রতিটি স্টেপ কাগজে লিখে এনেছি। কোনো সমস্যা হলে কাগজটা দেখবেন। দেখবেন, সব পানির মতো পরিষ্কার।'

'থ্যাংক য়্যু।'

'আর স্যার, আমার ঠিকানাটা কাগজে লিখে গেলাম। কোনো ঝামেলা মনে করলেই আমার বাসায় চলে আসবেন।'

'আচ্ছা। বাবা, তুমি অনেক কষ্ট করেছ।'

'আপনার অবস্থা দেখে আমার স্যার মনটা খারাপ হয়েছিল। রাতে দেখি ঘুম আসে না। তখন একের পর এক স্টেপগুলো কাগজে লিখলাম। সারারাত চিন্তা করলাম কিভাবে বুঝালে আপনি বুঝবেন।'

শওকত সাহেবের চোখে প্রায় পানি আসার উপক্রম হলো। তিনি ভেবে পেলেন না এ রকম অসাধারণ ছেলে পৃথিবীতে এত কম জন্মায় কেন?

'স্যার, আমি যাই। জিএম সাহেবকে বলে যাচ্ছি আপনি সব শিখে ফেলেছেন, আর কোনো সমস্যা নেই। আরেকটা কথা স্যার, কম্পিউটারকে ভয় পাবেন না। তাকে ভয় পাবার কিছু নেই। কম্পিউটার হচ্ছে সামান্য একটা যন্ত্র। এর বেশি কিছু না।'

শওকত সাহেবের চোখে এইবার সত্যি সত্যি পানি চলে এলো। ছেলেটা যেন চোখের পানি দেখতে না পায় সে জন্যে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে মনে ঠিক করলেন, আজ অফিস থেকে ফেরার পথে ছেলেটার জন্যে একটা উপহার কিনবেন। দামি কিছু না, সেই সামর্থ্য তাঁর নেই, তবু কিছু কিনে তার বাসায় গিয়ে তাকে দিয়ে আসবেন। একটা কলম বা এই জাতীয় কিছু। শ'দুই টাকার মধ্যে কলম না পাওয়া গেলে সুন্দর কিছু গোলাপ। তাঁর সঙ্গে পাঁচশ' টাকা আছে। টেবিলের ড্রয়ারে খামের ভেতর রাখা।

শওকত সাহেব একশ পঁচাত্তর টাকা দিয়ে একটা ওয়াটারম্যান কলম কিনলেন। তারপর কোনো কিছু না ভেবেই চিত্রলেখার জন্যে একটা স্যুয়েটার কিনে ফেললেন। গরমের সময় বলেই ভালো ভালো স্যুয়েটার সস্তায় বিক্রি হচ্ছিল। স্যুয়েটার কিনতে তিনশ চল্লিশ টাকা খরচ হয়ে গেল। সাদা জমিনের উপর নীল ফুল আঁকা। সিনথেটিক উল। দোকানদার বলল, সিনথেটিক হলেও আসল উলের বাবা। শুধু স্যুয়েটার গায়ে দিয়েই তন্দ্রা অঞ্চলে বরফের চাঁইয়ের উপর শুয়ে থাকা যায়। শওকত সাহেব জানেন স্যুয়েটার কেনাটা তাঁর জন্যে খুবই বোকামি হয়েছে। চিত্রলেখাকে এই স্যুয়েটার তিনি কখনো দিতে পারবেন না। কারণ চিত্রলেখা বলে কেউ নেই। পুরো ব্যাপারটা তাঁর মাথার অসুস্থ কোনো কল্পনা। সংসারের দুঃখ-ধান্ধায় তাঁর মাথা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে বলে এইসব হাবিজাবি দেখছেন। তারপরও মনে হলো–মেয়েটা দেখবে জিনিসটা তার জন্যে কেনা হয়েছে। বেচারি খুশি হবে।

সাজেদুল করিমকে তিনি বাসায় পেলেন না। দরজা তালাবদ্ধ। দরজার ফাঁক দিয়ে তিনি কলমটা ঢুকিয়ে দিলেন। তাঁর মনে হলো, ভালোই হয়েছে, সাজেদুল করিম জানল

না উপহার কে দিয়েছে। মানুষের সবচে' ভালো লাগে অজানা কোনো জায়গা থেকে উপহার পেতে।

শওকত সাহেব গভীর আনন্দ নিয়ে বাসায় ফিরলেন। আজকের পেঁপে খেতে আগের মতো তিতা লাগল না। চা-টাও খেতে ভালো হয়েছে। তিনি মনোয়ারাকে আরেক কাপ চা দিতে বলে ড্রয়ার থেকে আয়না বের করতে গেলেন। আয়না পাওয়া গেল না। ড্রয়ারে নেই, টেবিলের উপরে নেই, বাথরুমে নেই, বারান্দায় নেই। তিনি পাগলের মতো আয়না খুঁজছেন। মেয়েরা কেউ কি নিয়েছে? তিনি মেয়েদের ঘরে ঢুকে টেবিলের বইপত্র এলোমেলো করতে শুরু করলেন।

ইরা বলল, 'বাবা, তুমি কি খুঁজছ?'

'আয়নাটা খুঁজছি। আমার একটা হাত-আয়না ছিল না? ঐ আয়নাটা।'

'ঐ আয়না তুমি কোথাও খুঁজে পাবে না। মা তোমার জন্যে নতুন আয়না কিনেছে। ওটা ফেলে দিয়েছে।'

শওকত সাহেব হতভম্ব গলায় বললেন, 'এই সব কি বলছিস? কোথায় ফেলেছে?'

'পুরানো একটা আয়না ফেলে দিয়েছে। তুমি এ রকম করছ কেন বাবা?'

শওকত সাহেব বিড়বিড় করে কি যেন বললেন, কিছু বুঝা গেল না। ইরা ভয় পেয়ে তার মাকে ডাকল। মনোয়ারা এসে দেখেন শওকত সাহেব খুব ঘামাচ্ছেন। তাঁর কপাল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম পড়ছে। তিনি ধরা গলায় বললেন, মনোয়ারা, আয়না কোথায় ফেলেছ?

রাত এগারোটা বাজে। শওকত সাহেব বাসার পাশের ডাস্টবিন হাতড়াচ্ছেন। তাঁর সারা গায়ে নোংরা লেগে আছে। তাঁর সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি দু'হাতে ময়লা ঘেঁটে যাচ্ছেন। একটু দূরে তার স্ত্রী ও তিন কন্যা দাঁড়িয়ে। তাদের চোখে রাজ্যের বিস্ময়। বড় মেয়ে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, 'তোমার কি হয়েছে বাবা?'

শওকত সাহেব ফিসফিস করে বললেন, 'চিত্রলেখাকে খুঁজছি রে মা। চিত্রলেখা।'

'চিত্রলেখা কে?'

'আমি জানি না কে।'

শওকত সাহেবের চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকছেন– 'চিত্রা মা রে, ওমা, তুই কোথায়?'